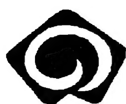
# বাংলা গানের সন্ধানে

সুধীর চক্রবর্তী

অরুণা প্রকাশনী : ৭ যুগলকিশোর দাস লেন : কলকাতা ৬



প্রথম প্রকাশ

২৫শে বৈশাখ ১৩৬৭

প্রকাশিকা

অরুণা বাগচী

অরুণা প্রকাশনী

৭ যুগলকিশোর দাস লেন

কলকাতা ৬

প্রচ্ছদ

প্রবীর সেন

মুদ্রাকর

নব মুদ্রণ

১বি, রাজা লেন

কলকাতা ৯

অধ্যাপক ড. গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়

শ্রদ্ধাভাজনেষু

লেখকের অন্যান্য বই

সাহেবধনী সম্প্রদায় তাদের গান
কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্প ও মৃৎশিল্পী সমাজ
গানের লীলার সেই কিনারে
বলাহাড়ি সম্প্রদায় আর তাদের গান
দ্বিজেন্দ্রলাল রায় : স্মরণ বিস্মরণ
আধুনিক বাংলা গান
গভীর নির্জন পথে
বাংলা দেহতত্ত্বের গান

## আত্মপক্ষ

'বাংলা গানের সন্ধানে' বইতে যে-সাতটি প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছে তার মধ্যে একটির প্রকাশকাল ১৩৩২ বঙ্গাব্দ, আরেকটির ১৩৩৬। বাকি পাঁচটি রচনা এই দুইয়ের মধ্যবর্তী নানা সময়ে প্রকাশিত। তার মানে চব্বিশ বছরের দীর্ঘ পরিসরে আমার বাংলা সংগীত সম্পর্কে আগ্রহ আর অনুসন্ধানের একটা ধারাবাহিকতা এতে ধরা রয়েছে। তবু এটাই শেষ কথা নয়। আসলে ১৩৩২ সালে যখন আমার সংগীত প্রসঙ্গে নিবন্ধ প্রকাশ পেয়েছে তখনও ঐ বিষয়ের লেখক হিসাবে তেমন পরিচিতি বা প্রতিষ্ঠাভূমি ছিল না। কিন্তু ইতিমধ্যে এখন বাংলা গান বিষয়ে একজন সামান্য লেখক হিসাবে হয়ত আমি ততটা অপরিচিত নই। তার একটা প্রমাণ এই যে মান্যতাসম্পন্ন পত্রপত্রিকা থেকে আজকাল গানের সম্পর্কে লেখার আমন্ত্রণ প্রায়শই আসে। তাছাড়া নানা বর্গের গান নিয়ে ইত্যবসরে আমার গোটা পাঁচেক বই বাজারে প্রকাশ পেয়েছে, তার কোনোটাই সমালোচক বা পাঠকদের নিন্দার্হ হয়নি। বাংলা গানের নানাদিক নিয়ে এই যে অবিশ্রান্ত লিখে-যাওয়া তার পিছনে সহৃদয় সম্পাদক বা সংকলকদের ঔপলক্ষিক আগ্রহ বা প্ররোচনা যতটা সহায়ক ততটাই দায়ী লেখকের নিজের জিজ্ঞাসার নিয়ত প্রবর্তনা।

কিন্তু শুরুতে ব্যাপারটা এমনতর সহজ সরলভাবে ঘটেনি। তখন ১৯৫৬ সাল এবং আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম শ্রেণীতে পঠনরত। 'নতুন সাহিত্য' নামে সে-সময়ের এক নামী কাগজে প্রকাশিত নজরুল ইসলাম সম্পর্কে একটি নিবন্ধে নজরুলগীতি-সংক্রান্ত কয়েকটি ভুল তথ্যের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে সম্পাদককে চিঠি দিই। সম্পাদক শ্রীঅনিলকুমার সিংহ চিঠিখানি ছাপেন এবং কার্যালয়ে ডেকে নিয়ে গিয়ে সংগীত বিষয়ে মৌলিক রচনা লিখতে আমন্ত্রণ জানান। সেই থেকে গান নিয়ে লেখা শুরু, যার ক্ষান্তি আজও ঘটেনি। যদিও তখন গানে আসক্তি ছিল, গান শোনার আগ্রহও কম ছিল না, কিন্তু সে বিষয়ে লেখার কোনো ইচ্ছা তার আগে জাগেনি। জাগিয়ে দিয়েছিলেন অনিলবাবু, তাঁকে আজ মনে পড়ছে।

গান বিষয়ে এতদিন ধরে লিখতে লিখতে প্রায়ই মনে হয়েছে সাহিত্যের ছাত্র হয়ে কোনো রকম সংগীত সম্পর্কেই লেখার অধিকার বর্তায় কি? উত্তরে মনে আসে প্রমথ চৌধুরীর সেই কথা, যেখানে বলা হয়েছে, কণ্ঠে বা যন্ত্রে যিনি কখনও সপ্তস্বর চর্চা করেননি তাঁর সংগীত সম্পর্কে লেখা উচিত নয়। ভরসা করে এইমাত্র আত্মপক্ষে বলা শোভন হবে যে প্রমথ চৌধুরীর দেওয়া উদার অধিকারে

মাঝে মাঝে সংগীত প্রসঙ্গে কিছুকিঞ্চিৎ লেখার সুযোগ নিয়েছি। সহৃদয়জন লক্ষ্য করেছেন পারতপক্ষে গানের সুর বা ব্যাকরণ বিষয়ে আমি নাক গলাইনি। আমার অন্বিষ্ট সমাজ-ইতিহাসের দোলাচলে বাংলা গানকে বা তার ভূমিকাকে সনাক্ত করা, ধরতে চাওয়া তার নানা বাঁক আর বিভঙ্গকে, তার মধ্যে ব্যক্তি-গীতিকারের আত্মপ্রকাশের নিজস্ব আততিকে চিহ্নিত করা।

কাজটি যে যথাযথভাবে সম্পন্ন বা সম্পূর্ণ করতে পেরেছি সে-দাবী করবো না, তবে আমার আগে যেসব খ্যাতিমান সংগীতবোদ্ধা বাংলা গান সম্পর্কে কলম ধরেছেন তাঁদের প্রতিতুলনায় অন্যতর এক চিন্তাভাবনার বা ভিন্নতর উপাদান ব্যবহারের সচেতনতা আমি রাখতে চেয়েছি। সুরের বিশ্লেষণ, গানের ব্যাকরণ বা সংগীতশাস্ত্রকে অগ্রাধিকার না দিয়ে ব্যক্তিস্রষ্টার সৃজনের সংকট এবং দ্বান্দ্বিকতা, ইতিহাসের টানে তাঁদের আত্ম-আবিষ্কার ও আত্মস্ফুরণের দিকটাই ধরতে চেয়েছি। বাংলা গানকে বুঝতে গিয়ে সমাজের উর্ধ্বাধঃ বিন্যাস লক্ষ্যগোচর রাখা হয়েছে। আধুনিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের দ্যোতক রবীন্দ্রসংগীত নিয়ে যেমন একটি পূর্ণাঙ্গ বই লিখেছি ( দ্র. 'গানের লীলার সেই কিনারে' ) তেমনই নিম্নবর্গের সমন্বিত চেতনা বা সমাজমিশ্রণজাত গান নিয়ে বই লিখেছি ও সংকলন করেছি। উৎসুক পাঠক এ প্রসঙ্গে দেখেছেন হয়ত সাহেবধনী সম্প্রদায়ের গান, বলাহাড়ি সম্প্রদায়ের গান এবং বাংলা দেহতত্ত্বের গান বিষয়ে বইগুলি। অন্যদিকে রবীন্দ্রোত্তর বাংলা গানের স্বভাব আর সংকটের স্বরূপ বোঝাবার জন্য 'আধুনিক বাংলা গান' নামে একটি সংকলন প্রকাশ করে বোঝাতে চেয়েছি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর সমাজ ও রাষ্ট্রনীতির কাঠামো পালটে বাংলা গানকেও কতটা পালটে দিয়েছে। গান হয়ে গেছে কতটাই তাৎক্ষণিক বা বিনোদনমূলক, সমাজস্পর্শী বা অনুকরণবহুল, শ্রোতার মনোরঞ্জনধর্মী বা গণআন্দোলনমুখী, বাণিজ্যিক বা বিভাজিত।

এইসব ধারাবাহী কাজের ফাঁকে ফাঁকে এক-একটা স্বতন্ত্র উদ্‌যোগে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে লেখা হয়েছে 'বাংলা গানের সন্ধানে' বইয়ের অন্তর্গত সাতটি রচনা। তাই এ-সব রচনার অলক্ষ্যে পাওয়া যেতে পারে এক সজীব ইতিহাসের গতিসূত্র। সাতটি রচনা, তিনটি অধ্যায় বিন্যাসের সূত্রে, গ্রথিত হয়েছে। তার প্রকৃতি কিছুটা ব্যাখ্যা করা দরকার। বাংলা গানের সবচেয়ে ফলবান-পর্ব যদি ধরা যায় রবীন্দ্রনাথ-দ্বিজেন্দ্রলাল-রজনীকান্ত-অতুলপ্রসাদের প্রয়াসে তবে তার পটভূমি ও প্রস্তুতি ঘটেছিল উনিশ শতকের সংগীত নির্মাণের অস্থিরতা থেকে। সেই গানে দেশী-বিদেশী ধরনকে মেলাবার যেমন চেষ্টা ছিল, তেমনই চেষ্টা ছিল নাটকে গানের

প্রয়োগের বিনোদন সৃষ্টি। সেই সময়ে গানকে সংরক্ষণ ও প্রচারের জন্য যেমন স্বরলিপির উদ্‌ভাবন ঘটেছে, তেমনই বিভিন্ন ব্যক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগে ঘটেছে গান শেখানো, বঙ্গৈকতান সৃষ্টি আর সংগীত গ্রন্থ রচনার কাজ। বঙ্কিমচন্দ্র যেমন বলেছিলেন, 'বাঙ্গালীর ইতিহাস চাই', এঁরাও হয়তো তেমন করেই চেয়েছিলেন বাংলা গান। সেই গানকেই তাঁরা চেয়েছিলেন যা ব্যক্ত করবে ব্যক্তির স্বতন্ত্র সূক্ষ্ম অনুভূতি আর আবেগকে, আবার যাতে ব্যঞ্জিত হবে স্বাদেশিকতার সম্মেলক অভিমান। গানকে তাঁরা চেয়েছিলেন উজ্জীবন ও বিনোদনের যুগ্ম ভূমিকায়, তাই সেকালে তার প্রয়োগ ঘটেছিল ব্রাহ্মধর্মান্দোলন, দেশোদ্দীপনা ও রঙ্গমঞ্চের ত্রিধারায়। এই প্রবণতাগুলি বোঝানো হয়েছে প্রথম অধ্যায়ের দুটি নিবন্ধের বিন্যাসে।

প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয় রচনা 'গান-জাগানিয়া'তে দেখানো হয়েছে আধুনিক কালের গান রচনার নেপথ্যে এবং গীতিকার ও শিল্পীর উদ্দীপনার ক্ষেত্রে মরমী সমালোচক তথা রসবোদ্ধাদের ভূমিকা কতটা ব্যাপক। গানের তত্ত্ব ও উদ্দেশ্য নিয়ে প্রশ্ন-প্রতিপ্রশ্নের বাতাবরণ তৈরি করে গীতিকারকে তাঁর লক্ষ্য সম্পর্কে সচেতন রাখার ফলেই গান রচনার বিবর্তন ও প্রার্থিত সফলতা আসে। বাংলা গানের ইতিহাস যে শুধু একাকী গায়ক বা গীতিকারের রচনানির্ভর নয়, শ্রোতা বা তাত্ত্বিক যে সেই-সৃজনে একটা বড় রসায়ন সেকথা বোধ হয় এই প্রথম বলার প্রয়াস ঘটেছে।

বইয়ের দ্বিতীয় অধ্যায়ে আছে দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনীকান্ত ও অতুলপ্রসাদের গানের সূত্রে তাঁদের জীবন-ঘটনার উন্মোচন। ব্যাপারটা উলটোভাবেও বলা যায়, অর্থাৎ তাঁদের জীবন কেমনভাবে বা কতটা ফুটে বেরিয়েছে গানের ভিতর দিয়ে সেটা বোঝানোই এ-রচনা তিনটির লক্ষ্য। বিদেশী সুরকারদের নিয়ে এমন কাজ অনেক হয়েছে, তাকে বলে 'মিউজিকাল বায়োগ্রাফি'। বাংলা ভাষায় কাজটি এই প্রথম করবার প্রয়াসরূপে বিবেচ্য হবে রচনাগুলি, বড়জোর এইটুকু বিনত দাবি।

তৃতীয় অধ্যায়ে আছে একটিই দীর্ঘ রচনা 'স্ববিরোধের শিল্প : আধুনিক বাংলা গান'। এখানে বোঝানো হয়েছে নজরুলের পর থেকে বাংলা গানের নানা বিভাজন ও প্রকরণগত সংক্রামের প্রসঙ্গ। বাংলা গানের নিয়ামক বা প্রেরণা এখন এক ভ্রান্ত বা দ্বিধাচালিত 'কনজ্যুমার প্যাটার্ন'। সেই অলক্ষ্য জগতের অনুজ্ঞায় গীতিকার কেবল গান লেখেন, সুর দেন সাধারণত আরেকজন। এবারে 'অ্যারেঞ্জার' গানটিকে যন্ত্রবাদ্যের নানা কৃৎকৌশলে সাজান, তারপরে সেটি রেকর্ডবদ্ধ করেন 'পারফরমার'।

এই সব বিভাজন থেকে নানা সংকটের আর স্ববিরোধের জন্ম। যার একটা বড় দ্বান্দ্বিকতা চিরায়তের সঙ্গে লোকায়তকে মেলাবার প্রশ্নে, আরেকটি হলো দেশী গানের গায়নপরম্পরার সঙ্গে বিদেশী গায়নধারার জটিল বুনোনের সমস্যায়। আরেকটি বড় দ্বিধা রয়েছে গানের বিষয় নিয়ে এবং যন্ত্রানুষঙ্গ ব্যবহারের সঙ্গতি-প্রসঙ্গে। এই সূত্রে প্রশ্ন ওঠে, বাঙালীর আধুনিক কালের চিত্রশিল্প, কবিতা, উপন্যাস, ছোটগল্প, নাটক ও চলচ্চিত্রের প্রতিতুলনায় সদ্যতন কালের গান কতখানি আধুনিক উচ্চারণে সমৃদ্ধ? এই সব সমস্যাই আমি তুলে ধরেছি। লেখা বাহুল্য যে, সমাধানের সূত্র আমার হাতে নেই।

মোটকথা আঠারো শতকের শেষে নিধুবাবু থেকে শুরু করে বাংলা গানের যে যাত্রা শুরু তার আধুনিকতম কাল পর্যন্ত প্রসারণের পথরেখাটুকু নানা ব্যক্তি ও সমস্যাকে ঘিরে কেমনভাবে উদ্বেল হয়ে উঠেছে তা-ই বর্তমান বইটির আলোচ্য। রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে এখানে কোনো লেখা নেই। কারণ লেখাগুলি রবীন্দ্রনাথ আর তাঁর গান রচনার আয়োজন ও স্বাতন্ত্র্যকেই বোঝাতে চায়। বোঝাতে চায় বাংলা গানের দিশা।

রচনা পরিচয় ও স্বীকৃতি

বইয়ের অন্তর্গত রচনাগুলি অনেকাংশে প্রথম প্রকাশের পর পুনর্লিখিত বা পরিমার্জিত। অনেক ক্ষেত্রে প্রথম প্রকাশ ও প্রস্তুত পাণ্ডুলিপির মধ্যে দশকের ব্যবধান রয়ে গেছে। সেই কারণে সূচি অনুযায়ী প্রবন্ধগুলির প্রকাশকাল ও নতুন লিখন বিষয়ে কিছু তথ্য পাঠকদের নিবেদন করা দরকার। বইয়ের প্রথম রচনা 'জাগো জাগো রে জাগো সংগীত' প্রথম বেরিয়েছিল ১৩৭২ বঙ্গাব্দের বৈশাখ-আষাঢ় সংখ্যার 'বিশ্বভারতী পত্রিকা'য়। তখন লেখাটির নাম ছিল 'বাংলা সংগীত চিন্তার নবজন্ম'। লেখাটি একই শিরোনামে পুনর্মুদ্রিত হয় ঢাকা থেকে প্রকাশিত 'সঙ্গীত সংস্কৃতি' পত্রিকার ১৩৮৮ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ সংখ্যায়। 'পুরনো ভাল লেখার সাথে পরিচয়ের সম্ভাবনা' ঘটাতেই যে এই পুনর্মুদ্রণ একথা উল্লেখ করে সম্পাদক আমাকে কৃতজ্ঞ করেছিলেন। তারপরে ভদ্রকালী, হুগলী থেকে প্রকাশিত 'সংগীত চর্চা' পত্রিকার জানুয়ারি-মার্চ ১৯৮৫ সংখ্যায় 'ফিরে পড়া' পর্যায়ে এই রচনাটি তারিফ পায়। আলোচ্য লেখাটির কিছু তথ্যগত অসম্পূর্ণতা ও ভ্রান্তির কথাও তাঁরা উল্লেখ করেন। সেগুলি সংযোজিত ও সংশোধিত হয়েছে। পত্রিকা কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ। রচনাটি বিশ্বভারতী পত্রিকায় প্রকাশের অব্যবহিত পরে

অধ্যাপক রবীন্দ্রনাথ গুপ্ত পত্রিকা সম্পাদককে চিঠি লিখে কয়েকটি ভুলের প্রতি লেখকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। পুনর্লিখনের সময় সেগুলি যথাসম্ভব সংশোধন করেছি। শ্রীগুপ্তকে ধন্যবাদ।

'পুরনো কলকাতার গান' রচনাটি কলকাতার ৩০০ বছর-পূর্তি উপলক্ষে প্রকাশিত 'দেশ' বিনোদন (১৯৮৯) সংখ্যায় 'গানের কলকাতা' শিরোনামে অংশত মুদ্রিত হয়েছে। এই রচনাটি লেখার প্রস্তাব ও প্রবর্তনা 'দেশ' সম্পাদক শ্রীসাগরময় ঘোষের। তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানাই।

'গান-জাগানিয়া' লেখাটি প্রথম প্রকাশ পায় 'এক্ষণ' ১৩৮৯ শারদ সংখ্যায় 'আধুনিক বাঙালীর সংগীত-চিন্তা' নামে। লেখাটির ব্যাপারে সম্পাদক শ্রীনির্মাল্য আচার্য উৎসাহ দেখান। তাঁকে ধন্যবাদ। প্রস্তুত পাণ্ডুলিপিতে যেমন শিরোনাম পালটেছে, তেমনই অনেকাংশ সংযোজিত হয়েছে।

'একি মধুর ছন্দ' লেখাটি প্রথম লেখা হয় শ্রীসাগরময় ঘোষের আমন্ত্রণে ১৯৮৪-র 'দেশ' বিনোদন সংখ্যায়। তখন শিরোনাম ছিল 'দ্বিজেন্দ্রলালের গান : অবহেলিত উত্তরাধিকার'। মূল রচনাতে যৎসামান্য সংযোজন ঘটেছে। দ্বিজেন্দ্রগীতি বিষয়ে উৎসাহী পাঠককে এই সঙ্গে জানানো উচিত যে, আমার লেখা 'দ্বিজেন্দ্রলাল রায় : স্মরণ-বিস্মরণ' (প্রকাশক : পুস্তক বিপণি, কলকাতা) বইয়ের দুটি সুদীর্ঘ অধ্যায় ('দ্বিজবাবুর গান থেকে দ্বিজেন্দ্রগীতি' ও 'বাংলা গানে বিলিতি চাল') বর্তমান প্রসঙ্গে পঠনীয়।

'তুমি নির্মল কর মঙ্গল করে' লেখাটি প্রথম বেরোয় 'ঋতুপত্র গাঙ্গেয়' পত্রিকার ১৩৯৪ শারদ সংখ্যায়। তখন লেখাটির শিরোনাম ছিল 'দ্বিধাহীন অনুভূতির গান'।

অতুলপ্রসাদের গান বিষয়ে প্রথম খসড়া লেখাটি আমি তৈরি করি ১৯৭১ সালে ব্রাহ্মসমাজ প্রকাশিত 'তত্ত্বকৌমুদী' পত্রিকার অতুলপ্রসাদ জন্মশতবার্ষিক সংখ্যার জন্য। পরে সেই লেখাটি আমূল পুনর্লিখন করে 'প্রতিক্ষণ' পত্রিকার ১৩৯৪ সালের সংস্কৃতি সংখ্যায় প্রকাশ পায় 'কে হে তুমি সুন্দর' নামে। প্রস্তুত পাণ্ডুলিপিতে শিরোনামটি অক্ষুণ্ণ আছে কিন্তু রচনাংশ অনেকটাই আরেকবার লেখা হয়েছে।

'স্ববিরোধের শিল্প : আধুনিক বাংলা গান' লেখাটি আগ্রহ সহকারে ছাপেন শ্রীঅনিল আচার্য তাঁর সম্পাদিত 'অনুষ্টুপ' পত্রিকার গ্রীষ্ম ১৩৯৬ সংখ্যায়। এই লেখাটির সূচনা আসলে একধরনের অতৃপ্তিবোধ থেকে। ১৩৯৪ বঙ্গাব্দে 'আধুনিক বাংলা গান' নামে আমার সম্পাদনায় একটি গীতি-সংকলন বেরোয় (প্রকাশক : প্যাপিরাস, কলকাতা)। সেই সংকলনের 'প্রস্তাবনা' অংশে একটি নিবন্ধ লিখি।

কিন্তু সেই লেখাটির অসম্পূর্ণতা ও সীমায়ত অবয়ব সম্পর্কে অস্বস্তি আর অতৃপ্তি পূর্ণতর একটি লেখার দাবি রাখছিল। অনুষ্টুপে প্রকাশিত রচনাটি এ-ভাবেই সম্ভাবিত। সেখানে প্রকাশের পর জনৈক পাঠক শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় অনুষ্টুপের পরবর্তী সংখ্যায় (বর্ষা, ১৩৯৬) চিঠি লিখে একটি তথ্য সংযোজনের পরামর্শ দেন। সেই সংযোজন অংশত গৃহীত হয়েছে। পত্রলেখক ও সম্পাদক ধন্যবাদার্হ।

বহুদিনের শ্রমে ও চিন্তায় গ্রথিত এই বই নিবেদিত হলো অধ্যাপক গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের করকমলে। কলেজীয় জীবনের সূচনায় তাঁর সাংগীতিক সাহচর্য এবং মরমী গায়নশৈলী আমাকে বাংলা গানের অনুসন্ধানের ব্রতে নিবিষ্ট করেছিল এ কথা আজ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। তাঁর গানের পরম্পরা তিনি আমার কণ্ঠে সস্নেহে দান করেছিলেন। সেই গানের উত্তরাধিকারে তাঁকে তেমন করে সমৃদ্ধ করতে পারিনি, তাই জীবন ও ইতিহাস সন্ধানীর-চোখে-দেখা বাংলা গানের রূপ ও রসের যে প্রতীতি আমার ঘটেছে তারই লিখিত ভাষ্য তাঁকে প্রত্যুপহার দিলাম।

বইটির প্রকাশ ব্যাপারে নানাভাবে নানা শ্রদ্ধাভাজন ও স্নেহভাজন ব্যক্তি জড়িয়ে আছেন। তাঁদের নাম: শ্রীদিনেন্দ্র চৌধুরী, শ্রীশ্যামল রায়, শ্রীগৌরী হালদার, শ্রীঅনুপকুমার মহিন্দার, শ্রীশৈবাল সরকার ও শ্রীবিশ্বরূপ মুখোপাধ্যায়। সকলকে কৃতজ্ঞতা জানাই।

রামচন্দ্র মুখার্জি লেন — সুধীর চক্রবর্তী
কৃষ্ণনগর ৭৪১১০১

বিষয়ক্রম

# জাগো জাগো রে জাগো সংগীত

বাঙালী পণ্ডিতদের মধ্যে এখন একটা ব্যাপারে ঘোরতর বিতর্ক এই যে, এদেশে সত্যিকারের রেনেশাঁস বা নবজাগরণ হয়েছিল কিনা। সংখ্যাগরিষ্ঠরা দীর্ঘকাল ধরে বলে এবং লিখে প্রায় প্রতিষ্ঠা করে ফেলেছেন নবজাগরণের তত্ত্ব। তাঁরা বলতে চান ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সমাজ ও সাহিত্যে এমন কতকগুলি স্পষ্ট লক্ষণ ও যুগস্বাতন্ত্র্যের পরিচয় ফুটে উঠেছিল যা যুগান্তরের সূচক এবং গত শতাব্দীর থেকে স্বভাবত ভিন্নধর্মী। এ সব লক্ষণের মধ্যে তাঁরা বিশেষভাবে চিহ্নিত করেছেন মানবতাবোধের প্রসার, যুক্তি ও বুদ্ধির চর্চা, জাতিস্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠা ও স্বাদেশিকতা, বিজ্ঞান ও ইতিহাসনিষ্ঠা, নীতিধর্মের বদলে জীবনধর্মী মূল্যবোধের প্রসার, শাস্ত্র ও আচারের অতিরেকের বদলে হৃদয়বত্তার ভূমিকা, নারীজাতির সম্পর্কে সশ্রদ্ধ দৃষ্টিপাত। বলাবাহুল্য এইসব নবীন ভাবনার মূলে অনেকটাই ছিল বিদেশি চিন্তানায়কদের রচনা পাঠের সদ্যতন সংক্রাম। আবার সেই সঙ্গে ইংরাজি শিক্ষাব্যবস্থার সমুন্নত আদর্শ এবং সেই ধারায় নিষ্ণাত রামমোহন-বিদ্যাসাগর-দেবেন্দ্রনাথ-মাইকেল-ভূদেব-বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথের মতো যুগন্ধর মনীষার অভ্যুদয় এই সব নবভাবনাকে ধারণ ও প্রচারে সহায়তা করেছিল সে কথাটাও অবিস্মৃত থাকা চাই।

অন্যদিকে যে সব পণ্ডিত মনে করেন বাংলায় প্রকৃত অর্থে নবজাগরণ হয়নি তাঁরা এই ভাবান্দোলন অনেক বড় পরিপ্রেক্ষিকায় দেখতে চান। সত্যিই তো সেই য়ুরোপীয় অর্থে ও তাৎপর্যে এ দেশে নবজাগৃতি ঘটেনি। তাছাড়া বিরোধীরা একথাও বলেন, আমাদের নবজাগরণ আসলে সীমায়িত সংখ্যক ভদ্রলোকদের বৃত্তেই আবদ্ধ ছিল, ব্যাপারটা অনেকাংশে যাকে বলে 'এলিটিস্ট'। এ কথাটাও সারবান। কেননা নবজাগরণ তো দেশের গরিষ্ঠসংখ্যক সাধারণ মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেনি কিংবা অগণিত পল্লীবাসীর জীবনে একটুও সদর্থক পরিবর্তন আনেনি। সবচেয়ে বড় কথা, উপনিবেশবাদী ইংরেজের শাসনে ও শোষণে দেশ যখন অন্নরিক্ত, পরাধীন ও হৃতমান, তখন সেখানে নবজাগরণের অবকাশ কোথায় এবং কিসেরই বা নবজাগরণ?

আমরা এই ঘোরতর বিতর্কে কোনো মতামত না দিয়েও নির্ভয়ে বলতে পারি,

উনবিংশ শতাব্দীর বাংলায় সংগীতের ক্ষেত্রে অন্তত অনেকরকম নবীন ভাবনা ও উদ্যম দেখা দিয়েছিল। যাকে বলে সংগীতের সংরক্ষণ, নবরূপ প্রণয়ন ও প্রচার এবং প্রাতিষ্ঠানিক ও ব্যক্তিক উদ্যোগ তা এই শতাব্দীতে ব্যাপকভাবে ও সম্মেলক উৎসাহে জেগে উঠেছিল। তার ফলাফলও বাংলা গানের পক্ষে সৃষ্টিশীল ও সুদূরপ্রসারী হয়েছিল।

সমাজ পরিবর্তনের সঙ্গে গানের এই সঙ্গত্ নতুন কিছু নয়। সবদেশেই নতুন গান বা সঙ্গীতের তত্ত্ব জেগে ওঠে দেশকালের নবীন আকাঙ্ক্ষা থেকে অর্থাৎ শিল্পী ও শ্রোতার যৌথ চাহিদায়। সেই কারণেই একদা য়ুরোপীয় নবজাগরণের সূত্রে সংগীত মুক্তি পেয়েছিল রাজতন্ত্র ও চার্চের আওতা থেকে ব্যক্তিতন্ত্রে। যোহান সেবাস্টিয়ান বাখ্ থেকে শুরু করে হ্বাগনার বেতোফেন পর্যন্ত পাশ্চাত্য সংগীতে সেই স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম চলেছে। তার মাঝখানে লেগেছে জার্মান রোমান্টিক আন্দোলনের অন্তর্মনা গভীরতা ও সৌন্দর্যরহস্য। সমাজবিজ্ঞানীদের চোখে না প'ড়ে পারে না যে, যে সময়ে ডারুইনের বিবর্তনবাদ আর ফ্রয়েডের মনোবিকলন-তত্ত্ব মানবস্বভাব ও মানবদেহের অন্তঃশীল গূঢ় গোপনতাকে ধরতে চাইছে সেই সময়েই পিয়ানো যন্ত্র শ্রেষ্ঠতা ও জনপ্রিয়তা অর্জন করছে। আত্মস্থ দৃষ্টিতে বোঝা যায়, একই সময়ের উন্নত বিশ্বমন চাইছে ডারুইনের তত্ত্বে মানুষের ক্রমবিকাশের সূক্ষ্ম সূত্র বুঝতে, ফ্রয়েডের ভাবনায় অন্তর্মনের তরঙ্গসংকুল জট খুলতে এবং পিয়ানোর অনুপুঙ্খ সুরের চাবি দিয়ে মানবহৃদয়ের না-বলা বাণীকে ব্যক্ত করতে। এ সবের একটাই লক্ষ্য—আত্মআবিষ্কার ও আত্মপ্রকাশ।

বাংলা সংগীতের ক্ষেত্রে এই আত্মআবিষ্কার ও প্রকাশের আততি বিশেষভাবে যে উনবিংশ শতাব্দীতেই জেগে উঠেছিল সে তো ঐতিহাসিকভাবে সত্য। তার মূলে নবজাগরণ না ইংরেজ সংসর্গ, হিন্দুমেলার প্রেরণা না নাট্যমঞ্চের চাহিদা, ব্রাহ্মধর্মের উপাসনার ধরন না নিছক নান্দনিক সৃজন তা নিয়ে বিতর্ক করে লাভ নেই। কিন্তু একথা সত্য যে, সহসাই সে সময়ে বাঙালীর চিত্ত গীতসুধার জন্য পিপাসিত হয়েছিল। সংগীতস্রষ্টারা তৈরি করতে চেয়েছিলেন নতুন বাঙালীর জন্য গান, সেই গান রূপায়ণের জন্য যন্ত্রানুষঙ্গ এবং তার প্রচার ও সংরক্ষণের জন্য স্বরলিপি ও পত্র-পত্রিকার আশ্রয়। এই সময়েই বাঙালী সংগীতকাররা প্রাদেশিক ও মার্গ গীতধারা সমীকরণ করে তৈরি করতে চেয়েছেন বাংলা গানের বিশিষ্ট রূপবন্ধ ও গায়ন, মেলাতে চেয়েছেন দেশি বিদেশি যন্ত্রের স্বভাবকে, সৃষ্টি করেছেন নতুন তাল। গানের ভাবকেও নানা বৈচিত্র্যে ও নিরীক্ষায় স্বতোশ্চল রেখেছেন গীতকাররা।

ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান হাত মিলিয়েছেন বাঙালীর গানের স্বরূপ সন্ধানে। আজকে সময় এসেছে বাংলা গানের সেই প্রস্তাবনা যুগের প্রয়াসকে ইতিহাসের ক্রমে ফেলে বুঝে নেবার। কেননা বাংলা গান বাঙালীর সবচেয়ে স্বাভাবিক উত্তরাধিকার ও অর্জন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর সূচনা পর্যন্ত, মূলত রাজনৈতিক অ-স্থিরতায়, বাংলাদেশে অবক্ষয়ের লক্ষণ দেখা দিয়েছিল। মানবতার শোচনীয় ও অপমানিত অস্তিত্ব, নারীজাতির অশ্রুসর্বস্ব বন্দীত্ব, স্থূল অশ্লীলতার প্রতি পক্ষপাত, দেশীয় ঐতিহ্যবিহীন ভাবনা ও অপরিকল্পিত সাহিত্যসৃষ্টি প্রভৃতি অবক্ষয়ের মধ্যে বাংলার দেশগত ও জাতিগত কোনো বিশেষত্ব ছিল না। রামমোহন-বিদ্যাসাগর-দেবেন্দ্রনাথ-মধুসূদন-বঙ্কিমচন্দ্রের কয়েক দশক ব্যাপী জীবনসাধনার মূলমন্ত্র ছিল দেশের এই আত্মদৈন্য মোচন করে নবভাবের প্রবর্তন। সেই প্রবর্তনা কখনও বুদ্ধি ও যুক্তির পথে প্রাগ্রসর হয়েছে, কখনও স্বদেশীয় মহৎ ধর্মাদর্শের মার্গে, আবার কখনও বিদেশী চিন্তানায়কদের নির্দেশিত পথে সঞ্চারিত হয়েছে। তারই পরিণামে নারীত্বের তথা মানবতার স্বীকৃতি, ধর্মনিরপেক্ষ শুভবুদ্ধি, দেশীয় ঐতিহ্যভাবনা ও বিদেশি নবভাবনার সমীকরণ প্রভৃতির মাধ্যমে বিশিষ্টভাবে বাংলা ও বাঙালীব প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়েছে। তৎকালীন সমাজ, রাষ্ট্র, সাহিত্য ও সমগ্রভাবে চিন্তাধারায় সেই নবভাববন্যার সংরাগ যদি প্রকৃতই নবীনতার জনয়িতা হয়ে থাকে, তবে বাংলা সংগীতধারায় সেই নবজন্ম কতখানি ব্যাপ্ত ও কী পরিমাণ সৃজনধর্মী তার বিশ্লেষণ অবশ্যকর্তব্য।

ঐতিহাসিক বিচারে বলা হয়, রামপ্রসাদী গানের পরই বাংলাগানের সৃজনপর্ব অবক্ষয়ের সম্মুখীন হয়েছিল। কেননা উত্তর-রামপ্রসাদ বাংলা গানে ব্যক্তির মহৎ ভাবাদর্শের পরিবর্তে প্রাধান্য পেয়েছিল একধরনের ঐহিক তারল্য ও স্থূল ইন্দ্রিয়তন্ত্র। গানের বাণীতেও অশালীনতার সংক্রাম ঘটেছিল। অর্থাৎ, লৌকিকতার প্রতি অতি-আনুগত্য অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতাব্দীর যুগসন্ধিক্ষণের গীতিকারদের আবহমান সাংগীতিক ঐতিহ্য থেকে ভ্রষ্ট করে জনমনোরঞ্জনের তরল প্রচেষ্টার অভিমুখী করেছিল। সেই কারণেই কবিগান, হাফ্-আখড়াই, তরজা, খেউড, পক্ষীদলের গান প্রভৃতি গীতরীতিতে সৃজনের মত্ততা আছে কিন্তু সৃষ্টির শুদ্ধতা নেই। সে সময়ের গান ভাবের বিচারে নিরাবেগ ও অশালীন, বাণীর বিচারে আনুপ্রাসিক ক্লান্তিময়। গীতরূপায়ণেও প্রাধান্য ছিল তালোন্মত্ত চিৎকৃত উৎসাহের। অতঃপর, নীলকণ্ঠের মতো সমকালীনতার তীব্র গরলটুকু আত্মসাৎ করে যিনি সৃষ্টির অমৃত পদ্ম প্রস্ফুটিত করলেন তিনি রামনিধি গুপ্ত বা নিধুবাবু।

অবক্ষয়ের কালে বাস করেও নিধুবাবু (১৭৪১-১৮৩৯) যে সার্থক সৃষ্টিধর্মী ছিলেন তার কারণ মুখ্যত তাঁর শিল্পী-ব্যক্তিত্ব, কিন্তু গৌণত তাঁর দীর্ঘ জীবন। প্রায়-শতায়ু জীবনক্রমায় তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন : ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল রচনা, রামপ্রসাদের সাধনসংগীতের স্বর্গ, পলাশির যুদ্ধ, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তজনিত জমিদারী বিপর্যয়, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপন, ছাপাখানা ও বাংলা গদ্যের সূচনা, রামমোহনের বেদান্তচর্চা, ইয়ংবেঙ্গলের উন্মাদনা প্রভৃতি বিচিত্র অভিজ্ঞতা। সেই অভিজ্ঞতার সারদর্শী নিধুবাবু হয়ে উঠেছিলেন একজন ব্যক্তিমানুষ। সেইজন্য বাংলা সংগীতকে অবক্ষয়ের বৈচিত্র্যহীনতা থেকে মুক্তিদানের উদ্দেশ্যে তিনি ভাবের দিক থেকে গ্রহণ করলেন লিরিকের মন্ময় আবেগ এবং রূপায়ণের অভিনবত্ব ফোটালেন পশ্চিম ভারতীয় টপ্পা-রীতির অন্তর্ময় লাবণ্যস্পর্শে। প্রসঙ্গত স্মরণীয় যে, লিরিকের মন্ময় সৌন্দর্য বাংলা সংগীত ও সাহিত্যে নিধুবাবুর আগে প্রকৃষ্টভাবে ফুটে ওঠেনি এবং পাঞ্জাবী টপ্পার রূপকল্প নিধুবাবুর আগে বাংলাগানে অজ্ঞাত ছিল। এই বিশেষ সংগীতের স্বরূপ অনুশীলন ও স্বীকরণের জন্য তিনি দীর্ঘকাল প্রবাসে অবস্থান করেছিলেন। তাঁর পরবর্তীকালের সার্থক গীতিকারদের (যেমন : রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল ও অতুলপ্রসাদ) রচনায় লিরিকের মন্ময় সৌন্দর্য ও টপ্পার দানা—এই দুইটি বারবার ব্যবহৃত হয়েছে। এইজন্য নিধুবাবু বাংলা সংগীতে ক্রান্তিকালের যুগন্ধর শিল্পী। সংগীতের ভাব ও রূপের ক্ষেত্রে তাঁর নবীন চিন্তা পরবর্তীকালে পথিকৃৎ হয়েছে।

অবশ্য কোনো দেশের সাংগীতিক পশ্চাদ্‌গামিতা কোনো-একজন ব্যক্তি-শিল্পীর একক সাধনায় মোচন হয় না, সেজন্য প্রয়োজন হয় দেশব্যাপী সচেতন জাগৃতি ও সামগ্রিক সক্রিয়তা। সাংগীতিক নবজন্ম সামগ্রিকতার বোধ থেকে উৎসারিত হয়। বাংলাদেশে উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক থেকে সেই সম্মিলিত উদ্যমে ব্যাপক সংগীত-আন্দোলনের সূচনা ঘটে। সে আন্দোলন কখনও নিতান্ত ব্যক্তিগত উদ্যম, কখনও প্রাতিষ্ঠানিক, কোথাও সংগীতবিষয়ক পত্রিকাপ্রকাশের দায়িত্বগ্রহণ, কোথাও সার্বজনিক স্বরলিপি-পদ্ধতি আবিষ্কারের সাহায্যে গীতপ্রচারের কর্তব্যপ্রণোদিত শুভবুদ্ধি। তৎকালীন সংগীত-আন্দোলনের বিভিন্ন কার্যকলাপের অন্তরালে বাংলা-দেশে আধুনিক নানা গীতরীতি এবং স্বরূপত সত্যিকারের বাংলাগান উজ্জীবিত হয়ে উঠেছে। সর্বোপরি স্মরণীয় যে, এই আন্দোলনের পরিণতি ও প্রভাব হয়েছে ব্যাপক ও বিস্তৃত। তার প্রমাণস্বরূপ দেখা যায়, এই সংগীত-আন্দোলনের নেপথ্যভূমি থেকে ও প্রত্যক্ষভাবে উপাদান সংগ্রহ করে রবীন্দ্রনাথ-দ্বিজেন্দ্রলাল-রজনীকান্ত-

অতুলপ্রসাদ-নজরুলের রচিত ও সুরারোপিত গানগুলি বাংলার সারস্বত সাধনায় শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্যরূপে নিবেদিত হয়েছে।

### সংগীত-চিন্তায় নবভাবনা

উনবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশে সংগীতক্ষেত্রে যে সব নবভাবনা ও নবপ্রয়াস ঘটেছিল তার একটি সংক্ষিপ্ত উল্লেখপঞ্জী সম্মুখে রেখে, সে ব্যাপারে তৎকালীন বিভিন্ন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান ও কর্মীদের সক্রিয় ভূমিকা স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করা প্রয়োজন। এই পর্বের সাংগীতিক প্রয়াসগুলি ছিল প্রধানত :

এক. নতুন যুগের ভাবানুযায়ী গান রচনা ( ভাব ও ভাষা উভয়তই ) এবং সেই গানের ভাবের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ-গীতরীতির-অনুসরণ। এই প্রচেষ্টা থেকেই মূলত খেয়াল, ধ্রুপদ, টপ্-খেয়াল, টপ্পা প্রভৃতির প্রবর্তন ও ক্রমোৎকর্ষ ঘটে। নতুন তালেরও ( যেমন মধ্যমান, বাংলা একতাল ও বাংলা আড়া বা পোস্তা ) উদ্ভব ঘটে।

দুই. অর্কেস্ট্রা, হার্মনি, অপেরা প্রভৃতি বিদেশাগত সুরবৈশিষ্ট্য বা গীতরীতি সুসমঞ্জসরূপে বাংলাগানে গ্রহণ ও ভাবপ্রকাশের নতুন উপাদানরূপে ব্যবহার।

তিন. দেশে-বিদেশে প্রচলিত নানাপ্রকার স্বরলিপি-পদ্ধতির সারাৎসার করে সর্বজনবোধ্য, সরল ও স্বল্পব্যয়ে মুদ্রণোপযোগী একটি স্বরলিপি-পদ্ধতি প্রণয়ন এবং তার সাহায্যে বাংলা ও ভারতীয় গানের প্রচার ও সংরক্ষণ।

চার. সংগীতবিষয়ক পত্রিকা প্রকাশের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের মনে সংগীত সম্পর্কে অনুরাগ ও কৌতূহল সৃষ্টি এবং সংগীত সংক্রান্ত প্রচার।

পাঁচ. সংস্কৃতভাষায় লিখিত সংগীতবিষয়ক প্রামাণিক কোষগ্রন্থসমূহের বঙ্গানুবাদ, সংগীত সংক্রান্ত নতুন গ্রন্থ রচনা, ভারতীয় ও আন্তর্জাতিক সংগীতের ইতিহাস প্রণয়ন।

ছয় প্রাক্তন গীতিকারদের জীবনী রচনা ও গীতসংকলন সম্পাদনার সাহায্যে দেশের প্রবহমান গানের সঙ্গে নবীন সংগীতোৎসাহীদের মেলবন্ধন।

সাত. সংগীত উন্নয়নী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংগীত বিদ্যালয় স্থাপন করে প্রত্যক্ষভাবে তরুণ শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদান, সংগীত প্রচার ও স্বদেশে সংগীতের মানোন্নয়নের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি।

আট. ভারতীয় কণ্ঠসংগীত ও যন্ত্রবাদ্যের কালানুক্রমিক ইতিহাস ও বিবরণ

ইংরাজি ভাষায় রচনা করে, জগৎসভায় ভারতীয় সংগীতের বহু শতাব্দীবাহিত ঐতিহ্যের পরিচয় প্রদান।

নবভাবনার রূপায়ণ : ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান

সমগ্র উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে এমন অনেক মহৎ কর্মীপুরুষ জন্মেছেন এবং স্বদেশ ও স্বসমাজের উন্নতি বিধানে আজীবন সাধনা করেছেন যে, সেই সময়ের ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান শব্দদুটি প্রায় সমার্থক ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করে। অর্থাৎ, সে যুগের ব্যক্তিরাই ছিলেন এক একটি প্রতিষ্ঠান। বাংলা সংগীতের নবজন্মের ক্ষেত্রেও ব্যক্তিত্বের এই দ্বৈত-ভূমিকা লক্ষণীয়।

কালক্রমের দিক থেকে উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সংগীত আন্দোলনে প্রথম উল্লেখযোগ্য নাম : রাধামোহন সেন। আনুমানিক ১৬৭৪ খৃষ্টাব্দে লিখিত মির্জা খানের 'তুহ্ফাৎ-উল্-হিন্দ্' নামে পার্শিভাষায় লেখা সংগীতকোষ অবলম্বনে তিনি বাংলাভাষায় সর্বপ্রথম সংগীতের কোষগ্রন্থ ভাষান্তরণ করেন। এই গ্রন্থের নাম 'সঙ্গীত তরঙ্গ'। ১২২৫ বঙ্গাব্দের ২৫শে আষাঢ় (ইং ১৮১৮ খৃষ্টাব্দ) তারিখে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়।

ভূমিকায় রাধামোহন লিখেছেন :

সংগীত বিদ্যার বহুতর গ্রন্থ হয়।
তাবতের ভাষা কবা যুক্তিযুক্ত নয়॥
অতএব কতগুলি গ্রন্থকে ভাঙ্গিয়া।
প্রকাশ কবিব আমি নানা ভাষা দিয়া॥

লেখকের সঙ্কল্প অনুধাবন করলে বোঝা যায়, 'সঙ্গীত তরঙ্গ' আসলে ভারতের সংগীত-আকর-গ্রন্থের সারানুবাদ প্রয়াস। তার সমর্থন মেলে রাধামোহনের আরেকটি মন্তব্য :

সঙ্গীত দর্পণ আর দেখ দামোদর।
রত্নাকর মকরন্দ রূপ রত্নাকর॥
মান কুতূহল সভা বিনোদ সঙ্গীত।
পারিজাতক প্রভৃতি গ্রন্থ বিরচিত॥

গত শতাব্দীর আরেকটি উল্লেখযোগ্য সংগীতের কোষগ্রন্থ কৃষ্ণানন্দ ব্যাস-কৃত 'সঙ্গীতরাগকল্পদ্রুম' (১৮৪৩) বিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক।

রাধামোহনের পরে উল্লেখযোগ্য ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী ( ১৮২৩-৯৩ ) ও রাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের ( ১৮৪০-১৯১৪ ) নাম। সংগীতের পরম ভক্ত, পণ্ডিত ও প্রচারক হিসাবে তাঁদের সমপর্যায়ের ব্যক্তি যে কোনো দেশেই বিরল। এই দুই অসামান্য সংগীতবেত্তা প্রাচীন হিন্দু সংগীত ও ভারতীয় যন্ত্রসংগীতের স্বাতন্ত্র্য প্রচারে আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন। বিবরণে পাওয়া যায়, রাজা শৌরীন্দ্রমোহন একটি 'মিউজিক অ্যাকাডেমি'র সূচনা করেন। সেখানে ভারতীয় কণ্ঠসংগীত ও যন্ত্রসংগীতের কয়েকজন সার্থক শিল্পী ছাড়াও কয়েকজন সংস্কৃতভাষায় বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতকেও গ্রহণ করা হয়েছিল। শেষোক্তদের কাজ ছিল সংস্কৃত সাহিত্যধারা থেকে ভাবগ্রহণ করে উচ্চ ভাবধারার গান রচনা। এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান কর্মীদের মধ্যে ছিলেন শৌরীন্দ্রমোহন স্বয়ং, ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী, লছমীপ্রসাদ মিশ্র ও কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়। দশ বছরের পরিশ্রমে এই প্রতিষ্ঠানের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় 'সংগীত-সার' ( ১৮৬৯ ), 'যন্ত্র-ক্ষেত্র-দীপিকা' ( ১৮৭২ ), 'কণ্ঠ-কৌমুদী' ( ১৮৭৫ ) গ্রন্থ তিনটি এবং জয়দেবের গীতগোবিন্দের অন্তর্গত কয়েকটি গানের স্বরলিপি ( ১৮৭১ )। শৌরীন্দ্রমোহন নিজে অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা ও সম্পাদনা করেন। তিনি বিশেষভাবে ভাবিত ছিলেন হিন্দুসংগীতে পাশ্চাত্য হার্মনির সংযোগ প্রতিষ্ঠায়। এই প্রসঙ্গে তাঁর রচিত 'The musical scales of the Hindus with remarks on the applicability of harmony to Hindu music' গ্রন্থটির চিন্তাধারার নবভাবনা স্মরণীয় হয়ে আছে। হিন্দু সংগীত সম্পর্কে পাশ্চাত্য সংগীতবেত্তাদের মতামত তিনি সযত্নে সংগ্রহ করে সংকলন করেন 'Hindu music from various authors' গ্রন্থে। হিন্দু সংগীতের মহিমা ও ঐতিহ্য সম্পর্কে সাধারন মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্য তিনি এই গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এই পরিকল্পনা তাঁর দেশানুরাগ ও দেশীয় সংগীতের প্রতি শ্রদ্ধার অবিস্মরণীয় স্মারক। কিন্তু সংগীত সম্পর্কে রাজা শৌরীন্দ্রমোহনের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি 'Universal history of music' গ্রন্থ-রচনা। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে, যখন বিশ্বের ইতিহাস রচনার উপাদান ছিল অপ্রতুল সেই সময় তিনি যে অমানুষিক শ্রমে এ-গ্রন্থ রচনা করেছেন তাতে মূর্ত হয়েছে তাঁর ইতিহাসবোধ তথা বিশ্ববোধ। সেইসঙ্গে ফুটে উঠেছে সংগীতের ক্ষেত্রে পারস্পরিক ভাব বিনিময়ের আগ্রহ ও চিত্তের ঔদার্য। সৌভাগ্যত, শৌরীন্দ্রমোহন তাঁর দায়িত্বের গভীরতা সম্পর্কে সচেতন মন্তব্য করেছেন গ্রন্থটির ভূমিকায় :

> 'The study of music of various nations is advantageous to the musicians for a number of reasons. The study is important from an ethnological point of view, as it affords him an insight into the inward man, and displays the character and temperament of different races, and the relation they bear to one another. It is also important from a historical standpoint, for it shows the different stages of progress which music has made in different countries.'

রাজা শৌরীন্দ্রমোহনের রচনাবলী সম্পূর্ণত ইংরাজি ভাষায় লিখিত; তার কারণ, এই সব রচনার মূল উদ্দেশ্য বিশ্বের সংগীতসভায় ভারতীয় সংগীতের পরিচয় প্রদান এবং ভারতীয় সংগীত সম্পর্কে বিশ্ববাসীর সশ্রদ্ধ মন্তব্য উন্নাসিক ও ঐতিহ্যভ্রষ্ট ভারতীয়দের সম্মুখে উপস্থাপন।[১]

শৌরীন্দ্রমোহনের পর বাংলার সংগীতক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় ( ১৮৪৬-১৯০৪ )। স্বদেশে সংগীত প্রচারের জন্য তিনি আত্মদান করেছেন বললে ভুল হয় না। জীবনের অপরাহ্নে লেখা তাঁর একটি পত্রাংশে তাঁর গীতাত্মপ্রাণ আত্মজীবনীর প্রকৃত চিত্র ফুটে উঠেছে। তিনি লিখেছেন :

> আমি একসময়ে সঙ্গীতে পাগল হইয়াছিলাম। সঙ্গীতচর্চার জন্য উপযুক্ত সাবকাশ পাইতাম না বলিয়া, আমি বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের অধীনে

১ প্রসঙ্গত শৌরীন্দ্রমোহন রচিত ইংরাজি ও বাংলা ভাষায় সংগীতগ্রন্থগুলির কালানুক্রমিক তালিকা দেওয়া গেল :

1. Hindu music from various authors 1875 2. Short notices of Hindu musical instruments 1877 3. Six principal ragas, with a brief view of Hindu music 1877 4. A few specimens of Indian songs 1879 5. Eight tunes 1880 6. The musical scales of the Hindus 1884 7. The twenty-two musical Srutis of the Hindus 1886 8. Six ragas and thirty-six raginis of the Hindus 1887 9. Uuiversal history of music 1896

১ জাতীয় সঙ্গীত বিষয়ক প্রস্তাব ১৮৭০ ২ যন্ত্রক্ষেত্রদীপিকা ১৮৭২ ৩ মৃদঙ্গমঞ্জরী ১৮৭৩ ৪ হারমোনিয়াম সূত্র ১৮৭৪ ৫ যন্ত্রকোষ ১৮৭৫ ৬ ভিক্টোরিয়া গীতিমালা ১৮৭৭ ৭ গীতপ্রবেশ ১৮৮৩ ৮ সঙ্গীতশাস্ত্রপ্রকাশিকা ১৮৮৪ ৯ নৃত্যাঙ্কুর ১৮৮৫

ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পদ পরিত্যাগ করিয়াছিলাম, যে-পদ এখন লোকে মাথা খুঁড়িয়াও পায় না।[২]

কৃষ্ণধনের ইচ্ছা ছিল য়ুরোপীয় সাংকেতিক স্বরলিপি এদেশে প্রচার করা। সেজন্য তিনি বহু চেষ্টা করেন এবং বহু অর্থব্যয়ও করেন, কিন্তু তাঁর ইচ্ছা সাফল্যমণ্ডিত হয়নি। কেননা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রবর্তিত আকারমাত্রিক স্বরলিপি শেষপর্যন্ত সকলে গ্রহণ করেন। সে প্রসঙ্গ অন্যত্র ব্যাপকভাবে আলোচিত হবে। আপাতত স্মরণীয় যে, কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পূর্ণ নিজ ব্যয়ে অনেকগুলি সংগীতবিষয়ক গ্রন্থ প্রকাশ করেন। ১৮৬৭ সালে প্রথম প্রকাশ পায় 'বঙ্গৈকতান'। এই গ্রন্থে ছিল ঐকতান বাদ্যের গৎ। ১৮৬৮ সালে প্রকাশ পায় 'Hindusthani Airs arranged for the Pianoforte' ও 'সংগীতশিক্ষা' নামে দুটি বই। ১৮৭৩ সালে প্রকাশ পায় 'সেতারশিক্ষা'। এইসব গ্রন্থরচনার পশ্চাদপটে পাশ্চাত্য সুরকে এদেশী গানে গ্রহণ করবার এবং দেশী-বিদেশী যন্ত্রসংগীত সম্পর্কে তাঁর উৎসাহের প্রমাণ মেলে। কিন্তু কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি 'গীতসূত্রসার' (১৮৮৫)। নানা অসুবিধার মধ্যে দীর্ঘ দশ বছরের শ্রমে আরব্ধ উনবিংশ শতাব্দীর এই মহৎ গ্রন্থ ভারতীয় সংগীতের ঔপপত্তিক ও ক্রিয়াত্মক উভয়তই আজ পর্যন্ত শ্রেষ্ঠ। ভূমিকার সূচনায় লেখক উল্লেখ করেছেন: 'কণ্ঠে গীতচর্চার বিস্তৃতি ও উৎকর্ষ বিধানার্থ এই পুস্তক প্রণীত ও প্রকাশিত হইল।' ভূমিকার শেষে লেখক জানিয়েছেন: 'এই পুস্তকদ্বারা স্বদেশীয় একটি লোকেরও বিশুদ্ধ সংগীতজ্ঞানের, ও গান শক্তির উন্নতি সাধিত হইলে, শ্রম সফল জ্ঞান করিব'। কৃষ্ণধনের এই আবেগ ও আকুতি মর্মস্পর্শী। তাঁর অসামান্য স্বাদেশিকতা ও গীতপ্রীতির অভিজ্ঞান 'গীতসূত্রসার'-এর পাঁচশত পৃষ্ঠা।

বাংলা সংগীতের নবরূপায়ণ ও প্রচার ব্যাপারে সর্বাগ্রগণ্য ছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪৮-১৯২৫)। নিজে অপেরা ঢঙে নাটক রচনা করে এবং কিশোর রবীন্দ্রনাথের কাছে দেশি-বিদেশি সংগীতের দ্বার উন্মুক্ত করে তিনি বাংলার সংগীত-ক্ষেত্রে প্রবক্তার গৌরব অর্জন করেছেন। কিন্তু জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্ব ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকেনি, নানা প্রতিষ্ঠান ও সংগীত উন্নয়নী সভার কাজে ব্যাপ্ত হয়েছিল। অর্কেস্ট্রা প্রবর্তন, সংগীত পত্রিকা সম্পাদন, সংগীত সমাজ স্থাপন, স্বরলিপির সরলীকরণ প্রভৃতি নানা কাজে তাঁর যুগান্তকারী শিল্পবুদ্ধি

২ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লিখিত। গীতবিতান বার্ষিকী, ১৩৫০। পৃ ২৫

সার্থকতা দেখিয়েছে। নিজের জীবনস্মৃতিতে নবীন সংগীত সৃষ্টি সম্পর্কে তাঁর আগ্রহ প্রকাশ করেছেন এই বলে :

> কি সৌখীন কি পেশাদার কোনও গায়কের কোনও গান ভাল লাগিলেই, অমনি সেটি টুকিয়া লইয়া, আমরা ব্রহ্মসঙ্গীত রচনা করিতে বসিতাম। এইরূপে ব্রহ্মসঙ্গীতে অনেক বড় বড় ওস্তাদী সুর ও তাল প্রবেশলাভ করিয়াছে।

লক্ষণীয় যে, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সে-যুগের অন্যান্য সংগীতবেত্তাদের মতো সংগীতের ইতিহাস বা কোষগ্রন্থ রচনা করেননি, কেননা তাঁর দৃষ্টি ছিল মূলত প্র্যাকটিকাল। সেইজন্য সংগীতকে প্রত্যক্ষভাবে সাধারণ্যে প্রচার করাই ছিল তাঁর ধ্যান ও ব্রত। ১৮৯৭ সালের জুন মাসে তিনি ১৬৮টি গানের স্বরলিপি সংকলন করে যে 'স্বরলিপি গীতি-মালা' প্রকাশ করেন, প্রসঙ্গত সেই গ্রন্থ থেকে একটি উদ্ধৃতি লক্ষ করা যেতে পারে :

> যদি কোনো শিক্ষার্থী স্বরলিপির কোনো অংশ ঠিক বুঝিতে না পারেন, তাহা হইলে আমাকে পত্রের দ্বারা জানাইলে আমি তাহা বুঝাইয়া দিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিব। অথবা গ্রন্থস্থিত কোনো গান যদি মৌখিক শুনিতে ইচ্ছা করেন, কিংবা নিয়মিতরূপে গান শিক্ষা করিতে চাহেন, তাহা হইলে তাহারও বন্দোবস্ত করা যাইতে পারে।

উদ্ধৃত বিজ্ঞপ্তিতে যে সদিচ্ছা ব্যক্ত হয়েছে তাতে সংগীতপ্রাণ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রকৃত পরিচয় ফুটে উঠেছে। বাংলাদেশের সংগীত উন্নয়নে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের আগ্রহ ও আবেগ আরও সার্থকভাবে ব্যক্ত হয়েছিল 'আদি ব্রাহ্মসমাজ সংগীত বিদ্যালয়' এবং 'ভারত সংগীত সমাজ' নামে দুটি সংগীত প্রতিষ্ঠানের প্রবর্তন ও পরিচালনার মধ্যে।[৩]

'আদি ব্রাহ্মসমাজের ব্রহ্মসঙ্গীতের স্থায়িত্ব ও উন্নতিসাধনের জন্য' ১৮৭৫

৩ ছাত্রদের সংগীত শিক্ষাদান ও সংগীত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সর্বপ্রথম কৃতিত্ব রামনিধি গুপ্তের প্রাপ্য। জানা যাচ্ছে, 'His fame as singer spread far and wide. Young men having a penchant for music clustered around him. Unlike professional songsters, he unreservedly gave them lessons in vocal music.......Ramnidhi established a society composed mostly of youngmen, for the cultivation of music, chiefly vocal music.'

দ্রষ্টব্য : ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত রচিত কবিজীবনী, ভবতোষ দত্ত, পৃ. ৪০৫

সালের ৪ঠা জুন 'আদি ব্রাহ্মসমাজ সংগীত বিদ্যালয়' স্থাপিত হয়। এই বিরাট প্রতিষ্ঠানটি একা পরিচালনা করতেন সম্পাদক জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। সেখানে ছাত্রদের বিনাবেতনে উচ্চাঙ্গ, কণ্ঠ ও যন্ত্রসংগীত শিক্ষা দেওয়া হত। শিক্ষক ছিলেন যদুভট্ট। দুর্ভাগ্যত, ক্ষণজীবী এই প্রতিষ্ঠানটির সমগ্র কার্যবিবরণ পাওয়া যায়নি। সেই বিবরণ সংগৃহীত হলে বাংলা ধ্রুপদচর্চার প্রকৃত ইতিহাস সকলে জানতে পারবেন।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত দ্বিতীয় সংগীত প্রতিষ্ঠান 'ভারত সংগীত সমাজ' কিন্তু দীর্ঘজীবী হয়েছিল।[৪] পুণায় অগ্রজ সত্যেন্দ্রনাথের কাছে অবস্থানকালে সেখানকার 'গায়ন সমাজ' দেখে কলকাতায় অনুরূপ এক সভাস্থাপনের ইচ্ছা জাগে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মনে। 'ভারত সংগীত সমাজ' সেই ইচ্ছারই ফলিত রূপ। সমাজের উদ্দেশ্য ছিল, 'বাংলাদেশে সঙ্গীতশিক্ষা, সঙ্গীত অধ্যাপনা, প্রচার এবং বাংলার. অভিজাত ও মধ্যবিত্ত লোকদের মধ্যে সদ্ভাবস্থাপন।' সংগীতসমাজ প্রতিষ্ঠাকল্পে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এক হাজার টাকা দান করেন এবং ঠাকুর পরিবার থেকে আরো সহস্রাধিক টাকা সংগৃহীত হয়।[৫] জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ছিলেন সংগীত-সমাজের প্রথম সম্পাদক। এই প্রসঙ্গে কলিকাতার ডোয়ার্কিন কোম্পানীর স্বত্বাধিকারী দ্বারকানাথ ঘোষের নামও উল্লেখযোগ্য। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পরিকল্পনায় ইনি 'স্বরলিপি গীতি-মালা' নিজ ব্যয়ে প্রকাশ করেন। বাংলাদেশে হার্মোনিয়ম বাদ্যযন্ত্রের স্রষ্টা ও প্রবর্তক হিসাবেও দ্বারকানাথ প্রসিদ্ধ। উৎকৃষ্ট হার্মোনিয়মবাদকরূপে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সুনাম অর্জন করেন এবং ব্রাহ্মসমাজে বাংলা গানে হার্মোনিয়াম বাজিয়ে তিনি বাংলা সংগীতক্ষেত্রে পালাবদলের সূচনা করেন।

বাংলা নাটকে অর্কেস্ট্রার সার্থক প্রয়োগ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অন্যতম কীর্তি। তাঁর পূর্বে ১৮৫৮ সালে ৩১শে জুলাই বেলগাছিয়ার বাগানবাড়িতে 'রত্নাবলী' নাটকের প্রথম অভিনয় রজনীতে বাংলা অর্কেস্ট্রা সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী ও যদুনাথ পাল।[৬] কিন্তু তাঁদের উদ্যমে ঐকতানসৃষ্টির চাহিদা

ভারত সঙ্গীত সমাজ। হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ। মাসিক বসুমতী, জ্যৈষ্ঠ-শ্রাবণ ১৩৬০

৫ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি, পৃ ২১৭-২১৮

৬ **'An individual orchestra was composed of genuine ragas and raginis by Kshetramohon Gosain and Jadunath Paul.' ( First performance of Ratnavali )**

**The Theatre : Ahindra Choudhury, pp 293**

**Studies in the Bengali Resaissance**

**The National Council of Education, Bengal, Jadavpur, 1958**

ছিল গৌণ আর তাঁদের রচিত সুর ছিল ভারতীয় রাগরাগিণীর আশ্রয়ে পুষ্ট। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রয়াসে বাংলা অর্কেস্ট্রা দেশি-বিদেশি সুরের সমন্বয়ে রচিত এবং ঐকতানে রূপায়িত হয়। এই অর্কেস্ট্রা প্রথম রূপায়িত হয় জ্যোতিরিন্দ্রনাথেরই পরিচালনায় ১৮৬৭ সালের ৫ই জানুয়ারী, জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে, 'নবনাটক'-এর প্রথম অভিনয় রজনীতে। কনসার্টে যেসব বাদ্যযন্ত্র বাজানো হয়েছিল তা হল : হার্মোনিয়ম, দুই তিনখানি বেহালা, ক্ল্যারিওনেট, পিক্‌লো, বড় বাসবেহালা, করতাল, ঢোল, বাঁয়াতবলা ও মন্দিরা।[৭] দেশি-বিদেশি বাদ্যযন্ত্রের এই মিশ্র সমারোহে সেই সময়কার সংগীতজগতে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ যে-নবযুগের আভাস এনেছিলেন তার গুরুত্ব ও স্বাতন্ত্র্যের পরিমাপ আজও হয়নি।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মতো বাংলা সংগীতের উন্নতিকল্পে সকর্মক উদ্যোগী পুরুষ মনোমোহন বসু (১৮৩১-১৯১২)। বাংলা অপেরার জনয়িতা মনোমোহন বাংলাগানের সমুন্নতিকল্পে প্রধানত প্রচারকের ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। সে কালের বিভিন্ন সভাসমিতিতে তিনি বাংলা সংগীতের পক্ষে বক্তৃতা করতেন। ১২৭৩ বঙ্গাব্দে ( এপ্রিল ১৮৬৭ ) কলিকাতায় যে হিন্দুমেলার সূচনা হয়, তার অন্তর্ভুক্ত জাতীয়-মেলার দ্বিতীয় অধিবেশনে মনোমোহন ছয়টি প্রস্তাব উত্থাপন করেন, তার মধ্যে পঞ্চম প্রস্তাবটি ছিল সংগীত-প্রাসঙ্গিক। তিনি সেই প্রস্তাবে আশা প্রকাশ করেছিলেন : 'যাহাতে মেলাস্থলে বিবিধপ্রকার সঙ্গীতজ্ঞ গুনিমণ্ডলীর গুণপ্রকাশ, যন্ত্রাদির প্রদর্শন ও সঙ্গীত সম্বন্ধে দেশে সুধারার প্রবর্তন হয়'।

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাংলা রঙ্গমঞ্চে পরিবর্তনের স্পর্শ লাগে। বিদেশি নাটকের রূপরীতি এদেশের নাটকে অঙ্গীকৃত করা এবং দেশীয় যাত্রাগানের ধারার সঙ্গে বিদেশি অপেরার সাযুজ্যসাধন এই সময়ের নাট্যনির্মাতা ও প্রয়োগকর্তাদের অন্যতম উদ্‌যোগ ছিল। তারই ফলে, বাংলা নাটকে গান ও আবহসংগীতের সুষ্ঠু ব্যবহার সম্পর্কে যুগোপযোগী চিন্তাভাবনা চলতে থাকে। এই চিন্তাভাবনা ও প্রয়োগকর্মের পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরিণামে গিরিশচন্দ্র, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকে গানের যথাযথ এবং তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পরবর্তীকালে লক্ষিত হয়।

নাটকে গানের এই সঙ্গতিপূর্ণ সন্নিবেশ প্রসঙ্গের প্রথম প্রস্তাবক সম্ভবত

---

৭ "নবনাটক" নাটক হল ; জ্যোতিকা' মশাষ অর্গ্যান বাজালেন। সেইবারেই প্রথম অর্গ্যান বাজলো।'
আমাদের পারিবারিক সংগীতচর্চা : অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
গীতবিতান বার্ষিকী ১৩৫০, পৃ ১৯

মনোমোহন বসু। ১৮৭২ সালের ডিসেম্বর মাসে বাংলাদেশের জাতীয় নাট্য-শালার উদ্বোধন হয়। নাট্যশালার প্রথম সাম্বৎসরিক উৎসব সভায় মনোমোহন যে ভাষণ দেন তাতে সারা বাংলার গীতময়তার চমৎকার বিশ্লেষণ রয়েছে :[৮]

> দুইটি বিষয়ের উল্লেখ করা আপাততঃ অত্যন্ত আবশ্যক বোধ করিতেছি। তাহার প্রথমটি গীতের প্রসঙ্গ। আমাদের আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকের এরূপ সংস্কার আছে যে, নাট্যাভিনয়ে গানের বড আবশ্যক করে না। ইউরোপীয় রঙ্গভূমিতে নাটকাভিনয়কালে গানের অভাব দেখিয়াই তাঁহারা এই সংস্কারের বশতাপন্ন হইয়াছেন। কিন্তু ভারতবর্ষ যে ইউরোপ নয়, ইউরোপীয় সমাজ আর স্বদেশীয় সমাজ যে বিস্তর বিভিন্ন, ইয়োরোপীয় রুচি ও দেশীয় রুচি যে সম্যক স্বতন্ত্র পদার্থ, তাহা তাঁহারা ভাবিয়া দেখেন না। যে দেশে সকল সময়ে সকল স্থানে সকল কার্যেই গান নহিলে চলে না……সে দেশের হাডে হাডে যে সংগীতের রস প্রবিষ্ট হইয়া আছে তাহাও কি আবার অন্য উপায়ে বুঝাইয়া দিতে হইবে?
>
> আমার ক্ষুদ্র বিবেচনায় এই বোধ হয়, যে, অভিনেতৃগণ অধুনা যেরূপে অভিনয়ের নিমিত্ত যত্ন পান, তৎসঙ্গে গানের পারিপাট্য সাধনার্থ যদি তদ্রূপ মনোযোগী হইতে পারেন, তবে নিশ্চয়ই তাঁহাদের অভিনয় দর্শনসময়ে শ্রোতা ও দর্শকমণ্ডলী এককালে মোহে অভিভূত হইয়া গলিয়া যাইবেন। আমি এমন বলিতেছি না, যে, যাত্রাওয়ালারা যেমন কথায় কথায়, অর্থাৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বক্তৃতার পর কেবলই গানের আধিক্য করিয়া থাকে, নাটকেও তদ্রূপ হউক। আমার অভিপ্রায় এই, যে, স্বভাবোক্তির পর যেখানে যেখানে গান খাটিতে পারে, তাহা উক্ত স্বাভাবিক নিয়মে সংখ্যায় যতই কেন হউক না ফলতঃ যে কয়টি গান হইবে, সে কয়টি যেন উত্তমরূপে গাওয়া হয়। ফল কথা, আমরা মধ্যস্থ মানুষ; আমরা চাই, দেশে পূর্বে যাহা ছিল, তাহার ধ্বংস না করিয়া তাহাকে সংশোধিত করিয়া লও।'

ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশের সর্বপ্রকার নবভাবনার মূলমন্ত্র ছিল,

৮ সাহিত্য সাধক চরিতমালা : ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৫১ খণ্ড

পূর্বাগত ধারাকে বিলোপ না করে নতুন যুগের উপযোগী পরিমার্জিত রূপান্তর সাধন। এই পরিমার্জনের জন্য আদর্শ হিসাবে গৃহীত হয়েছে কখনও ভারতের অন্য প্রদেশের পূর্বাগত ধারা ও সংস্কৃত মহৎ ঐতিহ্য, কখনও বৈদেশিক ধারা। বাংলা সংগীতের নবভাবনাতেও এই পরিমার্জন-সংস্কার ব্যাপারে ভাবের দিক থেকে আদর্শ হিসাবে গৃহীত হয়েছিল ঔপনিবদিক মহৎ গাম্ভীর্য; রূপের দিক থেকে গৃহীত হয়েছিল উদাত্ত ধ্রুপদ, উচ্ছল খেয়াল ও অন্তর্ময় টপ্পা। বিদেশি সংগীতের রূপরীতি, বিশেষত অপেরার ভঙ্গীও বাংলা গানে বিশেষ আদর্শরূপে গৃহীত হয়েছিল।

অবশ্য অন্য প্রদেশের গীতধারা বাংলাগানে গ্রহণ করবার জন্য গত শতাব্দীর যেসব বাঙালী সংগীতব্রতী সক্রিয় অনুশীলন করেছিলেন তাঁদের সকলের নাম জানা যায় না। ব্যক্তিগত সাধনার নীরব প্রাঙ্গণ থেকে তাঁরা কদাচিৎ সাধারণ্যে আত্মপ্রকাশ করতেন। কিন্তু তাদের কর্মসাধনার পরোক্ষ প্রভাব এখনকার বাংলা গানেও পাওয়া যায়। পাঞ্জাবী টপ্পাকে বাংলা গানে প্রয়োগ করে কীর্তিমান হয়েছেন নিধুবাবু এবং বাংলা গানের সঙ্গে য়ুরোপীয় স্বরের পরিণয়সাধনে আচার্যের ভূমিকা নিয়ে প্রসিদ্ধ হয়েছেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। এঁদের তুলনায় অপেক্ষাকৃত স্বল্পজ্ঞাত যে-দুজন উদ্যমী সংগীতশিল্পীর নাম উল্লেখযোগ্য তাঁরা হলেন কালী মির্জা ও মহেশ মুখুজ্যে।

কালী মির্জা (১৭৫০-১৮২০) (কালিদাস চট্টোপাধ্যায়) অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীর একজন গায়ক ও গীতরচয়িতা। সংস্কৃত ও পার্শি ভাষায় তাঁর বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। উনিশ-কুড়ি বছর বয়সে কাশী গিয়ে তিনি বেদান্ত ও সংগীতচর্চা করেন। উত্তরভারতীয় গীতরীতির ব্যাপকতর চর্চার জন্য পরে তিনি লক্ষ্ণৌ ও দিল্লী যান। ত্রিশ-বত্রিশ বছর বয়সে বাংলাদেশে ফিরে সংগীত রচনা ও শিক্ষা দান করে বাকি জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। কালী মির্জার কাছে রামমোহন রায় সংগীত শিক্ষা করেন বলে শোনা যায় এবং 'মির্জা মহাশয়ের সমীপে সঙ্গীত-শিক্ষা সময়ে মহাত্মা রামমোহনের হৃদয়ে অদ্বৈতবাদিতার বীজ প্রথম রোপিত হয়'—এই তথ্য স্মরণীয়।[৯]

মহেশ মুখুজ্যে উনবিংশ শতাব্দীর সপ্তম দশকের একজন বিশিষ্ট সংগীতজ্ঞ। টপ্পা ও টপ্‌খেয়াল সংগীতে তিনি ছিলেন সে যুগের শ্রেষ্ঠ গুণী। পাঞ্জাবী টপ্পা ও

৯ দ্রষ্টব্য. ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত রচিত কবিজীবনী : ভবতোষ দত্ত, পৃ. ৪৩৯

গোয়ালিয়র ঘরানার ধ্রুপদ-খেয়াল সম্পর্কে প্রত্যক্ষ শিক্ষালাভ করতে তিনি গোয়ালিয়র যান এবং পশ্চিমী টপ্পার একজন পারদর্শীরূপে বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। পরবর্তীকালে তাঁর শিক্ষাদানে বাংলা সংগীতে পশ্চিমী টপ্পার শ্রেষ্ঠ নিদর্শনগুলি (অর্থাৎ, শোরী, হামেদুন ও মস্ত্ বুলবুল-এর বিখ্যাত গান) সমীকৃত হয়।[১০]

উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার নবজাগরণে বহু প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তি এবং বহু প্রতিষ্ঠান (যেমন তত্ত্ববোধিনী সভা, স্কুল বুক সোসাইটি, হিন্দুমেলা, সঞ্জীবনীসভা প্রভৃতি) সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ঠিক তেমনই বাংলা সংগীতের নবজাগরণে বহু প্রখ্যাত গীতিকার, গায়ক ও নাট্যকার ছাড়াও বহু সংগীত উৎসাহী কর্মী ও প্রতিষ্ঠান দেশের সংগীত উন্নয়নে আত্মদান করেছেন। তাঁদের সাধনা ও সঙ্কল্পের পূর্ণ পরিচয় প্রকাশিত হলে আমাদের স্বদেশসাধনার এক নব ইতিহাস জানা যাবে।[১১]

সংগ্রহ ও সংকলন : সংরক্ষণ

রেনেশাঁসের অন্যতম লক্ষণ ইতিহাসচেতনা এবং সেই চেতনার পরিচয় ফুটে ওঠে দেশের অতীতের প্রতি নব দৃষ্টিপাতে, প্রাক্তন ঐতিহ্যের নতুন ব্যাখ্যা ও সংরক্ষণ প্রবণতায়। এই অর্থেই রেনেশাঁসের নামান্তর পুনর্জন্ম বা নবজন্ম। কোনো জাতি যখন ভাবতে পারে : তাদের কী ছিল, কী হয়েছে এবং কী তাদের হওয়া দরকার, তখন সেই জাতির ঘটে নবজাগরণ তথা নবজন্ম।

১০ 'About early seventies, Mahes Mukherji, the most talented specialist of Tappa and Tap-khyal of those times, had gone to Gwalior to learn at first hand the techniques of Panjabi Tappa and Gwalior patterns of Dhrubapada and Khyal, and came back as a full-fledged artist of Western Tappa consisting principally of songs of Shori, Hamedun and Mast-Bulbul, three greatest composers of Tappa. This Mahes Ostad turned out as a regular professional artist, and he was practically the originator of the finished style of Bengali Tappa and Tap-Khyal.'

Music and Song: Amiyanath Sanyal. Studies in the Bengali Renaissance 1958. pp 311

এই নবজন্মের ভিত্তি আসলে এক অবিচ্ছিন্ন পারম্পর্যের বোধ, যে-বোধের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে নবচেতনার সৃষ্টিসত্তার আত্মপ্রকাশ করে।

সুখের বিষয়, উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধেই ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত এই অতীত-প্রীতি এবং দিগদর্শী ইতিহাস-চেতনার পরিচয় দিয়েছিলেন। জীবনের প্রারম্ভ পর্যায়ে তিনি কবিওয়ালাদের দলে গান বাঁধতেন এবং তাঁর চেতনা দেশের অতীত কবি-গীতিকারদের সম্পর্কে শ্রদ্ধাবান ছিল। প্রাক্তনের প্রতি তাঁর এই সশ্রদ্ধ অনুরাগ মূলত ব্যক্তিগত কিন্তু অংশত তৎকালীন নবজাগরণের উত্তেজনাজাত। বাংলাদেশের অতীত ঐতিহ্য সম্পর্কে তাঁর সশ্রদ্ধ মনোভাব থেকে তিনি তাঁর কয়েকজন যোগ্য সাহিত্যশিষ্যকে জাতীয়তাবাদের অম্লান আদর্শে দীক্ষিত করেন। বাংলার প্রাক্তন কবি ও গীতিকারদের জীবনচরিত ও রচনাসংগ্রহ ব্যাপারে ঈশ্বরগুপ্ত আকুল আগ্রহ প্রকাশ করে আবেদন করেছিলেন :

> এতদ্দেশীয় যে সকল প্রাচীন কবি মহাশয়েরা বঙ্গভাষায় কবিতা রচনা করিয়াছেন, তাঁহারদিগের প্রণীত পুরাতন কবিতা ও সংগীতসকল এবং সেই সেই পুরুষের জীবনবৃত্তান্ত লিখিয়া যিনি আমারদিগের নিকট প্রেরণ করিবেন, আমরা মহোপকার স্বীকারপূর্বক যাবজ্জীবন তাঁহার স্থানে কৃতজ্ঞতাঋণে বদ্ধ রহিব, এবং তাঁহাকে দেশহিতৈষি-দলের প্রধান শ্রেণী মধ্যে গণ্য করিব। এই মহা মঙ্গলময় ব্যাপারে ক্লেশ ও শ্রমস্বীকার জন্য যদিস্যাৎ কেহ কিঞ্চিৎ অর্থ প্রত্যাশা করেন, আমরা যথাসাধ্য ও যথাসম্ভব তৎপ্রদানেও বিরত হইব না। …যদবধি এই দেহের সৎকার্য না হয় তদবধি এই সৎকার্য সাধনে যদ্যপি সর্বস্ব যায়, নিঃস্ব হইয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতে হয় তথাচ আমরা এই কর্তব্যকল্পে কখনই ক্ষান্ত হইব না।

ঈশ্বর গুপ্তের এই অঙ্গীকার ব্যর্থ হয়নি। ১৮৫৩ সাল থেকে ১৮৫৫ সালের মধ্যে তিনি বাংলার প্রাচীন কবি-গীতিকারদের জীবনী ও রচনা সংগ্রহ করে সংকলিত করেন। ভারতচন্দ্র ও কবিওয়ালাদের সমুদয় রচনা ও বিবরণ সংগ্রহ করে তিনি যেমন বাংলাসাহিত্যে অবিস্মরণীয় অবদান রেখে গেছেন, তেমনই রামপ্রসাদ ও রামনিধি গুপ্ত-সংক্রান্ত সমুদয় জীবনী-তথ্য ও গীতসংগ্রহ করে বাংলা সংগীতের অতীত সূত্রটি নির্দেশ করেছেন। অতীতের সংগীতনায়কদের জীবনবৃত্তান্ত সংকলন এবং প্রাক্তন গীতসংগ্রহের প্রয়াস বাংলাদেশে ঈশ্বর গুপ্তই সর্বপ্রথম সম্পন্ন করেন।

ঈশ্বর গুপ্তের আবেদন অনুসারে আর কজন বাঙালী গীতসংগ্রহ ও জীবনী-

রচনায় উৎসাহী হয়েছিলেন তার সামগ্রিক বিবৃতিদান সম্ভব নয়। তবে ঈশ্বরগুপ্ত-প্রবর্তিত ও নির্দেশিত জীবনীরচনা ও গীতসংগ্রহের রীতি দীর্ঘকাল চলেছিল। তার প্রমাণ মেলে ১৩১০ বঙ্গাব্দের মাঘ ও ফাল্গুন সংখ্যা 'সঙ্গীত প্রকাশিকা' মাসিক পত্রিকার দুটি সংখ্যায়। মাঘ সংখ্যায় ও ফাল্গুন সংখ্যায় বলীন্দ্র সিংহদেব যথাক্রমে সংগীতগুরু ৺রামশঙ্কর ভট্টাচার্যের ও সংগীতাচার্য ৺অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনী রচনা করেন।

প্রাচীন গীতসংকলন প্রণয়নের ব্যাপারেও এই শতাব্দীতে বিশেষ উন্মাদনা সৃষ্টি হয়। তার কারণ, বাংলাগানের বহুশতাব্দীবাহিত ঐতিহ্যের দিকে এই সময়ে বহুজনের আগ্রহদৃষ্টি প্রসারিত হয়। বিশেষভাবে সংগ্রহ ও সংকলিত হয় বৈষ্ণব পদগীতি। সংকলনগুলির নামে যে 'রত্ন' শব্দটির প্রয়োগ আছে তার থেকেই গানগুলির প্রতি-সংগ্রাহক ও সম্পাদকগণের সশ্রদ্ধ অনুরক্তির পরিচয় আছে। এ-জাতীয় সংকলনগুলি আত্মপ্রকাশ করে প্রধানত উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দুই দশকে। প্রধান গীতসংকলন-গুলির এক কালানুক্রমিক তালিকা এখানে সংযোজিত করা হল।

| গ্রন্থের নাম | প্রকাশকাল | সম্পাদক বা সংকলয়িতার নাম |
|---|---|---|
| গীতরত্ন | ১২৪৪ | রামনিধি গুপ্ত |
| কমলাকান্ত পদাবলী | ১২৯২ | শ্রীকান্ত মল্লিক |
| প্রেমসংগীত | ১২৯৪ | — |
| গুপ্তরত্নোদ্ধার | ১৩০১ | কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় |
| গীতরত্নমালা | ১৩০৩ | অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায় |
| গীতাবলী | ১৩০৩ | বৈষ্ণবচরণ বসাক |
| প্রীতিগীতি | ১৩০৫ | অবিনাশচন্দ্র ঘোষ |
| সাধক সংগীত | ১৩০৬ | কৈলাসচন্দ্র সিংহ |

তালিকাটি নিশ্চয়ই অসম্পূর্ণ, কিন্তু গীতসংকলন প্রণয়ন করবার এই প্রবণতা বিংশ শতাব্দীর প্রথম দুই দশক পর্যন্ত প্রবাহিত ছিল। তার থেকে বোঝা যায়, এ-জাতীয় সংকলন প্রণয়নের পশ্চাদপটে বাঙালীর তাৎক্ষণিক ভাববিলাস ছিল না, এই প্রবণতা বস্তুত এক বৃহৎ ভাবান্দোলনের প্রতীকস্বরূপ।

### সংগীত-বিষয়ক পত্রিকা

বাংলাগদ্যে লেখা প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৮০১ খৃষ্টাব্দে। প্রথম বাংলা সংবাদ ও সাময়িকপত্র প্রকাশিত ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে। 'দিগদর্শন' বা 'সমাচারদর্পণ'

প্রভৃতি প্রথমদিকের কয়েকটি শিশু পত্রিকাকে সূত্র করে অচিরে বাংলাদেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে ভাব ও আদর্শগত সংঘাত-সংগ্রাম শুরু হল। তার ফলে একাদিক্রমে আরো অনেকগুলি সাময়িকপত্র প্রকাশিত হয়। উনবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশের অন্যতম যুগসমস্যা ছিল বিভিন্ন ধর্মাদর্শের দ্বন্দ্ব। একদিকে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজকে কেন্দ্র করে নবাগত ইংরাজদের খৃষ্টধর্ম প্রচারের চেষ্টা, আরেক দিকে নব আদর্শে উদ্বুদ্ধ ব্রাহ্মসমাজের প্রচার এবং সনাতন হিন্দুধর্মের সমর্থকগণের ভাবান্দোলন। ত্রিধাবিভক্ত এই ধর্মাদর্শগত সংগ্রাম রূপায়িত হতে লাগল প্রত্যেক দলের নিজ নিজ পত্রিকার মাধ্যমে। সেইজন্য প্রাথমিক বাংলা সাময়িক পত্রগুলি ধীরে ধীরে বিতণ্ডার অস্ত্র হয়ে উঠল। অবশ্য সেই প্রত্যক্ষ দ্বন্দ্বের নেপথ্যে দেশ ও জাতির কল্যাণচিন্তার একটি অলক্ষ সদিচ্ছা অন্তর্লীন ছিল, ধর্ম ও দল নির্বিশেষে। ক্রমশ বাংলার শিক্ষিতসমাজে ধর্ম, সমাজ, রাষ্ট্রনীতি, সাহিত্যাদর্শ প্রভৃতি সর্বক্ষেত্রে দল ও মতের সংখ্যা যত বৃদ্ধি পেল পত্রিকার সংখ্যাধিক্য সেই পরিমাণে হল। কালক্রমে অবশ্য বাংলা সাময়িকপত্রের এই যুযুধান অস্থিরতা কেটে গিয়ে সুস্থ ও গভীর গঠনমূলক কর্মে নিয়োজিত হয়। 'তত্ত্ববোধিনী' ও 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার সূত্রে শিক্ষিত বাঙালীর মননচিন্তা, মহৎ ভাবাদর্শ, মানবিকতার উন্নত সাধনা, সাহিত্যের নবরূপ প্রভৃতি বিকশিত হয়। বাংলাগদ্যের বিকাশেও সাময়িকপত্রের ভূমিকা নিগূঢ়।

বাংলা সাময়িকপত্রের এই গুরুতর কর্মপ্রয়াসের পাশাপাশি আরেক ধরনের লঘুস্বভাবের সাময়িকপত্র বেশ প্রচলিত ও জনপ্রিয় ছিল। মূলত উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক থেকে শেষ দশক পর্যন্ত নানা বিচিত্র ধরনের পত্র-পত্রিকা, অনেকটা ফ্যাসনের মতো, সচল ছিল। রঙ্গতামাশার পত্রিকা, নাটক ও নাট্যমঞ্চ-সংক্রান্ত পত্রিকা, এমনকি পশুদের সম্পর্কে একটি পত্রিকা, 'পশ্বাবলী'র খবর পাওয়া যায়। এই জাতীয় বিচিত্র ভাবধারার তরঙ্গেই সম্ভবত উনবিংশ শতাব্দীতে সংগীতবিষয়ক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। কিন্তু অচিরে আরো অনেক সংগীত-পত্রিকা বেরোতে থাকে, তার সবকটাই কিছু ফ্যাসনের টানে আসেনি। বরং সংগীত সম্পর্কে গভীর মনস্কতা ও অন্যান্য নানা যুগোপযোগী চিন্তাধারা সেসব পত্র-পত্রিকায় লক্ষ করা যায়। সেইজন্য এ-সিদ্ধান্ত অসংগত নয় যে, উনবিংশ শতাব্দীর বাঙলা সংগীতক্ষেত্রে নব-ভাবনার টানে সংগীত-পত্রিকাগুলি স্বতঃই আত্মপ্রকাশ করে। এই অনুমান দৃঢ়তর হয়, পত্রিকাগুলির অন্তর্ভুক্ত তিনটি উদ্দেশ্য লক্ষ করে। প্রথমত, নিছক রঙ্গতামাশা বা জন-মনোরঞ্জন সম্পর্কে পত্রিকাগুলির কর্তৃপক্ষের অনাগ্রহ; দ্বিতীয়ত,

পত্রিকাগুলি অবলম্বন করে সংগীত-ক্ষেত্রে বিতণ্ডা সৃষ্টির অনিচ্ছা ; তৃতীয়ত, গানের স্বরলিপি প্রকাশ, নানা জাতীয় গান সংগ্রহ, সংস্কৃত ভাষায় লেখা সংগীতের কোষগ্রন্থগুলির অনুবাদ, সংগীতবিষয়ক প্রবন্ধরচনা প্রভৃতি সৎপ্রয়াসের সাহায্যে দেশীয় সংগীতের উন্নয়ন ও প্রচারব্রত। সংগীত সম্পর্কে উৎসাহী নানা ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানের আগ্রহ ও পোষকতায় এই জাতীয় সংগীত-পত্রিকাগুলি প্রকাশিত হয়েছিল। ক্রমশ এই জাতীয় পত্রিকার উদ্যমে সংগীত-আন্দোলন ব্যাপক রূপ লাভ করে এবং সমকালীন অন্যান্যবিষয়ক পত্রিকাতেও সংগীতপ্রসঙ্গ সংযুক্ত হতে থাকে কিংবা ক্রোড়পত্ররূপে স্বীকৃত হতে থাকে। 'তত্ত্ববোধিনী', 'সাধনা', 'ভারতী' প্রভৃতির মতো সে-কালের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যপত্রগুলিতে সংগীতপ্রসঙ্গের অন্তর্ভুক্তি নিঃসন্দেহে বাংলা সংগীতের নবভাবনার পরম স্বীকৃতি।

বস্তুত, যে-কোনো দেশের সংগীতকলার মানোন্নয়ন, প্রচার ও সংরক্ষণ ব্যাপারে সংগীত-পত্রিকার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা স্বীকৃত হয়। যে-জর্মান সংগীতের শ্রেষ্ঠত্ব আজ বিশ্বস্বীকৃতি পেয়েছে তার মূল্যায়ন ও প্রচারে সর্বপ্রথম অগ্রণী হয়েছিল ১৭২২ খৃষ্টাব্দে ম্যাথেসন-এর 'Musica Critica' এবং ১৭২৮ খৃষ্টাব্দে টেলম্যান্-এর 'Der Getreve Musik-Meister' নামে দুইটি জর্মান পত্রিকা। ইংলণ্ড থেকে প্রকাশিত 'Quarterly Musical Magazine' ( প্রথম প্রকাশ ১৮১৮ খৃষ্টাব্দ ) এবং ন্যু-ইয়র্ক থেকে প্রকাশিত সু-প্রসিদ্ধ 'The Musical Quarterly' ( ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে রুডল্‌ফ্‌ স্কিরমার প্রতিষ্ঠিত ) অথবা সম্প্রতিলুপ্ত 'Penguin Music Magazine' আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সংগীত সম্পর্কে নিত্যনূতন চিন্তাধারা ও সম্ভাবনাকে বারবার লোক-সমক্ষে হাজির করেছে। কোনো কোনো প্রসিদ্ধ সংগীত-নায়ক কোনো সংগীত-পত্রিকাকে আশ্রয় করে তাঁর মতবাদ ও সৃজনকর্মবিষয়ে মনের ভাবকে অনর্গলিত করেছেন, তার ফলে পরবর্তীকালে সংগীতপিপাসুরা অনেক মূল্যবান সূত্র পেয়েছেন। উদাহরণত উল্লেখযোগ্য প্রখ্যাত জর্মান সংগীতজ্ঞ হুগো উল্‌ফ্‌-এর নাম, যিনি জর্মানীর 'Wiener Salonblath' নামে সংগীত-পত্রিকায় রোমান্টিক সংগীতের বিরুদ্ধে আলোচনার ঝড় তুলেছিলেন। সংগীত-পত্রিকা কেমনভাবে একজন মহান শিল্পীকে সকলের সামনে পরিচিত করে দেয় তার অবিস্মরণীয় বিবরণ বহন করছে জর্মানীর 'New Zeitschrift fur Musik' পত্রিকা। পত্রিকা-সম্পাদক বিশ্ববিশ্রুত সুরকার রবার্ট শুম্যান এই পত্রিকাতেই New Path প্রবন্ধের মাধ্যমে জোহানেস ব্রাহম্‌সের সংগীত প্রতিভাকে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানিয়ে লিখেছিলেন :

'I thought that sooner or later someone would and must appear, destined to give ideal expression to th spirit of the times ; one who could not gradually show the development of his genius, but who, like Minerva, would spring fully armed from the head of Jove. And he has come, a young blood at whose cradle Graces and Heroes kept watch. His name is Johannes Brahms. ···He bears all the inner characteristics and outword signs that proclaim that he is one of the elect.'[১২]

শুমানের এই স্বাগত-প্রবন্ধ কীভাবে জোহানেস্ ব্রাহম্‌সের শিক্ষাজীবনকে নতুন পথে পরিচালিত করেছিল তার বিবরণ[১৩] যেমন আকর্ষণীয় তেমনই অভিনব।

উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সংগীত-পত্রিকাগুলি আন্তর্জাতিক সংগীতক্ষেত্রে বিশেষ সক্রিয় না হলেও (বাংলা ভাষার সীমাবদ্ধতায় যা অসম্ভব) এই দেশের সংগীত-ভাবনা ও কর্ম-রূপায়ণের প্রসঙ্গে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছিল। অবশ্য এখনকার শিক্ষিত মানুষ সেইসব পত্রিকার সক্রিয় কর্মসাধনের সংবাদ সম্পূর্ণত অবগত নন এবং পত্রিকাগুলির নামও সম্ভবত অনেকে জানেন না। এর কারণ হয়ত, সংগীত সম্পর্কে বর্তমান কালের বাঙালীর অসামান্য নিরুৎসুক স্বভাব কিংবা অন্যান্য প্রসঙ্গে অতি উৎসাহ। যাই হোক, বাংলা সংগীতের নবরূপায়ণের বাতাবরণে বাংলার সংগীত-পত্রিকাগুলি যে সকল ব্যাপারে অগ্রণীর ভূমিকা নিয়েছিল, তার মধ্যে প্রধান কয়েকটি বিষয় ছিল : ১) বাংলা সংগীতের প্রচার; ২) স্বরলিপি-পদ্ধতির স্বপক্ষে যুক্তি ও জনমত সৃষ্টি; ৩) সংগীত-সংক্রান্ত প্রামাণিক কোষগ্রন্থ-গুলির অনুবাদ; ৪) য়ুরোপীয় ও বিশেষত বিলাতী সংগীতের সুর ও ঢং বাংলা সংগীতে গ্রহণ করার অনুকূলে সংগ্রাম; ৫) লুপ্তমান ও বিস্মৃতপ্রায় গানের সংগ্রহ; ৬) বাংলা ও ভারতের বিশিষ্ট সুরশিল্পীদের জীবনীরচনা এবং ৭) সংগীত-সমালোচনার প্রবর্তন।

বাংলা ভাষায় সর্বপ্রথম সংগীত-পত্রিকার নাম 'সংগীত চিত্তসন্তোষ'। পত্রিকার পরিচালক ছিলেন উমাচরণ সেন ও যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু। ১২৭৭ বঙ্গাব্দের বৈশাখ

১২ Brahms. by Ralph Hill. Duckworth. London. pp 35-36

১৩ দ্রষ্টব্য : Schumann. by André Boucoure chliev. Evergreen Profile Book 2. New York

মাসে ( ইং ১৮৭০ খৃষ্টাব্দ ) মাসিক পত্রিকারূপে এটি প্রকাশিত হয়। কিন্তু অল্পদিন চলে বন্ধ হয়ে যায়।*

রাজা শৌরীন্দ্রমোহনের উদ্‌যোগে ১২৭৯ বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাসে ( ইং ১৮৭২ খৃষ্টাব্দ ) 'সংগীত-সমালোচনী' প্রকাশ পায়। সম্ভবত এটি শৌরীন্দ্রমোহনের 'মিউজিক অ্যাকাডেমি'র মুখপত্র ছিল। সম্পাদক ছিলেন প্রখ্যাত ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী। পত্রিকার আয়ুষ্কাল ছয়মাস।[১৪]

ইতিমধ্যে বাংলা ভাষায় অন্যান্য বিষয়ক সাময়িক পত্রিকাগুলিতে কিন্তু সংগীত-সম্পর্কিত প্রসঙ্গোক্তি ও আলোচনা অন্তর্ভুক্ত হতে থাকে। সেই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য, ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসের 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকার শেষে অতিরিক্ত ছয় পৃষ্ঠার ক্রোড়পত্রে সংযোজিত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ( ১৮৪০-১৯২৬ ) লিখিত : 'সংগীত লিপিবদ্ধ করিবার চিহ্নাবলী' এবং তার অনুষঙ্গে পাঁচটি ব্রহ্ম-সংগীতের স্বরলিপি।*

এর বেশ কয়েক বছর পরে ১২৯২ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসের 'বালক' পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় ঠাকুর পরিবারের প্রতিভা দেবী 'সহজে গান শিক্ষা' এবং দ্বিতীয় সংখ্যায় 'গান অভ্যাস' শিরোনামে স্বরলিপি প্রচারে সক্রিয় হয়েছিলেন। ঐ পত্রিকায় তৃতীয় সংখ্যায় সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ( ১৮৪২-১৯২৩ ) লেখা 'বোম্বায়ের গানবাজনা' প্রবন্ধে ভিন্ন প্রাদেশিক সংগীত-ধারা সম্পর্কে বাঙালীর নবজাগ্রত কৌতূহলের চিহ্ন রয়েছে। একাদশ সংখ্যায় মুদ্রিত নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের 'বাঙ্গালীর গান' প্রবন্ধে নতুন যুগচিন্তা ও সংগীতের নবভাবনার চমৎকার পরিচয় আছে :

> ইংরাজি সংবাদপত্রই বল আর বাঙ্গালা মাসিক পত্রই বল, বাঙ্গালির সংবাদ, বাঙ্গালির গান কোথাও পাইবে না।...বাঙ্গালী একা থাকিয়া

* 'সংগীত-চিত্তসন্তোষ' পত্রিকার ফাইল পাওয়া যায়নি। এটি সর্বাঙ্গীণভাবে সংগীত পত্রিকা কিনা তাতে সংশয় আছে।

১৪ 'এ-পর্যন্ত পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে পত্রিকাটি বাংলা ভাষায় প্রকাশিত প্রথম সংগীত পত্রিকা।' বাংলা সংগীত পত্রিকা পরিচয় : বিপ্লব বন্দ্যোপাধ্যায়। 'সংগীতচর্চা" জানুয়ারী ১৯১৪

* পরিকল্পিতভাবে স্বরলিপির ব্যবহার অবশ্য শুরু হয় উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে। বাংলায় ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী এ ব্যাপারে পথিকৃৎ। বেলগাছিয়া থিয়েটারের প্রথম নাটক 'রত্নাবলী'র সংগীত পরিচালক হিসেবে ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে ক্ষেত্রমোহন এই স্বরলিপি তৈরি করেন। তবে এই স্বরলিপি ছাপা হয়নি। বাংলা ভাষায় প্রথম ছাপা স্বরলিপির বই কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বঙ্গৈকতান' ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। তথ্যসূত্র : 'সংগীত চর্চা' এপ্রিল-জুন ১৯১৪

> কিছু করিতে পারিত না, ইংরাজ আসিয়া তাহার দশা ফিরিয়াছে, তাহার মুখের ভাব আর একরকম হইয়াছে। এখন আবার ভারতবর্ষের অন্য জায়গা হইতে স্রোত বহিয়া বঙ্গদেশে যাইতেছে। বাঙ্গালীর গান ভারতবর্ষের গান হওয়া চাই, তবেই সে গান টিঁকিবে।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা কর্তব্য যে, 'বালক' পত্রিকাতেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচিত, হর্বার্ট স্পেনসর-প্রভাবিত 'সুরে নাটক' বাল্মীকিপ্রতিভা ও কালমৃগয়ার স্বরলিপি প্রকাশিত হয়েছিল।

'বালক' পত্রিকার মতো সংগীত-সচেতনতা, সম্ভবত যুগবৈশিষ্ট্যবশত, সমকালের অন্যান্য সাময়িক পত্রেও লক্ষ করা যায়। এই সূত্রে স্মরণীয় যে, 'ভারতী ও বালক' পত্রিকায় 'সহজে গানশিক্ষা' এবং 'সংগীতশিক্ষা' নামে ধারাবদ্ধ স্বরলিপি প্রচার নিয়মিত চলেছে। এই বিভাগটি পরিচালনা করতেন ঠাকুরবাড়ির প্রতিভা দেবী, সরলা দেবী ও ইন্দিরা দেবী। স্বরলিপি প্রকাশ ব্যাপারে এই পত্রিকার সক্রিয়তা বিশেষভাবে প্রমাণিত হয়, ১২৯৯ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ সংখ্যায় বর্ষার গানের স্বরলিপি, মাঘ সংখ্যায় বেদগানের, আষাঢ় সংখ্যায় মহীসূরী গানের স্বরলিপি প্রভৃতির মধ্যে। ১২৯৪ বঙ্গাব্দে নতুন অংশত একটি সংগীত পত্রিকা 'গান ও গল্প' প্রকাশ পায়। পত্রিকাটিতে কিছু গান ও গল্প মুদ্রিত হয়েছিল। গানগুলিতে রাগ ও তালের নির্দেশ থাকত কিন্তু স্বরলিপি থাকত না। এরপর ১২৯৭ বঙ্গাব্দে দুর্গাদাস দে-র প্রকাশনায় 'মজলিস' নামে যে-পত্রিকা আত্মপ্রকাশ করে তার নামপত্রে যদিও উল্লেখ ছিল 'বৈঠকী আলাপ, সঙ্গীত, কবিতা, খোসগল্প, চরিত্র সমালোচন, চুটকী, রংতামাসাপূর্ণ মাসিক পত্রিকা', তবু শেষপর্যন্ত সংগীতই এ-পত্রিকায় প্রধান স্থান পায়। তার কারণ, প্রকাশক সর্বপ্রকার সংগীত-সংগ্রহে বিশেষ আগ্রহী ছিলেন। পত্রিকার 'গোড়ার কথা'য় তিনি নিবেদন জানান :

> 'সরস সঙ্গীতের মধ্যে প্রেমসঙ্গীতই, বোধহয়, বিশেষ চিত্তরঞ্জক ; সুতরাং, নির্বাচনকালে তৎপ্রতিই আমাদের বিশেষ লক্ষ্য থাকিবে। অন্যান্য সঙ্গীত যে আদৌ থাকিবে না, এমন কথা বলিতেছি না। প্রথমে আমরা ভাল ভাল পুরাতন সঙ্গীতসকল গ্রহণ করিব।'

বাংলা-সংগীত পত্রিকার ক্ষেত্রে যুগান্তর আনেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪৯-১৯২৫)। ডোয়ার্কিন কোম্পানীর অর্থানুকূল্যে তিনি ১৩০৪ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ মাসে (ইং ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দ) 'বীণাবাদিনী' নামে পত্রিকা প্রকাশ করেন। বাঙলাদেশে সংগীতপ্রচার ও সংরক্ষণ ব্যাপারে এই পত্রিকার এক স্থায়ী অবদান রয়েছে। মাত্র

দুই বৎসরে 'বীণাবাদিনী' বাংলার সংগীতসমাজে বিশেষ উদ্দীপনার সঞ্চার করে। পত্রিকাটির ঐতিহাসিক দিক থেকেও যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে, কেননা স্বরলিপি পদ্ধতির সরলীকরণের যুক্তিসমূহ এই পত্রিকার পাতাতেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ দেশবাসীর সামনে তুলে ধরেন এবং সেইসূত্রে বাংলাদেশের সংগীতামোদী জনসাধারণকে আকারমাত্রিক স্বরলিপি পদ্ধতির অনুরাগী করে তোলেন। তাঁর প্রবর্তিত এই আকারমাত্রিক পদ্ধতিই বাংলা সংগীতে গৃহীত হয়েছে এবং সর্বাধুনিক কালেও প্রচলিত রয়েছে। সম্পাদকরূপে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সব রকমের গানের স্বরলিপি সংগ্রহের ব্রত নিয়েছিলেন। 'বীণাবাদিনী'-র আশ্বিন, ১৩০৪ সংখ্যায় 'সম্পাদকের নিবেদন' অংশে দেশ ও জাতির সংগীত সংরক্ষণের আকাঙ্ক্ষা তাঁর ভাষার গভীর আন্তরিকতায় স্পন্দমান। তিনি লিখেছেন :

> স্বরলিপি লেখক মহাশয়দিগের প্রতি সানুনয় নিবেদন এই, শ্যামাবিষয়ক গান, কৃষ্ণবিষয়ক গান, বাউলের গান, কীর্তনের গান, যাত্রার গান, থিয়েটারের গান, হাসির গান, হিন্দুস্থানী গান প্রভৃতি বিবিধপ্রকার গানের মধ্যে, যিনি যাহা জানেন, তাহার স্বরলিপি করিয়া যদি তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া পাঠাইয়া দেন তবে বড়ই ভাল হয়। হিন্দুসঙ্গীত লিপিবদ্ধ করিয়া উহার স্থায়িত্ববিধান করাই বীণাবাদিনীর মুখ্য উদ্দেশ্য।

অন্যান্য সংগীত পত্রিকার মতো 'বীণাবাদিনী'তেও নিয়মিত স্বরলিপি ছাপা হত; অধিকন্তু সংগীত সম্পর্কে গভীরতর চিন্তাভাবনাবাহী রচনাও লক্ষ করা যায়। বস্তুত, সংগীতের ঔপপত্তিক ও ক্রিয়াত্মক এই উভয়বিধ বিষয়ে বাংলা ভাষায় সর্বপ্রথম আলোচনার সূত্রপাত হয় 'বীণাবাদিনী'-তে।[১৫] ১৩০৪ বঙ্গাব্দের ভাদ্র সংখ্যায় 'রাগের মূর্চ্ছনা, স্বর-মিল রহস্য' প্রবন্ধ এবং আশ্বিন সংখ্যায় 'তাল কাহাকে বলে' প্রবন্ধ গভীরতর দৃষ্টির পরিচয় বহন করছে।

তৎকালীন বাংলা সংগীতে বিদেশাগত অর্কেস্ট্রা রীতি সম্পর্কে নতুন চিন্তা ও পরিকল্পনার আভাস 'বীণাবাদিনী' পত্রিকায় বিশেষ স্থান লাভ করেছিল। ১৩০৪ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ সংখ্যায় প্রকাশিত 'সমবেত-বাদ্য সম্বন্ধে মন্তব্য' প্রবন্ধে মত প্রকাশ করা হয়েছে যে,

> বহুমিলের অভাবে, আমাদের সমবেত বাদ্য, অনেক সময়ে একঘেয়ে হইয়া

[১৫] অবশ্য গ্রন্থাকারে এই দুই বিষয়ে বক্তব্য প্রকাশিত হয়েছিল এর আগে। শৌরীন্দ্রমোহন ও কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংগীত গ্রন্থাবলী প্রসঙ্গত দ্রষ্টব্য। তবে, ঐ বিষয়ে পত্রিকাকেন্দ্রিক discourse 'বীণাবাদিনী'তেই প্রথম শুরু হয়।

পড়ে। উহাতে আর একটুকু বিচিত্রতা সঞ্চার করা আবশ্যক। বহুমিলের অভাবে, বিচিত্রতা সম্পাদনের একটি উপায় আছে। কোন একটি বিশেষ রাগরাগিণী বাজাইবার সময়, ঝাঁপতাল, সুর-ফাঁকতাল, একতালা, কাওয়ালি প্রভৃতি বিভিন্ন ছন্দের তালের ফেরতায় যদি সেই সুরটি সমবেত বাদ্যে বাজান যায়, তাহা হইলে উহার একঘেয়ে ভাব অনেক পরিমাণে দূর হইতে পারে।

'বীণাবাদিনী' পত্রিকা দুই বছর চলে বন্ধ হয়ে যায়; তার কারণ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ইতিমধ্যে 'ভারত সঙ্গীত সমাজ' স্থাপন করেন এবং ত্রিপুরার রাধাকিশোর মাণিক্য দেববর্মনের অনুরোধে সংগীত সমাজের মুখপত্ররূপে 'সংগীত প্রকাশিকা' নামে এক পত্রিকা প্রকাশ করতে শুরু করেন। সুতরাং 'সঙ্গীত প্রকাশিকা' যদিও ১৩০৮ বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাসে, অর্থাৎ বিংশশতাব্দীর সূচনায় আত্মপ্রকাশ করে, তবু তা 'বীণাবাদিনী'র অনুপূরক তথা উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সংগীতের নবভাবনার সঙ্গে সম্পৃক্ত। পত্রিকাটি দশ বছর চলেছিল। 'সঙ্গীত প্রকাশিকা'র সম্পাদকরূপে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রধান লক্ষ্য ছিল সংস্কৃত ভাষায় লেখা সংগীতের কোষগ্রন্থগুলির বঙ্গানুবাদ। পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় 'প্রয়োজন ও উদ্দেশ্য' শিরোনামে স্পষ্টত সে কথা বলা হয়েছিল :

> আজকাল, শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ কাব্য প্রভৃতি বিষয়ক সংস্কৃত গ্রন্থ-সকল অনুবাদিত হইয়া জন-সাধারণের মধ্যে বহুলরূপে প্রচারিত হইতেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এ পর্যন্ত সঙ্গীত-বিষয়ক প্রাচীন গ্রন্থাদির অনুবাদ কার্যে কেহ হস্তক্ষেপ করেন নাই। সঙ্গীত-নির্ণয়; সঙ্গীত-দর্পণ, সঙ্গীত-দামোদর, রাগ-বিবোধ, রাগ-সর্বস্ব-সার, রাগার্ণব, নারদ সংহিতা, ধ্বনিমঞ্জরী, প্রভৃতি বিবিধ সঙ্গীত-গ্রন্থের মধ্যে অধিকাংশই পাণ্ডুলিপি অবস্থায় রহিয়াছে—দুই একখানি পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছে মাত্র।...এই সকল গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া মূল ও অনুবাদ আমরা ক্রমশঃ এই পত্রিকায় প্রকাশ করিব, এইরূপ সঙ্কল্প করিয়াছি।
>
> আমাদের আরেকটি উদ্দেশ্য—তানসেন প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ওস্তাদদিগের পুরাতন গীতগুলি স্বরলিপিবদ্ধ করা। স্বরলিপির অভাবে, অনেকগুলি পুরাতন গান বিলুপ্ত হইয়াছে এবং যাহা এখনও প্রচলিত আছে তাহাও কালক্রমে মুখ-পরম্পরায় বিকৃত হইয়া যাইতেছে। অতএব, এ বিষয়ে আমাদের আর উদাসীন থাকা উচিত নয়; যাহাতে পুরাতন

> গীতগুলি স্বরলিপিবদ্ধ হয়, সঙ্গীত-বেত্তা মাত্রেরই সে বিষয়ে চেষ্টা করা উচিত।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের এই সঙ্কল্প অংশত সার্থক হয়েছিল। 'সঙ্গীত-প্রকাশিকা'র প্রথম সংখ্যা থেকেই সোমেশ্বর-কৃত 'রাগবিবোধ' গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশিত হতে থাকে। অনুবাদক ছিলেন পণ্ডিত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন। এছাড়া সারদাপ্রসাদ ঘোষ ধারাবাহিক ভাবে লিখতেন 'রাগ-রাগিণীর পরিচয়'। 'সঙ্গীত-প্রকাশিকা' পুরনো সংখ্যাগুলিতে ইতস্তত নানা বিচিত্র ও মূল্যবান সংগীত সংক্রান্ত রচনা ছড়িয়ে আছে। সেগুলির বিষয় কখনও 'প্রথম শতাব্দিতে ভারতে সংগীত' অথবা 'সংস্কৃতছন্দ ও সঙ্গীতের তাল' প্রভৃতি জটিল অথচ উপভোগ্য চিন্তায় সমৃদ্ধ। এগুলি একত্রে সংকলিত হলে উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সংগীত-সমালোচনার বিষয়বৈচিত্র্য ও আদর্শ দুই-ই পাওয়া যাবে।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে সর্বশেষ যে-সংগীত পত্রিকাটি প্রকাশিত হয় তার নাম 'আলাপিনী'। পত্রিকাটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩০৫ বঙ্গাব্দের ১লা কার্তিক। এতে প্রধানত স্বরলিপি-প্রচার চলত। প্রথম সংখ্যার 'অবতরণিকা'য় বলা হয়েছিল :

> স্বরলিপির চর্চা ও অভ্যাস যতই বৃদ্ধি পাইবে সঙ্গীতশিক্ষা সম্বন্ধে ততই মঙ্গল ও উন্নতির পথ পরিস্কার হইবে। স্বরলিপির আলোচনা যাহাতে আরও বৃদ্ধি হয় এবং উহা দেখিয়া সহজে সকলে সঙ্গীতশিক্ষা করিতে পারেন সেই উদ্দেশ্যে এই পত্রিকা প্রকাশ করা হইল।...প্রতি খণ্ডে দুই তিন পৃষ্ঠা করিয়া কেবল গানের স্বরলিপি থাকিবে। সঙ্গীতসম্বন্ধীয় প্রবন্ধাদি এবং বিশেষ বিশেষ প্রয়োজনীয় জ্ঞাতব্য বিষয়াদিও ইহাতে বর্ণিত হইবে।...স্বরলিপির অভাবে কোনো একটি গীতের সুর চিরকাল সমান সুরে স্থায়ী থাকে না, এইজন্য একই গান বিভিন্ন কণ্ঠে বিভিন্ন সুরে গাহিতে শুনা যায়। অতএব যাহাতে স্বরলিপির চর্চা খুব বৃদ্ধি হয় সঙ্গীতপ্রিয় সকল ব্যক্তিই সেজন্য বিশেষ চেষ্টা ও সহায়তা করেন ইহা একান্ত প্রার্থনীয়।

'আলাপিনী' পত্রিকার এক উল্লেখযোগ্য বিশিষ্টতা ছিল ইংরাজি গান, আইরিশ পোল্‌কা প্রভৃতি জনপ্রিয় সুরের স্বরলিপি মুদ্রণ।

আগে উল্লিখিত হয়েছে যে, বিশিষ্টভাবে সংগীত-পত্রিকা না হয়েও যুগবৈশিষ্ট্যের কারণে উনবিংশ শতাব্দীর অনেক রকমের সাময়িক পত্রিকা সংগীত সম্পর্কে নানা

আলোচনা ও মন্তব্যাদি প্রকাশ করে সমকালীন সংগীতের নবভাবনায় অংশ নিয়েছিল। 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকার পৃষ্ঠাতেই প্রাচীন বাংলা গানের সংগ্রহগুলি মুদ্রিত হয়েছিল। সেইসূত্রে কবিওয়ালাদের জীবনী ও রচনা এবং বিশেষত রামপ্রসাদ ও নিধুবাবুর সম্পর্কে সর্বপ্রথম তথ্যাদি পাওয়া গেছে। 'তত্ত্ববোধিনী'র সাংগীতিক প্রয়াসের কথা আগেই আলোচিত হয়েছে। আপাতত, এইপ্রসঙ্গে বাংলার সংগীতে নবভাবনার পরিপ্রেক্ষিতে 'ভারতী' ও 'সাধনা' পত্রিকা দুটির ভূমিকা বিশদভাবে আলোচনা করা প্রয়োজন। 'ভারতী' ও 'সাধনা' এই দুটি পত্রিকাই ছিল প্রধানত সাহিত্যসম্বন্ধীয় উচ্চমানের সাময়িকপত্র। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্যদের সংগীত-সমালোচনা অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে পরোক্ষভাবে পত্রিকা দুটি তৎকালীন সংগীত-আন্দোলনের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে পড়েছে। সত্যিকারের সংগীত-সমালোচনা যাকে বলে, অর্থাৎ—সংগীতের উৎপত্তি, উপযোগিতা, স্বরূপসন্ধান ও অন্যতর শিল্পরূপের সঙ্গে সংগীতকলার সম্পর্ক নির্ণয় প্রভৃতি গূঢ় নানা বিষয়ে গভীর অন্তর্দৃষ্টিময় প্রবন্ধ এখানেই সর্বপ্রথম প্রকাশ হয়। আর সেই বিশেষ ধরনের আলোচনায় অগ্রণীর ভূমিকা নিয়েছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। প্রসঙ্গত মনে রাখা কর্তব্য যে, রবীন্দ্রনাথ মূলত কবিরূপে বিশ্বস্বীকৃতি পেলেও গানের মধ্যে দিয়ে আত্মপ্রকাশের সাধনা ও নিরীক্ষা তিনি বিশেষভাবে করে গেছেন। এই উপলক্ষে সংগীত সম্পর্কে তাঁর মনোভাব ও আদর্শ প্রবন্ধাকারে বারবার লিখে বোঝাতে হয়েছে।

দশম শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বাংলাদেশের সকল লেখক কাব্যের মাধ্যমে আত্মবিকাশের সাধনা করেছিলেন। অবশ্য সেই কাব্যের রূপায়ণ হত আবৃত্তিতে নয়, সুরে। কদাচিৎ সেই সুর আবৃত্তির গদ্যধর্মকে মেনে নিত। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর আগে বাংলা সাহিত্যে এখনকার মতো সুরবিযুক্ত পাঠ্যকবিতা ও গানের মধ্যে কোনো স্বাতন্ত্র্য ছিল না। ঈশ্বর গুপ্তই সম্ভবত সুরবিযুক্ত পাঠ্যকবিতা লেখেন। অবশ্য তাঁর কবিদৃষ্টি বস্তুময় ছিল বলেই লিরিকের লাবণ্য সন্ধান তিনি আদৌ করেননি। তাঁর পরবর্তীকালে হেমচন্দ্র, রঙ্গলাল, মধুসূদন, বিহারীলাল ও নবীনচন্দ্র বাংলা কাব্যের দ্বিচারিতায় অস্থির ছিলেন; সেই জন্য তাঁদের রচিত কাব্যের ইতস্তত গানের উপস্থিতি অথবা কবি-ধর্মে সংগীত-সংক্রাম লক্ষ করা যায়। কিন্তু যেহেতু তাঁরা কেউই একসঙ্গে শ্রেষ্ঠ কবি ও শ্রেষ্ঠ গীতিকার ছিলেন না তাই এ-জাতীয় সমস্যা তাঁদের সৃষ্টিকর্মকে ব্যাহত করেনি, শুধু দ্বিধাগ্রস্ত করেছে এই মাত্র। অথচ, রবীন্দ্রনাথ একাধারে একজন শ্রেষ্ঠ কবি ও শ্রেষ্ঠ গীতিকার

ছিলেন বলেই বাংলা কবিতার দ্বিচারী সমস্যাটিকে এড়াতে পারেননি। তার ফলে, কবিতা ও গানের পারস্পরিক স্বরূপ, ঐক্য এবং বিরোধ প্রসঙ্গ তাঁর সৃষ্টি-ভাবনার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। বস্তুত রবীন্দ্রনাথের বাণীসাধনায় কবিতা ও গান একই সঙ্গে উচ্ছ্রিত ও স্বীকৃত। কখনও তিনি কবিতার অনুক্ত কথাটুকু সুরের আভায় ব্যক্ত করেছেন, কখনও সুরের সীমাহীন ভাবের মধ্যে কবিতার সুনির্দিষ্ট রূপটি প্রক্ষেপ করে দেখতে চেয়েছেন। সংগীত সম্পর্কে তাঁর এই বিশেষ ধরনের নিরীক্ষা ও প্রয়োগসিদ্ধি স্বতন্ত্র আলোচনার বিষয়। বর্তমানে শুধু প্রাসঙ্গিকভাবে স্মরণীয় যে, তাঁর গান ও কবিতা বিষয়ে নানা পরীক্ষার ফলিত উদাহরণ 'গীতবিতান'-এর অসংখ্য গানে ধরা পড়েছে কিন্তু সেই পরীক্ষা-নিরীক্ষার তাত্ত্বিক ঔপপত্তিক নানা সমস্যা তিনি লিপিবদ্ধ করে গেছেন 'ভারতী' ও 'সাধনা'র পৃষ্ঠায়। সেগুলি সংকলন করে বিশ্লেষণ করলে দুটি বিষয় স্বচ্ছ হয়ে উঠবে। প্রথমত, একজন সার্থক লিরিক কবি কেন গান লিখতে বাধ্য হলেন ; দ্বিতীয়ত, উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সংগীতে নবভাবনার সাধনা কেমন ভাবে রবীন্দ্রনাথের মতো একজন ব্যক্তি-শিল্পীর সৃষ্টির পথকে সব রকম আকীর্ণ ধূসরতা থেকে মুক্তির দিকে নিয়ে যায়। আর, শিল্পীর ক্ষেত্রে মুক্তি মানেই তো আত্মতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা।

সংগীত সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের নবচেতনার উদ্বোধনে একজন পাশ্চাত্য চিন্তানায়কের স্পর্শ ছিল। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে বিলাত থেকে প্রত্যাবর্তন করবার পর আকস্মিক ভাবে হার্বার্ট স্পেনসরের এক প্রবন্ধ 'The origin and function of Music' পাঠ করে রবীন্দ্রনাথের মনে সংগীত সম্পর্কে নবভাবনা জেগে ওঠে।[১৫] তার ফলে, একদিকে তাঁর সংগীত সৃষ্টি উৎসের নতুন দ্বার খুলে যায়—'বাল্মীকিপ্রতিভা', 'কাল-মৃগয়া' প্রভৃতি রচনার সূত্রে ; আরেকদিকে তাত্ত্বিক চিন্তা জেগে ওঠে। সেই তাত্ত্বিক চিন্তার প্রথম লিখিতরূপ 'সংগীত ও ভাব' প্রবন্ধ। ১২৮৮ বঙ্গাব্দের ৮ই বৈশাখ বেথুন সোসাইটিতে রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধটি পাঠ করেন এবং 'ভারতী' পত্রিকার ১২৮৮ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় সেটি পত্রস্থ হয়। সংগীত সম্পর্কে সেই প্রবন্ধে যে-নবভাবনা ব্যক্ত হয়েছিল তা বাংলা গানে যুগান্তরের বার্তাবাহী।

তিনি লিখেছিলেন :

> সঙ্গীত মনোভাব প্রকাশের শ্রেষ্ঠতম উপায়মাত্র। আমরা যখন কবিতা

১৫ এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য : 'রবীন্দ্রজীবনী,' প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, প্রথম খণ্ড পৃ ৯৭ এবং 'জীবনস্মৃতি' : রবীন্দ্র-রচনাবলী, সপ্তদশ খণ্ড, পৃ ৩৮২

> পাঠ করি, তখন তাহাতে অঙ্গহীনতা থাকিয়া যায়, সঙ্গীত আর কিছু নয়, সর্বোৎকৃষ্ট উপায়ে কবিতা পাঠ করা।...আমি গানের কথাগুলিকে সুরের উপর দাঁড় করাইতে চাই।...আমি সুর বসাইয়া যাই কথা বাহির করিবার জন্য।

'সংগীত ও ভাব' প্রবন্ধের মূল বক্তব্যের সমর্থনে পরের সংখ্যা 'ভারতী' পত্রিকায় (আষাঢ় ১২৮৮) রবীন্দ্রনাথ 'সংগীতের উৎপত্তি ও উপযোগিতা' নামে প্রবন্ধ লেখেন। 'আমাদের মনোভাব গাঢ়তম তীব্রতমরূপে প্রকাশ করিবার উপায়-স্বরূপে সঙ্গীতের স্বাভাবিক উৎপত্তি'—এই ছিল তাঁর বক্তব্য।

সংগীত বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ 'সংগীত ও কবিতা' প্রকাশিত হয় ১২৮৮ বঙ্গাব্দের মাঘ সংখ্যার 'ভারতী' পত্রিকায়। সেই প্রবন্ধে তাঁর সংগীত বিষয়ক নবভাবনা সম্পূর্ণ উচ্চারিত হয়েছিল। তিনি সুস্পষ্টভাবে জানিয়েছিলেন :

> আমরা কবিতাকে যে চক্ষে দেখি, সঙ্গীতকেও ঠিক সেই চক্ষে দেখিব। বলাবাহুল্য, আমরা যখন একটি কবিতা পড়ি, তখন তাহাকে আমরা শুদ্ধমাত্র কথার সমষ্টিস্বরূপে দেখি না—কথার সহিত ভাবের সম্পর্ক বিচার করি। ভাবই মুখ্য লক্ষ্য। কথা ভাবের আশ্রয়স্বরূপ। আমরা সঙ্গীতকেও সেইরূপে দেখিতে চাই। সঙ্গীত সুরের রাগরাগিণী নহে, সঙ্গীত ভাবের রাগরাগিণী। আমাদের কথা এই যে, কবিতা যেমন ভাবের ভাষা, সঙ্গীতও তেমনই ভাবের ভাষা।

'ভারতী'র পৃষ্ঠায় রবীন্দ্রনাথের লেখা সংগীতসংক্রান্ত অজস্র রচনা পড়লে, সংগীতের ক্ষেত্রে একটি সমগ্র যুগ এবং সেই যুগের এক প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বের আত্মপ্রকাশের অদম্য অস্থিরতা অনুভব করা যায়। রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন মন্তব্যে সমকালীন সাংগীতিক-সমস্যার ইঙ্গিত ও সমাধানের চেষ্টা আছে। অবশ্য সে-সমাধান নিতান্তই তাঁর ব্যক্তিগত সামর্থ্যনির্ভর। তাতে পরিতাপের কারণ নেই, কেননা সমগ্রের অভীপ্সা প্রায়শই একজনের মধ্যে রূপায়িত হয়ে থাকে।

'ভারতী'র মতো 'সাধনা' ও 'সবুজপত্র' পত্রিকাতেও[১৬] রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি সংগীতবিষয়ক রচনা বা সংগীত-সংক্রান্ত আনুষঙ্গিক মন্তব্য আছে। সেগুলির মধ্যে থেকে একটি প্রবন্ধের একাংশ বিশেষ উদ্ধৃতিযোগ্য। 'বাংলা শব্দ ও ছন্দ' নামে

১৬ আরও অনেক পত্রিকাতে রবীন্দ্রনাথের সংগীত-সংক্রান্ত রচনাবলী এখন একত্রিত হয়ে বেরিয়েছে বিশ্বভারতী থেকে 'সংগীতচিন্তা' বইতে।

প্রকাশিত প্রবন্ধটি ১২৯৯ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ সংখ্যা 'সাধনা' পত্রিকার অন্তর্ভুক্ত। তাতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন :

> উচ্চারণ হিসাবে বাংলা ভাষা বঙ্গদেশের সমতল-প্রসারিত প্রান্তরভূমির মতো সর্বত্র সমান।...শব্দের সহিত শব্দের সংঘর্ষণে যে বিচিত্র সংগীত উৎপন্ন হয় তাহা সাধারণত বাংলা ভাষায় অসম্ভব। বাংলা শব্দের মধ্যে এই ধ্বনির অভাববশত বাংলায় পদ্যের অপেক্ষা গীতের প্রচলনই অধিক। কারণ, গীত সুরের সাহায্যে প্রত্যেক কথাটিকে মনের মধ্যে সম্পূর্ণ নিবিষ্ট করিয়া দেয়। কথায় যে অভাব আছে সুরে তাহা পূর্ণ হয়।...এইজন্য প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে গান ছাড়া আর কবিতা নাই বলিলে হয়।

রবীন্দ্রনাথের উপরে উদ্ধৃত মন্তব্যের মধ্যে রয়েছে বাংলা কবিতা সম্পর্কে তাঁর ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গীর চমৎকার সূত্র। এই ধারাতেই রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও গানের প্রকৃষ্ট মূল্য নির্ধারণ সম্ভব বলে মনে হয়।

সৌভাগ্যক্রমে, সংগীত সম্পর্কে এমনই মুক্ত চেতনা ও চিন্তার নবভাবনা এই সময়ে অন্যান্যদের লেখাতেও লক্ষ করা যায়। ১৩০১ বঙ্গাব্দের 'সাধনা' পত্রিকার আষাঢ় সংখ্যায় প্রকাশিত উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর (১৮৬৩-১৯১৫) প্রবন্ধ 'সঙ্গীত ও চিত্রবিদ্যা' এই প্রসঙ্গে অবিস্মরণীয় উদাহরণ।* ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষদশকেই উপেন্দ্রকিশোর তাঁর ভাবাত্মক দৃষ্টিভঙ্গীতে বুঝতে পেরেছিলেন :

> সঙ্গীত ও চিত্রবিদ্যা দুই বিষয়ের দুইটি মূল—শব্দ ও বর্ণ (আলোক)। তরঙ্গের রাজ্যে ইহারা প্রতিবেশী। এই তরঙ্গমূলকত্বই ইহাদের ঘনিষ্ঠতার কারণ বলিয়া বোধ হয়।...সাত সুর ; সাত রঙ। লোহিতাদি সাতটি রঙ, ইহারা ক্রমান্বয়ে চিত্রাবিদ্যার "সা রি গা মা"র স্থানীয়।... চিত্রের পক্ষে যেমন স্থান, সঙ্গীতের পক্ষে তেমনই সময়।...সীমারেখা চিত্রের পক্ষে যাহা করে, তাল সঙ্গীতের পক্ষে তাহা করে।...কবিতা উভয়েরই সঙ্গিনী।

উদ্ধৃত রচনাংশটুকু পড়লে বোঝা যায় ঊনবিংশ শতাব্দীতে সংগীতের নবভাবনা

* উপেন্দ্রকিশোরের সংগীতবিষয়ক বহু রচনা ছড়ানো আছে পত্রপত্রিকায়। তার এক অসম্পূর্ণ তালিকা পেশ করেছেন সিদ্ধার্থ ঘোষ তাঁর 'উপেন্দ্রকিশোর : শিল্পী ও কারিগর' নিবন্ধে ('এক্ষণ', শারদ ১৩৯০)। যেমন, স্বরলিপি ও এতদ্দেশীয় ও ইউরোপীয় ভারতীয় সঙ্গীত ('দাসী' ১৮৯৫), বেহালা ('প্রদীপ' জ্যৈষ্ঠ ও আশ্বিন ১৩০৭), ভারতীয় সঙ্গীত ('প্রবাসী' মাঘ ১৩১৯, ভাদ্র ১৩২০, বৈশাখ ১৩২৩)।

ক্রিয়াত্মক ও ঔপপত্তিক শাস্ত্রজ্ঞানে পরিসমাপ্ত না হয়ে সম্পূর্ণ ভাবাত্মক দৃষ্টিপ্রক্ষেপে সংগীতের প্রকৃতিসন্ধানে প্রযুক্ত হয়েছে। সৃষ্টি ও প্রজ্ঞার এই সমন্বয়ই রেনেশাঁসের মূলকথা।

সেইজন্যই মনে হয়, উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সংগীতের নবআদর্শ সন্ধান, বিদেশী সংগীতের সংস্পর্শ, গীতরীতির রূপান্তর, অর্থাৎ সংক্ষেপে নবযুগের সংগীতরূপের উৎস-অগ্রগতি-পরিণতির সামগ্রিকতাটুকু তৎকালীন পত্রিকাগুলিতে সার্থকভাবে মুকুরিত। সংগীত পত্রিকাগুলি সেইসূত্রে আরও স্পন্দমান এবং নিহিত সৃষ্টিশীলতায় মহৎ।

# পুরনো কলকাতার গান

পুরনো কলকাতার গানের কথা লিখতে গেলে প্রথমেই বলা দরকার যে তার গঠনে আর তার আয়োজনে গ্রামিক ও নাগরিক এই হু'রকম উপাদানই কার্যকর ছিল। গ্রামিক, কেন না কলকাতা পত্তনের অব্যবহিত আগে এবং সমকালে বাংলায় গ্রাম্যজীবন আর গ্রাম্যসংস্কৃতি সমানভাবেই বহমান ছিল। হয়তো তাতে একটু ছোঁওয়া লেগেছিল ক্ষয়ের কিংবা রূপান্তরের। কেন না চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আগে ও পরে ইংরাজ প্রশাসন এমন সব রাজস্বনীতি আর দমননীতি চালু করেছিল যে প্রবহমান রাজন্যতন্ত্র ও জমিদারতন্ত্রে ভাঙন ধরেছিল। ইংরাজের অনুগ্রহে গজিয়ে উঠছিল এক হঠাৎ-জমিদার শ্রেণী। তাদের ঘিরে, তাদের বিত্তের আকর্ষণে, দলে দলে গ্রামত্যাগী মানুষ কলকাতায় স্থায়ী আস্তানা পাতে। অবশ্য ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের করুণ ও মর্মান্তিক দুর্ভিক্ষে গ্রামিক জনসংখ আগে থেকে অনেকটাই বিপন্ন ও বিপর্যস্ত ছিল। এর ফলে বাংলা ও বিহারে এক কোটি মানুষ মারা যায়। ইংরাজ শোষণে বাঙালীর রেশমশিল্পে ও বস্ত্রশিল্পে মন্দা আসে। অন্যদিকে নবগঠিত কলকাতার স্বচ্ছল বাবুসমাজ আর তাদের স্বেচ্ছাচারী বিনোদনের কাজে গ্রাম্য-মানুষ নিযুক্ত হতে থাকে। শহর কলকাতা সে সময় ছিল ব্যবসায়ী, বেনিয়ান, ষ্টিভেডোর, মুৎসুদ্দি আর নানারকম জোগানদারদের নির্বাধ স্বর্গ। তাছাড়া নতুন নগর পত্তনের কারণে বহুতর প্রয়োজনে নানাবর্গের শ্রমজীবী ক্রমে ক্রমে কলকাতায় স্থায়ী আস্তানা গড়ে নেয়। মনে রাখতে হবে এরা সবাই সঙ্গে করে এনেছিল তাদের গ্রামিক সংস্কার ও মূল্যবোধ। এনেছিল শান্ত নিস্তরঙ্গ ভক্তিনম্র ফেলে-আসা দিনযাপনের স্মৃতি। এনেছিল কীর্তন-পাঁচালি-যাত্রা-কথকতার অন্তর্গত দেবতার মানবায়নের সহজ উত্তরাধিকার। বাউল মুর্শিদা গানের অনুষঙ্গে মজ্জাগত গুরুবাদের প্রতি আস্থা ছিল তাদের। আগমনী বিজয়ার গানের উমা ছিল তাদের বিশ্বাস্য জগতের জীবন্ত কন্যার মতো। রাধা কৃষ্ণ আয়ান ও জটিলা-কুটিলার গল্পে ছিল সাংসারিকতার করুণ-মধুর তাপ। নগর কলকাতার গানের সংগঠনে তাই গ্রামিক সংস্কার ও সংগীতধারার সংযোগ ঘটেছিল স্বাভাবিকভাবে। তবে সেইসঙ্গে এ কথাও স্মরণীয় যে, কলকাতার গানের অগ্রগতি সেই অন্তঃশীল গ্রাম্যতা থেকে ক্রমমুক্তির সংকেত। তারই ফলে ক্রমে সেখানকার বিনোদনের সামূহিক গান

শেষপর্যন্ত হয়ে ওঠে ব্যক্তিক উচ্চারণের ও নিবেদনের গান। নবীন কলকাতায় নবোদ্ভূত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ যেমন সাহিত্য আর সমাজমানসে আধুনিকতাকে প্রত্যাসন্ন করে তোলে, তেমনই বাংলার সংগীতের চারিত্র্যে এনে দেয় এক আমূল দ্বান্দ্বিকতা। খেউড় কবিগান থেকে নিধুবাবু-শ্রীধর কথকের প্রেমগীতি যেন এক অসামান্য অভিযাত্রা, নিগূঢ় উত্তরণ।

অবশ্য এর আরেকটা দিকও ভেবে দেখবার মতো। কলকাতার প্রথম যুগের দুজন কৃতী কলাবৎ গোপাল উড়ে এবং রূপচাঁদ পক্ষী মূলে ছিলেন উড়িষ্যাবাসী। ভাগ্যান্বেষণে কলকাতায় এসে তাঁদের জীবন অন্য তাৎপর্যে ফলবান হয়ে গেল এবং তাঁরা স্থান পেয়ে গেলেন আবহমান বাংলা গানের বৃত্তে। আবার অন্যদিকে দেখি ১৭৪১ সালে হুগলী-ত্রিবেণীর চাঁপড়া গ্রামে বৈদ্যবংশে যে শিশুটি জন্মায় এবং ১৭৫০ সাল বরাবর গুপ্তিপাড়ার চাটুজ্যে পরিবারে জন্মায় যে শিশু, তারাই কালান্তরে হয়ে ওঠেন নিধুবাবু ( রামনিধি গুপ্ত ) এবং কালী মির্জা ( কালিদাস চট্টোপাধ্যায় ), বাংলা গানের প্রথম লিরিক-সম্ভাবনা তো এই যুগল-কিন্নরেরই অতুলনীয় দান। অবশ্য এঁদের দুজনের জীবন গোপাল উড়ে-রূপচাঁদ পক্ষীর একেবারে বিপরীত। উড়িষ্যা থেকে জীবিকার টানে বাংলায় এসে প্রথম দুজন আনলেন বাংলাগানের বৈচিত্র্য আর নিধুবাবু ও কালী মির্জা গেলেন পশ্চিমে এবং আনলেন সেখানকার গানের রূপরীতির অভিনবত্ব। নিধুবাবু পাঞ্জাবী ধাঁচের দ্রুতচালের টপ্পাকে অন্তর ভঙ্গীতে ভেঙে নতুন এক ভঙ্গীর গীতরীতির প্রবর্তন করলেন আর কালী মির্জা লক্ষ্ণৌ ও দিল্লী ঘরানার খেয়াল ও টপ্‌খেয়াল আত্মস্থ করে বাংলা গানকে নতুন সৃষ্টিশীলতার দিকে সম্প্রসারিত করলেন। এমনতর নানা দেওয়া-নেওয়ার ইতিহাস লুকিয়ে আছে আঠারো-উনিশ শতকের কলকাতাকেন্দ্রিক বাংলা গানের ভাঁজে ভাঁজে।

কলকাতাকেন্দ্রিক কথাটা বিশেষভাবে উঠলো এইজন্য যে এই বিশিষ্ট নগরটির পত্তনের সমসময়ে বৃহত্তর বাংলা ও বাঙালীর বিনোদনের মূল অংশ অর্থাৎ কৃষ্ণযাত্রা, পাঁচালি, কবিগান ঢপকীর্তন প্রভৃতির এক পা ছিল গ্রামে আরেক পা ছিল কলকাতায়। অনেক ক্ষেত্রে তাই দেখি কৃষ্ণনগর শান্তিপুর কিংবা চুঁচুড়া চন্দননগরে যে সব গানের উদ্ভব হয়েছে, তার বিকাশ এমনকি বিবর্ধন হয়েছে কলকাতার বাবুসমাজের পোষকতায়। আবার আশ্চর্য যে, বেশ পরবর্তীকালের শিক্ষিত রুচিমান শ্রোতাদের প্রয়াসে সেই বিবর্ধমান গীতরীতিও এমনকি একেবারে পরিত্যক্ত হয়েছে। এক্ষেত্রে নাগরিক শিষ্ট বোধের চাপ পড়েছে স্থূল গ্রাম্যতার

মূলে। এর একটা জলজ্যান্ত নমুনা হলো খেউড় ( <খেড়ু ) গান। ভারতচন্দ্রের কাব্যে আমরা সর্বপ্রথম শুনতে পাই—'নদে শান্তিপুর হৈতে' খেড়ু আনাবার প্রস্তাবনা। পরবর্তী পর্যায়ে খবর মিলছে যে, নবমীপূজার দিন মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র আর তাঁর সন্তানরা 'সকার-বকার' সহযোগে পরস্পরকে খেউড় শোনাতেন। সেটাই ছিল ধর্মকৃত্যের অঙ্গ। এরই ধরনে কলকাতার মহারাজ নবকৃষ্ণ দেব বাহাদুর ( ১৭৩৩-১৭৫৭ ) আরও অনেক ধনাঢ্য ব্যক্তিকে নিয়ে কবিওয়ালাদের গাওয়া খেউড় ও লহর শুনতেন। 'লহর' হলো খেউড়ের এক শহুরে সম্প্রসারণ। তার কাজ ছিল ব্যক্তির কুৎসা।

অথচ কালক্রমে এমনতর জনপ্রিয় খেউড় কলকাতার শিষ্ট ও ইংরেজীশিক্ষিত বাঙালীদের অনুমোদন না পেয়ে অবলুপ্ত হয়ে যায়। এতটাই অবলুপ্ত যে তার সুর তাল ও গায়ন পদ্ধতির কোনো দিশাই আজ আর মেলে না। সংগীতের ইতিহাসে সেটা এক গুরুতর ক্ষতি। কেননা খেউড়ের বিষয়বস্তু অশালীন ও ভাষা অশ্লীল বলে তা বর্জিত হয়েছে, কিন্তু তার গায়কী ও স্বর-স্বাতন্ত্র্য আমাদের বস্তুগত চর্চা ও সাংগীতিক জিজ্ঞাসার পক্ষে খুব প্রাসঙ্গিক।

আদি কলকাতার গানের আলোচনায় এ আমাদের খুব পরিতাপের বিষয় যে তখন টেপরেকর্ডার তো ছিলই না, এমনকি স্বরলিপি ছিল না। তার ফলে আঠারো-উনিশ শতকের গান আমাদের কাছে আজ শুধুই বাণীসর্বস্ব, থিমেটিক। তার বিষয়বস্তু ও শব্দ খতিয়ে দেখে, রুচি আর নীতির পরকলা পরে আজ তার বিচার ও ফাঁসি হচ্ছে। কিন্তু বিচারকবৃন্দ ভুলে যাচ্ছেন যে সে সব গানের একটা স্পন্দমান ও উচ্চকিত জনাদর ছিল। সেই জনাদরের সবচেয়ে বড় কারণ শিল্পীদের পারফরমেন্স। অসামান্য শ্রুতিধর সেইসব কণ্ঠবাদক, অসাধারণ পুরাণজ্ঞ এবং উপস্থিতবুদ্ধিসম্পন্ন তেমন শিল্পী আজ কই? অমিয়নাথ সান্যাল যথার্থই বলেছেন :

> সেকাল ও একালের শিল্পীর তুলনা করা উচিত বা সম্ভব কিনা এসকল কথা বাদ দিয়েও—একটা কথা মনে থাকে। সেকালে বিজ্ঞাপনের আড়ম্বর বা বাহাদুরি ছিল না—উপায়ও ছিল না। সোনার জলে রং করা রাজ সংস্করণের প্রকাশ মাহাত্ম্য ছিল না। সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপনের কারিগরিও ছিল না। এরূপ অবস্থায় যখন ভাবি গোবিন্দ অধিকারীর নিজ মুখের গান শুনবার বা দূতীর ভূমিকা উপভোগ করবার জন্য বিশ-ত্রিশ মাইল দূর থেকে জনসাধারণ পায়ে হেঁটে এসেছে এবং গান শুনে অশ্রুজলে

> অভিষিক্ত হয়ে কৃতার্থ মনে করে নিজের গায়ের ওড়না বা অলঙ্কার শিল্পীকে দান করে গিয়েছে—তখন মনে মনে চমৎকৃত না হয়ে থাকা যায় না।

এর পিঠোপিঠি আমাদের মনে রাখা চাই যে, নিধুবাবুর গান সেকালে এতটাই প্রচার ও প্রসার পায় যে

> যিনি মুখ দেখান না কুলের বধূ
> তিনি সে রাত্রে গান নিধু। (দাশু রায়ের পাঁচালি)

অথচ খেদের সঙ্গে মনে হয়, এমন যে সর্ববিপ্লাবী নিধুর টপ্পা, তার কোনো নির্ভর-যোগ্য স্বর বা গায়নরীতি আমাদের সঞ্চয়ে নেই।

এই না-থাকার একটা নঞর্থক ফল আমরা আজ হাতে হাতে পাই। সেটা এই যে, আঠারো-উনিশ শতকের বাঙালীর গান আজ সাহিত্যের ইতিহাসের পাঠ্য-বিষয়। কবিগান, পাঁচালী, আখড়াই, হাফ-আখড়াই ও টপ্পা গান বিষয়ে সাহিত্যের স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পরীক্ষার প্রশ্নপত্র রচিত হয় এবং পাঠার্থীরা তার জবাব লেখেন। কী লেখেন? নিশ্চয়ই লেখেন এসব গীতরূপের সাহিত্যিক বা সামাজিক ভাষ্য!

এছাড়াও আঠারো-উনিশ শতকের কলকাতার লোকায়ত বর্গের কবিগান, যার অন্তর্মূলে ওস্তাদী গানের ঠাট ছিল তার যথার্থ মূল্য নির্ধারণে রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধ মতামত পরবর্তী আলোচকদের অনেকটাই নিরপেক্ষ থাকতে দেয়নি। রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন:

> একদিন হঠাৎ গোধূলির সময়ে যেমন পতঙ্গ আবাস ছাইয়া যায়, মধ্যাহ্নের আলোকেও তাহাদিগকে দেখা যায় না এবং অন্ধকার ঘনীভূত হইবার পূর্বে তাহারা অদৃশ্য হইয়া যায়, এই কবির গানও সেইরূপ একসময়ে বঙ্গ সাহিত্যের স্বল্পক্ষণস্থায়ী গোধূলি আকাশে অকস্মাৎ দেখা দিয়াছিল।

উদ্ধৃতির মধ্যে 'বঙ্গ সাহিত্য' উল্লেখটুকু লক্ষণীয়। এখানে প্রশ্ন হলো কবি-সংগীত কি সাহিত্য না গান? তার উদ্ভব ও বিকাশ কি সাহিত্যিক উদ্দেশে না জনরুচির হালকা বিনোদনে? কবি-সংগীত যাঁরা গাইতেন তাঁরাই কি তার রচয়িতা না অন্য কেউ? একথা কি সত্য নয় যে কবিগান 'বঙ্গ সাহিত্যে স্বল্পক্ষণস্থায়ী' হলেও বাংলা গানের পরম্পরায় একেবারে বিলীন হয়নি? বিলীন যে হয়নি তার দুটি অব্যর্থ প্রমাণ এখানে পেশ করা চলে যা পণ্ডিতরা লেখেননি। তার একটি হলো উনিশ

শতকের কর্তাভজাদের গানের (লালশশীর পদ বা শ্রীযুতের গান) গীতরীতি। আর একটি পাই নদীয়া-মুর্শিদাবাদের গ্রামিক গীতরূপ 'বঁদ' গানে। বলাবাহুল্য এসব প্রসঙ্গের সংগত উপস্থাপনাই এখনও ঘটেনি, বিচার বিবেচনা তো দূরের কথা। বরং ডঃ সুশীলকুমার দে কবিগানের অনুকূলে যে মন্তব্য করেছেন তা অনেকটা অনুকম্পায়ী। তিনি বলেছেন : 'কিন্তু খুব স্থূল হইলেও এই রচয়িতাদের মন ছিল সাধারণ মানুষের মন। ইহাদের গানে ছিল দৈনন্দিন বাঙালী জীবনের সরল অভিজ্ঞতার প্রতিচ্ছায়া; ইহাদের প্রেম ছিল সাধারণ মানুষের প্রেম; ইহাদের আগমনী গানে ছিল বাঙালীর সহজ বাৎসল্যের স্বাভাবিক আকুলতা।' সেকালের কলকাতার গানের ধারাকে যথার্থ অনুধাবন ও আস্বাদন করতে হলে সবচেয়ে আগে বুঝতে হবে কারা সেসব গানের রচয়িতা ও গায়ক এবং কাদের শোনাবার জন্যই বা সেসব গান।

সেই কথাগুলো স্পষ্ট করে বুঝতে গেলে তখনকার কলকাতার জনবিন্যাসের ছক এবং জনসংখ্যা বিস্তারের মাত্রাটা বুঝে নিতে হবে আগে। ১৬৯০ সালের জব চার্ণকের আবির্ভাবের সময় সুতানুটি-গোবিন্দপুর-কলিকাতার অতি সাধারণ বাতাবরণ ভবিষ্যতে সার্ধ শতাব্দীর মধ্যে যে কতখানি বদলে যাবে তার কোনো পূর্বাভাস ছিল না। কিন্তু কয়েকটি ঘটনা আর সিদ্ধান্ত এই নগরের ভবিষ্যৎ ভাগ্য আর উজ্জ্বল সম্ভাবনাকে তৈরি করে দেয়। যেমন প্রথমেই দেখা যায় সপ্তগ্রাম বন্দর নৌবাহনের যোগ্যতা হারায় এবং সেইজন্য গঙ্গার পশ্চিমপারের বণিক ও ব্যবসায়ীরা ক্রমেই চলে আসছিলেন পূর্বপারে। এঁদের মধ্যে বসাক আর শেঠ পরিবার আদি কলকাতার ব্যবসা ও বাণিজ্য-জগতে প্রধান হয়ে ওঠে। ইতিমধ্যে মুর্শিদকুলী খাঁর সুবাদারীর আমলে সুবে বাংলার দীর্ঘবাহিত জমিদারী আভিজাত্যে আঘাত লাগে এবং পরিণামে অনভিজাত ইজারাদার ও সুযোগসন্ধানী একদল মানুষ হয়ে ওঠেন নতুন জমিদার। পরে ১৭৯৩ সালে লর্ড কর্নওয়ালিসের সময় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এইসব নয়া জমিদারদের বংশধারাকেই শক্তপোক্ত করে। অন্যদিকে মুর্শিদাবাদে নবাবী আমলের অবসান ঘটে এবং ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কলকাতাকেই কেন্দ্রস্থল করে ইংরেজ প্রশাসন চালু করে। সংগঠনের আর যা বাকি ছিল তাকে সুষ্ঠুভাবে রূপ দেন হেস্টিংস। তাঁকে ঘিরে যৎসামান্য ইংরাজি জানার সূত্রে একদল বঙ্গসন্তান কলকাতার দ্রুত পরিবর্তনশীল ভাগ্যাকাশে উজ্জ্বল তারকার মতো স্থান করে নিলেন। এইসব বঙ্গসন্তান বেশিরভাগ ছিলেন প্রায় অশিক্ষিত, কুরুচিপূর্ণ, প্রমোদ-পরায়ণ, প্রমদাসক্ত এবং হিতাহিতজ্ঞানশূন্য, অর্থগৃধ্নু ও অলস। আদি কলকাতার

নানাবর্গের গান ও তার গায়ক সম্প্রদায় গড়ে উঠেছে এঁদেরই নানা স্বৈর-ইচ্ছায় ও খামখেয়ালীপনায়। মনে রাখতে হবে জনরুচিকে কোনো নির্দিষ্ট দিকে নিয়ন্ত্রণ করে নিয়ে যাবার কোনো আদর্শ এঁদের ছিল না। দেশ কাল সমাজ ও সংস্কৃতি সম্পর্কে এঁদের ছিল না ন্যূনতম বোধ। দেশপ্রেম ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যচেতনা ছিল এঁদের অজ্ঞাত। এক সামূহিক ও আত্মনাশা বিনোদনে এঁরা ভোগবাদী হয়ে উঠেছিলেন। প্রাত্যহিক দিনযাপনের স্থূল আমোদ-আহ্লাদ, লঘু জীবনের উড্ডীন বিস্তার, ঔদরিকতা আর অবাধ যৌনতার পৃথুল আয়োজন এঁদের রসবোধকে নিম্নস্তরে এনে দিয়েছিল। এ ধরনের প্রমোদপ্রিয় মানুষদের খুশি করতে আদি কলকাতার একদল শিল্পী নিজেদের এমনকি পক্ষীর দলে পরিণত করেছিল এর চেয়ে পরিতাপের এবং অমানবিকতার আর কি প্রমাণ আছে এদেশে? ধনী এবং কুরুচিসম্পন্ন মানুষের বিনোদনে যখন আর্ট নিজেকে খর্ব করে তখন জাতীয় দুর্দিন সূচিত হয়। কিন্তু শেষ পযন্ত যে কলকাতায় তা হয় না, বাংলা গান শেষ পর্যন্ত সামলে নেয় তার প্রাথমিক অন্তর্ঘাত, গর্ব করে বলবার কথা সেটাও। কিন্তু সেই উজ্জ্বল প্রসঙ্গ আসবে পরে।

তার আগে একটু চোখ বুলিয়ে নেওয়া যাক কয়েকটি তথ্যের দিকে। প্রথমেই চোখে পড়ে, ১৭১০ সালে কলকাতার জনসংখ্যা ছিল ১২ হাজার। সেই শতকের মাঝামাঝি জনসংখ্যা বেড়ে দাঁড়ালো ২ লক্ষ ১০ হাজার এবং ১৮১৪ সাল অর্থাৎ উনিশ শতকের গোড়ায় তা দাঁড়ায় ৭ লক্ষে। এই যে জনপ্রবাহের বিপুলতা তার অনেক কারণ ছিল। সমচেয়ে বড় কারণ ভাঙা আর গড়া। গ্রাম ও অন্য জনপদের অর্থনীতি, নিরাপত্তা ও সুবিধা-সুযোগ যত কমেছে, কলকাতার হাতছানি ততই বেড়েছে। কিন্তু মনে রাখতে হবে এই সত্য যে যাঁরা আসছিলেন কলকাতায়, বাড়িয়ে তুলছিলেন শহরের জনসংখ্যা তাঁরা সবাই কিন্তু আদি কলকাতার সুবিধাভোগী, হঠাৎ-বড়লোক, উচ্ছৃঙ্খল ও ন্যায়-নীতি বর্জিত মানুষদের মতো ছিলেন না। তাঁদের মনে ছিল এক সমৃদ্ধ গ্রামিক জীবনের শান্তকল্লোলিত জীবনের গাঢ় স্মৃতি—অর্থাৎ ছিল দেবদ্বিজে ভক্তি, গোপালনের অভিজ্ঞতা, লক্ষ্মীপূজার বারব্রত, তুলসীতলায় নিত্য প্রদীপ দানের নিষ্ঠা, ব্রত পালনের সংযম ও কৃত্য, পুরাণ শ্রবণজনিত ধর্মসংস্কার এবং এই সবের সম্মিলিত যোগাযোগে তাঁদের অন্তরে ছিল এক অন্তঃশীল অধ্যাত্মশক্তি। এই সম্পদেই তাঁরা আঠারো শতকের আগে ও পরে প্রাণ ভরে শুনেছেন কৃষ্ণযাত্রা ও পাঁচালী, পালাকীর্তন ও ঢপ, মালসী ( শাক্ত গান ) ও

দেহতত্ত্বের গান। কলকাতায় এইসব বাঙালী যখন এলেন তখন ঘা লাগলো এই নরম জায়গাটাতেই সবচেয়ে বেশি। কলকাতা তখনও 'পাষাণ কায়া' হয়ে ওঠেনি ঠিকই কিন্তু বিকৃত রুচির বাতাস বইছে। মানুষ নামধারী যেসব নেতৃস্থানীয় কলকাতাবাসী তখন স্ফূর্তির গড়ের মাঠে বিচরণ করছিলেন তাঁদের সম্বন্ধে বলা হয়েছে 'idiots of weak understanding ; poor creatures sunk in sloth and debauchery ; extravagant, necessitious, and therefore exasting ; ignorant and rapacious ; harbourers of deceits ; obstructive zamindars, more plage than profit.' আশ্চর্য কি যে এই ধরনের মানুষ যখন শিল্প-সংস্কৃতির পরিপোষক হন তখন তার ভাবে ও সুরে বিকৃতি আসবে? রবীন্দ্রনাথ খেদের সঙ্গে কবিগানের প্রসঙ্গে বলেছেন 'কলঙ্ক' ও 'ছলনা' এই দুটি বিষয়ই একমাত্র প্রাধান্য পেয়েছে তাতে। এটাই স্বাভাবিক। রবীন্দ্রনাথ খেয়াল করেননি যে নতুন নগর পত্তনের সুবাদে নাগরালিও বেড়েছে। পুরুষশাসিত সমাজের অবাধ যৌনতা কুলীন ঘরের অপরিণীতা ও বিধবা এবং দারিদ্র্যগ্রস্ত নিম্নবর্গের নারীদের টেনে এনেছে পতিতালয়ে। তথ্যসূত্রে দেখা যাচ্ছে ১৮৫৩ সালে কলকাতার নানা অঞ্চলে পতিতাদের সংখ্যা ছিল ১২,৪১৯ জন; ১৮৬৭ সালে সেই সংখ্যা দাঁড়ায় ৩০,০০০ হাজারে। এই সূত্রে মনে রাখতে হবে বাবুদের নানা ধরনের বিনোদনের গানের পাশে কলকাতায় গণিকাপল্লীর নিভৃতে লেখা হচ্ছিল তাদের তিক্ত অভিজ্ঞতার পরিহাসদ্রব গান 'বেশ্যাসংগীত'। সমাজবিজ্ঞানীদের কাছে সে গান-গুলিও গণনীয়।

কথা যখন উঠে পড়েছে তখন পুরনো কলকাতার মহিলা গীতশিল্পীদের প্রসঙ্গ সেরে নেওয়া যাক। লক্ষ করলে দেখা যাবে প্রথম পত্তনীর সময় থেকে কলকাতা নগরে নানা বৃত্তির মানুষ একেকটা জায়গা বেছে নিয়ে বসতি করেছে। দর্জিপাড়া, জেলেপাড়া জাতীয় নামগুলো এখনও সেই স্মৃতি ধরে রেখেছে। তেমনই বাগবাজার, শোভাবাজার, জোড়াসাঁকো, বেলগাছিয়া এমন সব পল্লীতে এক-একজন বিত্তবান বাবুর পরিপোষকতায় গড়ে উঠেছিল এক-একরকম বিনোদনের দল। এর বাইরে ছিল নানা জাত ও বৃত্তির স্ত্রীলোকেরা। পর্দানসীন কুলবধূদের বাইরে সমাজে অবাধে বিচরণশীল এক নারীসমাজ তাদের জীবিকার টানে সেকালে বহু জায়গায় ঘুরে বেড়াতো। মালিনী, নাপতিনী, ধোপানী, গয়লানী, ঢপওয়ালী, কীর্ত্তুনে—এরা সব ঘুরে বেড়াতো বাবুসমাজের

অন্দরমহলে। শিক্ষিত ভদ্র সমাজের অন্তঃপুরেও (যেমন জোড়াসাঁকের ঠাকুর-বাড়ি) এদের গতায়াত ছিল। মালিনীরা অন্দরমহলে পৌঁছে দিতেন বটতলার বই। কেউ কেউ গেয়ে শোনাতেন ঢপ কীর্তন বা কথকতা। উনিশ শতকের নানা আত্মকথা পড়ে জানা যায় মা-গোঁসাইরা অন্তঃপুরে গিয়ে স্ত্রীশিক্ষা দিতেন। এ-জাতীয় বৈষ্ণবী তৈরি হতো বৈষ্ণবীয় আখড়াতে। অবহেলিতা কুলীন বধূ, কুলত্যাগিনী, বালবিধবা, বয়স্কা বারাঙ্গনা জাতীয় স্ত্রীলোকেরা সমাজে কোথাও স্থান না পেয়ে বৈষ্ণবতার আশ্রয় নিতেন। বহু ক্ষেত্রেই তাঁরা ছিলেন মধ্যম-শিক্ষিতা এবং সংগীতজ্ঞা।

আঠারো-উনিশ শতকের এমনতর বৈষ্ণবীদেব গানবিদ্যা ও অন্যতর বিনোদনের ক্ষমতার সত্যচিত্র ফুটে উঠেছে বঙ্গিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে। সেখানে দেখা যাচ্ছে দেবেন্দ্র হরিদাসী বৈষ্ণবীর ছদ্মবেশে অন্দরমহলে প্রবেশ করতেই মহিলারা 'নানাবিধ ফরমাস আরম্ভ করিলেন: কেহ চাহিলেন গোবিন্দ অধিকারী—কেহ গোপাল উড়ে। যিনি দাশরথির পাঁচালী পড়িতেছিলেন তিনি তাহাই কামনা কাজ করিলেন। দুই-একজন প্রাচীনা কৃষ্ণবিষয় হুকুম করিলেন। তাহারই টীকা করিতে গিয়া মধ্যবয়সীরা 'সখিসংবাদ' এবং 'বিরহ' বলিয়া মতভেদ প্রচার করিলেন। কেহ চাহিলেন 'গোষ্ঠ'—কোনো লজ্জাহীনা যুবতী বলিল—'নিধুর টপ্পা গাহিতে হয় তো গাও—নহিলে শুনিব না'।'

এ সব গানের বিবরণ পড়লে বোঝা যায় সেকালের কলকাতার গানের একটা বাইরের জগৎ আরেকটা অন্তঃপুরেব জগৎ ছিল। লোকপ্রসিদ্ধির মতো অনেক গানের বার্তা অন্দরমহলে চুঁইয়ে এসে পড়তো। পরিযায়ী পাখির মতো সেকালের নানা বৃত্তির মহিলা, বিশেষত বৈষ্ণবীরা, অন্দরে এনে দিতেন বাইরের বাতাস। তাঁদের সুকণ্ঠবাহিনী হয়ে বাংলা গানের জগৎ পরিশ্রুত আকারে অন্তঃপুরিকাদের হৃদয়হরণ করতো।

তথ্যের সম্প্রসারণে জানা যায়, শুধু অন্দরে নয় সদরেও নারী শিল্পীরা ছিলেন ক্রিয়াপর। ১৮২৬ সালের ১১ মার্চের 'সমাচার-দর্পণ' পত্রে দেখা যাচ্ছে কৈকালা গ্রামের কৃষ্ণকান্ত দত্তের বাড়িতে সরস্বতী পুজোয় কলকাতা থেকে গোলকমণি, দয়ামণি ও রত্নমণি এই তিনদল 'নেড়ি কবি' গান করতে গিয়েছিলেন। নেড়ি শব্দটি হীনতাবাচক (স্মরণীয়: নেড়ানেড়ী), জাত-বৈষ্ণবদের প্রতি উদ্দিষ্ট। খবরে আরও জানা যায় এই জাতীয় নেড়ি কবির দল অনেক সময় পুরুষ কবিওয়ালাদের গানের লড়াইতে বিপর্যস্ত করতেন। ১৮২৮ সালের ২২ নভেম্বরের

'সমাচার দর্পণ' পত্রে একজন 'ভবঘুরে মুচে ডোম কবিওয়ালা'র আবেদন চিঠি থেকে জানা যায় নেড়ি কবির দল 'প্রায় সকল পরবে লোকের বাটিতে নাচিয়া কবি গাহিত, কিন্তু তাহা সদরে কোনো উপায় করিয়া নেড়ীর দায় হইতে রক্ষা পাইয়াছি।'

গোলকমণি-দয়ামণি-রত্নমণিদের মতো আরও অনেক অজ্ঞাত ও অনামিকাদের কথা আজ আর জানা সম্ভব নয় কিন্তু জানা যায় আরো কয়েকজনের নাম। যেমন নীলু ঠাকুর আর রাম বসুর দলের কবিগানের বাঁধনদার যজ্ঞেশ্বরী। তাঁর সঙ্গে রাম বসুর প্রণয় সম্পর্কের ইঙ্গিতও দুষ্প্রাপ্য নয়। শোনা যায়, শুধু কবিগান রচনা নয়, প্রত্যক্ষ আসরে পুরুষ কবিওয়ালাদের সঙ্গে যজ্ঞেশ্বরী কবির লড়াই জমাতেন। ভোলা ময়রার সঙ্গে তাঁর একবার অসম লড়াই হয়েছিল। সকার-বকারে ভোলা ময়রা জিতে যান। এ প্রসঙ্গে ভোলা ময়রার যে-গানখানি পাওয়া যায় তা কুরুচিপূর্ণ।

তবে কবিগানের চেয়ে ঢপ কীর্তনে আদি কলকাতার মহিলাদের নিঃসন্দেহ পারদর্শিতা ছিল। ১৮৪০ সাল নাগাদ সহচরী নামে নারী কীর্তনীয়ার খবর পাওয়া যায়। তাবপরে মেলে জগন্মোহিনীর নাম। জানা যাচ্ছে 'জগন্মোহিনীর ঢপ তৎকালীন লোকে অতিশয় আদর করিতেন! তাহার যেমন বাক্ পরিষ্কার তেমনি স্বরসঞ্চার ছিল। এই জগন্মোহিনীর পর বামা, শ্যামা, রমা, গুরুদাসী, ঠাকুরদাসী প্রভৃতি অনেক কীর্তনীর দল হইয়া গিয়াছে।' এরপরে ভবানী ( নামান্তরে ভবরাণী ) নামের এক স্যাকরা মেয়ে ঝুমুরের দল গড়েন ১৮৫০ নাগাদ। ভবানীর লেখা একটি ঝুমুর গান উদ্ধারযোগ্য। প্রসঙ্গ শিব—

বাপ হয়ে জামাই এনেছে
দোষ দিব কি পরকে।
মোটা সোটা ঢোলের মতন
যম নারে তার বলকে॥
এমন এনেছে জামাই ভাঙ ধুতুরা নাইকো কামাই
পাকা দাড়ি ত্রিশূলধারী
তা দেখে মন টলকে॥

কবিগানে রাধাকৃষ্ণ কাহিনীর মধ্যেকার শুধু কলঙ্ক আর ছলনা অংশটুকু ব্যক্ত হয়েছে তার কারণ বিকৃত শ্রোতাদের রুচি। একই কারণে ভবানী বা ভবরাণীর গানে এসেছে শিবকে নিয়ে ঠাট্টা। এসব ঠাট্টার ধরন আর অমার্জিত ভাষা

সেকালের ঝুমুরের দলে বেশি ছিল, এমনকি মেয়ে-ঝুমুরের দলেও ছিল। একটি স্মৃতিকথা থেকে জানা যাচ্ছে :

> তখনকার দিনে বিবাহতে গরুর গাড়িতে কাগজের ময়ূরপঙ্খী করে তার উপর ঝুমুরওয়ালীর নাচ দিত। ঝুমুরওয়ালীরা সেই ময়ূরপঙ্খীর উপর নাচিত আর পিছনে একটা লোক ঢোল কাঁসি বাজাইত। তাদের গানের একটা উদাহরণ দিচ্ছি, সেটা কালীর বর্ণনা—
>
> মাগী মিন্‌সেকে চিং করে ফেলে
> বুকে দিয়েছে পা।
> আর চোখটা করে জুলুর জুলুর
> মুখে নেইকো রা॥

এসব গানের ভাব ও ভাষার ইতরতা থেকে বোঝা যায় কোন শ্রেণী এ সবের গানের শ্রোতা বা পৃষ্ঠপোষক? তার থেকে আরও বোঝা যায় উনিশ শতকে রবীন্দ্রনাথকে কোন দুরূহ জায়গা থেকে গানের পরিবেশ তৈরি করতে হয়েছে। তাঁর যে মনে হয়েছিল 'প্রাণহীন এ দেশেতে গানহীন যেথা চারিধার' সেকথা বড় অভ্রান্ত সত্য।

কিন্তু সেকালের গানের জগতে নারীর ভূমিকা নিয়ে যে আলোচনা করছিলাম সে সম্পর্কে আরেক রকম তথ্য উদ্‌ঘাটন জরুরী। সমাজের অনুমোদনের বাইরে তখনকার কলকাতার গায়িকাদের কিছুটা পরিচয় দেওয়া গেছে। সেইসঙ্গে বলতে হবে অবাঙালী তয়ফাওয়ালীদের কথা আর বাঈ নাচের শিল্পীদের কথা। অভিজাত বাবুরা এদের আমদানী করতেন সাহেবদের মনোরঞ্জনের জন্য। বাবুসমাজের দুর্গাপূজা ও বড় পার্বণে বাঈনাচ ছিল ইংরাজ তোষণের একটা বড় উপায়। তেমনই কলকাতার কবিগান আর আখড়াই গানের আসরে অল্পবয়সী বালকের দলের একটা আলাদা বড় ভূমিকা ছিল। কবিগানের গায়ক যখন তার সপ্তকে চিতেন ধরতেন তখন বালকের দল তার চেয়েও তীব্রস্বরে যে ধ্বনি তুলতো তাকে বলা হতো 'জিল'। জিল আসলে এরকম অর্থহীন ধ্বনির ('ও ও ও—ওহে আহা হা') প্রমত্ত চিৎকার। সেকালের বিখ্যাত গায়ক মোহনচাঁদ বসু তাঁর বাল্যে নিধুবাবুর আখড়াই দলে জিল দিতেন। আসলে তা ছিল বড় রকমের কণ্ঠমার্জনা।

স্বচ্ছভাবে সবদিক বিচার করলে দেখা যাবে সেকালের কলকাতার গানে স্ত্রীভূমিকা ছিল খুব গুরুত্বপূর্ণ। এই প্রসঙ্গে অন্দর আর বাইরের খবর দেবার পরেও বাকি থাকে আরেক দিক। সেটা হলো গান শিল্পীদের প্রণয় তথা

অনুপ্রেরণার দিক। আমাদের মধ্যযুগের বৈষ্ণব গানে যে মানবীয় প্রেমরস তার মূলে নাকি ছিল কোনো-না-কোনো নারীর প্রেরণা। এই সূত্রেই জয়দেব-পদ্মাবতী, চণ্ডীদাস-রামী, বিদ্যাপতি-লছিমা নামগুলি উঠে আসে। তেমনই সেকালের কলকাতার গানে লিরিকাল প্রণয় সংগীতের ভাবলাবণ্য প্রথম যিনি সংযোগ করেন সেই নিধুবাবুর ( ১৭৪১-১৮৩৯ ) নামের পাশে শ্রীমতী নামে একজন নারীর নাম যুক্ত হয়। শ্রীমতী আসলে ছিলেন মুর্শিদাবাদের মহানন্দ রায়ের রক্ষিতা। ঈশ্বর গুপ্ত তাঁর 'কবিজীবনী'তে নিধু-শ্রীমতী বিষয়ে লিখেছেন :

> ঐ বারবিলাসিনী রামনিধি বাবুকে অন্তঃকরণের সহিত ভালবাসিত ও অতিশয় স্নেহ করিত এবং বাবুও তাহার বিস্তর গৌরব ও সম্মান করিতেন।...তিনি লম্পট ছিলেন না, কেবল স্তুতি, বিনয়, স্নেহ এবং নির্মল প্রণয়ের বশ্য ছিলেন। এই প্রযুক্ত তাহাকে অতিশয় স্নেহ করিয়া প্রায় প্রতি রজনীতেই তাহার গৃহে গমন করিতেন, এবং কিয়ৎক্ষণ হাস্য পরিহাস, কাব্য আলাপ ও গীত বাদ্য করিয়া আসিতেন, আর সেখানে বসিয়া মনের মধ্যে যখন যেরূপ ভাবের উদয় হইত তৎক্ষণাৎ রাগ সুর বদ্ধ করিয়া তাহারি এক এক টপ্পা রচনা করিতেন।

বিবরণের শেষাংশ থেকে সিদ্ধান্ত করা চলে বাংলা গানে একক প্রেমগীতির যে-মৌলিক ধারা নিধুবাবু প্রবর্তন করেন ( যার পরবর্তী সম্প্রসারণ শ্রীধর কথক [ জন্ম ১৮১৬ ] ও কালী মির্জার হাতে ) তার মূলে সম্ভবত সমকালীন যুগ-প্রবর্তনার চেয়ে বড় হয়ে উঠেছিল ব্যক্তিগত প্রেমানুভূতির নিগূঢ় সংরাগ। এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যপূর্ণ গীতময় লিরিকের দ্যোতনার পথে বাংলা গানের ক্রমমুক্তি ঘটে ভবিষ্যতে, যার চরম উৎসার আমরা দেখি রবীন্দ্র-দ্বিজেন্দ্র-রজনীকান্ত-অতুলপ্রসাদ-নজরুল বাহিত বাংলা আধুনিক গানের প্রবাহে। গভীরতর পর্যবেক্ষণে আরও বোঝা যায় নিধুবাবুই বাংলাগানে প্রথম ধর্মব্যতিরিক্ত মানব রসের খণ্ডানুভূতি ছোট ছোট রূপবন্ধে বাঁধেন। আকস্মিক ভাবেই তিনি লিখে ফেলেন আমাদের প্রথম স্বদেশী গান ( 'নানান দেশের নানান ভাষা' )। এমন কি ব্রাহ্ম-ধর্মে কিছুমাত্র আস্থাশীল না হয়েও রচনা করেন ব্রহ্মসংগীত ( 'পরমব্রহ্ম তৎপরাৎপর' )। শোরী মিঞার দ্রুত চালের টপ্পাকে তিনি বাংলা টপ্পায় রূপান্তরিত করেন মীড়বহুল মন্থর ধরনে। একারণেই সেকালে তালের মধ্যে সম্ভবত 'মধ্যমান', 'বাংলা একতাল' ও 'আড়া' গড়ে ওঠে।

পুরনো কলকাতার গানের জগতে যিনি অন্যতম প্রাণপুরুষ সেই দাশরথি

রায়ের জীবন ( জন্ম ১৮০৬ ) বৃত্তান্ত জড়িয়ে আছে অক্ষয়া বাইতিনী ( নামান্তরে অকাবাঈ ) নামে এক বিতর্কিত নারীর সঙ্গে। দাশরথির জীবনের পতন-বন্ধুর উপলপথে অকাবাঈ খুব বড় ভূমিকা নিয়েছিল। সে ছিল দাশরথির মাতুলগৃহ পীলাগ্রামের একজন সুকণ্ঠী বারজীবী। তার একটি কবির দল ছিল। অক্ষয়ার যৌবনলাবণ্যে দাশরথি জড়িয়ে পড়েন এবং হয়ে ওঠেন অকার দলের বাঁধনদার। উচ্চ কুলের স্বল্পশিক্ষিত প্রতিভাসম্পন্ন এই যুবকের এহেন চরিত্রভ্রষ্টতা অভিভাবকদের অনুমোদন পায়নি। তবু দাশুকে তাঁরা নিবৃত্ত করতে পারেননি। তিনি স্বজনদের ত্যাগ করে অকাবাঈয়ের কবিদলের সংসর্গে ভ্রাম্যমাণিক হয়ে ওঠেন এবং নিম্নরুচির কবির আসরে অশ্লীল পয়ার-ত্রিপদী বেঁধে নিম্নবর্গের শ্রোতাদের প্রশংসায় আনন্দে ও আত্মপ্রবঞ্চনায় জীবন কাটাতে থাকেন। কেবল বাঁধনদারের কাজে তাঁর ভবিষ্যৎ জীবনের শিক্ষানবিশি হতে থাকে। কিন্তু একটি সামান্য ঘটনা তাঁর জীবনধারা বদলে দেয়। একবার এক কবির আসরে প্রতিদ্বন্দ্বী গায়ক দাশুর ব্রাহ্মণ্যত্ব নিয়ে এবং বংশ মর্যাদা নিয়ে মর্মন্তুদ ও ইতর ইঙ্গিত করেন। আহত এবং অপমানিত এই বর্ণশ্রেষ্ঠ মানুষটি খেদে পরিতাপে একসঙ্গে কবির দল আর অকার সঙ্গ ত্যাগ করেন। তখন তাঁর বয়স তিরিশ, তবু গড়ে তোলেন এক পাঁচালীর দল। ভবিষ্যতে এই পাঁচালী তাঁকে কলকাতা ও সমগ্র বাংলায় দিয়েছিল নিঃসন্দিগ্ধ নায়কত্ব এবং অপরাজেয় ভূমিকা।

এই পাঁচালী গানেরও অবশ্য এক পূর্ব ইতিহাস ছিল। প্রাচীন পাঁচালী বা পঞ্চালিকার কথা না তুলেও বলা চলে, অর্বাচীন কালে কলকাতায় দাশরথির আগে পাঁচালী গানের উদ্‌ভাবন করেন শোভাবাজারের গঙ্গানারায়ণ নস্কর এবং ঠনঠনিয়ার লক্ষ্মীকান্ত বিশ্বাস। কিন্তু তাঁদের সফলতা ছাপিয়ে দাশরথির পাঁচালী আপামর বাঙালীকে তৃপ্ত করে তোলে। তাঁর জীবন ক্রমে স্থিতু হয়। বত্রিশ বছরে তিনি বিবাহ করেন, যদিও বাহান্ন বছরে তাঁর প্রয়াণ ঘটে। তবু জীবনের শেষ বাইশ বছর দাশরথি রায় সম্পদ সমৃদ্ধি খ্যাতি ও জনপ্রিয়তায় অসামান্যতা অর্জন করে যান। তাঁর তাৎক্ষণিক রচনাক্ষমতা, অলংকার প্রয়োগের নৈপুণ্য, শাস্ত্রজ্ঞান ও ভক্তিরস সমগ্র দেশকে দ্রব করে দেয়। পীলাগ্রামে তিনি অর্জিত অর্থে প্রাসাদ গড়েন এবং নিজের উদ্যমে নিজের পাঁচালী মুদ্রণ করেন। এতদ্‌সত্ত্বেও বলা দরকার যে, দাশরথি সারা বাংলায় যত জনাদর ও স্বীকৃতি পান তার সিকিভাগও পাননি কলকাতার শ্রোতৃসমাজে। এর কারণ কি হতে পারে?

একটা কারণ সরাসরি এই যে, দাশরথির পাঁচালীর বিষয় ও বিন্যাস ছিল একটু সাত্ত্বিক ধরনের আর ভক্তিরসাত্মক। কলকাতার শ্রোতৃসমাজ কবি, দাঁড়া-কবি, খেউড়, আখড়াই, হাফ আখড়াই এইসব নিম্নস্তরের হাল্‌কা চালের অশ্লীলতা মেশানো গান শুনতেই বরাবর অভ্যস্ত, দাশুর কবিত্বপূর্ণ আনুপ্রাসিক পাঁচালী আর তার মধ্যে অনুস্যূত ভক্তিরস তাদের ভালো না লাগতেই পারে। তাছাড়া আরেকটা দিক বিচার্য। দাশুর পাঁচালি অনেকক্ষেত্রে কলকাতার অনেক ব্যাপারস্যাপার নিয়ে ব্যঙ্গমুখর ছিল। বিশেষ করে কর্তাভজাদের নিয়ে ব্যঙ্গ নিম্নবর্গের কলকাতাবাসীদের পক্ষে রোচক হয়নি, কেননা সেকালের কলকাতার শূদ্র সমাজে কর্তাভজাদের বরাতি ছিলেন অনেকে। কারণ যাইহোক, একথা ঠিক যে কলকাতা দাশু রায়ের পাচালীকে সমাদর করেনি, কিন্তু কলকাতায় উদ্ভূত পাঁচালী গানকে দাশুই সারাদেশে জনপ্রিয়তম গীতিমাধ্যমরূপে প্রচার ও প্রসার করেছিলেন একথাও সত্য।

পাঁচালীর সমাদর না করলেও কলকাতার গুণজ্ঞ শ্রোতারা দাশরথির পাঁচালীর অন্তর্গত অনেক গানকে স্মৃতিধার্য করে নিয়েছে। ঈষৎ টপ্পার দানা মেশানো তাঁর 'ননদিনী বোলো নগরে' কিংবা ঝাঁপতালে নিবদ্ধ 'হৃদিবৃন্দাবনে বাস যদি কর কমলাপতি' সেকালের কলকাতাবাসীর মুখে মুখে ফিরেছে। শ্যামাবিষয়ক গানের তালিকায় তাঁর 'দোষ কারো নয় গো মা' গান চিরকালের শ্রোতার জন্য এক অবিনশ্বর সংযোজন। পণ্ডিত না হলেও তিনি ছিলেন মরমী। তাঁর গানে ওস্তাদী কালোয়াতী না থাকলেও আছে অভ্রান্ত সংগীতবোধ। তাঁর বেশির ভাগ পাঁচালি গান যৎ তালে নিবদ্ধ থাকতো বলে অনেকে তাঁকে নাম দিয়েছিলেন 'যোতো দাশু'। এই প্রসঙ্গে বলে নেওয়া উচিত আঠারো শতকের শেষার্ধ এবং উনিশ শতকের গোড়ায় কলকাতায় ওস্তাদি গান তথা মার্গ সংগীতের খুব একটা সমাদর ছিল না। ধ্রুপদ খেয়াল এসব ছিল কলকাতাবাসীর পক্ষে অজ্ঞাত। নিধুবাবু ( জন্ম ১৭৪১ ) এবং কালী মির্জা ( জন্ম ১৭৫০ ) সর্বপ্রথম পশ্চিমদেশ থেকে শিখে এসে টপ্পা, খেয়াল ও টপ্‌খেয়ালের রূপবন্ধ বাংলা গানে যোগ করেন। ধ্রুপদ কলকাতায় আসে অনেক পরে, রামমোহনের ( জন্ম ১৭৭৪ ) চেষ্টায় ব্রহ্মসংগীতের আঙ্গিক আশ্রয় করে। অবশ্য আনুমানিক ১৭১২ সাল বরাবর অর্থাৎ আঠারো শতকের গোড়ায় বিষ্ণুপুরে রাজা দ্বিতীয় রঘুনাথের সময় ধ্রুপদের চর্চা শুরু হয়েছিল। কলকাতায় খেয়াল ঠুংরির সত্যিকারের খানদান শুরু হয় ১৮৫৬ থেকে ১৮৮৭ সালের মধ্যে। যখন লক্ষ্ণৌর নবাব ওয়াজেদ আলি শাহ্‌

মেটিয়াবুরুজে বন্দীজীবন কাটান সঙ্গে আনা ওস্তাদ কলাবন্তদের সাহচর্যে। তার আগেই অবশ্য ঢাকায় ছিল কালোয়াতদের সাথ্‌সঙ্গতী।

এতক্ষণকার আলোচনায় পুরনো কলকাতার শ্রোতৃসমাজকে নানাভাবে দোষের ভাগী করা হয়েছে প্রধানত তাঁদের রুচিদুষ্টতার কারণে। কিন্তু তাঁদের নানা বর্গের বাংলা গানের পরিপোষণার দিকটিও আলাদা করে বলা দরকার। বিশেষত ধনীসমাজ বহুক্ষেত্রে এগিয়ে না এলে বেশ কিছু গায়ক ও শিল্পী তাঁদের প্রতিষ্ঠাভূমি হয়তো পেতেন না, এমন কি গানই হয়তো গাইতেন না কোনোদিন। এ ব্যাপারে সবচেয়ে রোমাঞ্চকর ও কিংবদন্তীমূলক শিল্পী-আবিষ্কার-কাহিনী কলকাতা-কাঁপানো বিদ্যাসুন্দর যাত্রার সঙ্গে সম্পৃক্ত গোপাল উড়েকে ঘিরে গড়ে উঠেছে। উড়িষ্যার যাজপুরে গোপালের জন্ম অনুমান ১৮১৯ সালে। উৎকলবাসী এই যুবা ভাগ্য-সন্ধানে এসে কলকাতার অলিগলিতে চাঁপাকলা ফেরি করতেন। হঠাৎ তিনি কিছু গীতিপ্রিয় বিলাসী মানুষের নজরে পড়ে তাদের অনুগ্রহভাজন হয়ে ওঠেন। সেটি ১৮৪০ সালের ঘটনা। বউবাজারে রাধামোহন সরকার মহাশয়ের বাড়িতে বিদ্যাসুন্দরের কাহিনী নিয়ে এক মহড়া চলছিল। সঙ্গে ছিলেন বউবাজারের বিশ্বনাথ মতিলাল, হৃদয়রাম বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি। সহসা পাশের গলিতে 'চা-ই চাঁপাকলা' এমন সুরেলা আওয়াজ শুনে বিশ্বনাথ মতিলাল বলে উঠলেন 'ওরে, কে আছিস্‌ রে ; গান্ধার বলছে রে, চাঁপা কলাকে ধরে আন্‌'। সুরজ্ঞ অমিয়নাথ সান্যাল ব্যাপারটি ব্যাখ্যা করেছেন এই বলে যে—'মজলিসে স্বরযন্ত্রে যে সুরটি বাঁধা হয়ে সরগরম্‌ হয়েছিল, সেই স্বরের অনুবাদী গান্ধার স্বরে "চাই চাঁপাকলা" ডাক প্রতিধ্বনিত হয়েছিল। ষড়জ সুরের পরে, অথবা সঙ্গে, শুদ্ধ গান্ধারের আবির্ভাব হলে কানে কি রকম ভাল লাগে এবং আসরের আবহাওয়াকে কি রকম জমিয়ে তোলে—স্বরবিলাসী ব্যক্তিমাত্রই জানেন।'

যাহোক, স্বরবিলাসী মতিলাল মহাশয়ের আকস্মিক আবিষ্কার সেই গোপাল উড়ে বাবুদের আনুকূল্যে গানবিদ্যায় ব্রতী হন মজলিসের ওস্তাদ হরিকিষেণ মিশ্রের কাছে। পরে তাঁর বিদ্যাসুন্দরের গানে এত খ্যাতি হয় যে 'গোপাল উড়ের টপ্পা' নামে একরকম গীতরূপ প্রসিদ্ধ হয়ে ওঠে। ১৮৪২ সালে রাজা নবকৃষ্ণ দেবের বাড়ি সর্বপ্রথম রাধামোহন সরকারের দলের 'বিদ্যাসুন্দর' গীতাভিনয় হয়। গোপাল উড়ের গান ও অভিনয়ে মুগ্ধ হয়ে তাঁর পোষ্টা রাধামোহন গোপালের বৃত্তির টাকা দশ থেকে বাড়িয়ে পঞ্চাশ করে দেন। পরে রাধামোহনের দল হাটখোলার দত্ত-বাড়ি এবং আশুতোষ দেবের বাড়িতে বিদ্যাসুন্দর করে। এতে রাধামোহনের

সাজসরঞ্জাম বাজনাবাদ্য আয়োজনে লক্ষাধিক টাকা খরচ হয়। কিন্তু মাত্র ত্রিশ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু ঘটলে দল ভেঙে যায়। তখন গোপাল উড়ে তাঁর পৃষ্ঠপোষকের পাণ্ডুলিপি, সাজপোশাক, সরঞ্জাম নিয়ে নতুন দল খোলেন, অনেক নতুন গান সংযোজন করেন এবং ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত বহু যশ ও সমাদর পেয়ে প্রয়াত হন। তাঁর গানে ও অভিনয়ে কলকাতা আপ্লুত হয়ে যায়। এ বিবরণ থেকে বুঝে নেওয়া যায়, 'chance directed chance erected' কলকাতা নগরীর মতো গোপাল উড়েও এক আশ্চর্য নগর পরিবেশের আকস্মিক নির্মাণ। তার চেয়েও আশ্চর্য এই যে অনেকের মতে 'গোপাল উড়ের টপ্পা' নামে প্রসিদ্ধ গীতাভিনয়ের কোনো অংশই তাঁর রচনা নয়। সম্ভবত কৈলাস বারুই, শ্যামলাল মুখোপাধ্যায় ও ভৈরব হালদার সেই বিদ্যাসুন্দর পালার বাঁধনদার। গোপালের কৃতিত্ব হলো কলকাতার তখনকার হাল্‌কা জনরুচি বুঝে তাতে সুরারোপ, নৃত্যাংশ নির্মাণ এবং সমগ্র ব্যাপারটিকে সার্থক ভাবে রূপায়িত করার কৌশল।

যথাযথ পৃষ্ঠপোষকতা কী ভাবে পুরনো কলকাতার গানের আবহাওয়াকে সমৃদ্ধ করে তুলেছিল তার বর্ণনা গোপাল উড়ের সূত্রে আমরা পাই, আবার অন্যদিকে পৃষ্ঠপোষকদের সঠিক পরিকল্পনা ও স্থির আদর্শের অভাবে কেমন করে প্রকৃত প্রতিভা বিপথগামী হয়ে যায় তার নমুনা গোপাল উড়ের সমকালীন গীতশিল্পী রূপচাঁদ পক্ষীর (জন্ম ১৮১৫ বা ১৮১৮) ঘটনা। কিন্তু সে ঘটনার পূর্বসূত্রে জানা দরকার আদি কলকাতার 'পক্ষীর দল' সম্পর্কে। সেকালে কলকাতায় ধনীঘরের বখাটে ছোকরারা একেক জায়গায় গাঁজার আখড়া খুলেছিল। বাগবাজারে এমনই এক আটচালায় রামনারায়ণ মিশ্র 'পক্ষীর দল' তৈরি করেন। মহারাজ গোপীমোহন ঠাকুর ছিলেন পক্ষীর দলের একজন পৃষ্ঠপোষক। অবশ্য অনেকের মতে শিব মুখুজ্যে বা শিবচন্দ্র ঠাকুর সর্বপ্রথম পক্ষীর দল গড়েন কলকাতায়, তিনি ছিলেন রাজা নবকৃষ্ণ দেবের বন্ধু অতএব দলগঠনে রাজার আনুকূল্য ছিল। যেহেতু নবকৃষ্ণের মৃত্যু ঘটেছিল ১৭৯৮ সালে তাই বলা যায়, পক্ষীর দলের সংগঠন আঠারো শতকের শেষাশেষি। পক্ষীর দল আসলে ধনাঢ্য ব্যক্তিদের অলস মস্তিষ্কের ইতর উপভোগের বিষয়। হুতোম তাঁর অননুকরণীয় ভাষায় পক্ষীদের সম্পর্কে ইঙ্গিত করে গেছেন :

> শিবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বাগবাজারে রিফর্মেশনে রামমোহনের সমতুল্য লোক। তিনি বাগবাজারেদের উড়তে শেখান। সুতরাং কিছুদিন বাগবাজারেরা শহরের টেক্কা হয়ে পড়েন। তাঁদের একখানি পাব্‌লিক

আটচালা ছিল; সেইখানে এসে পাখি হতেন, বুলি ঝাড়তেন ও উড়তেন।

ঈশ্বরগুপ্ত পক্ষীদের বর্ণনা ও তাদের বুলি সংকলন করে গেছেন। তাঁর ভাষ্য :

> পক্ষির দলের পক্ষি সকলেই ভদ্রসন্তান, ও বাবু এবং সৌখিন্ নামধারি সুখি ছিলেন। পক্ষিগণ গাঞ্জার গুণানুসারে নাম পাইতেন। তাবতেই বাসা বাঁধিতেন, কুটা বহিতেন, ডিম পাড়িতেন, আধার খাইতেন ও বুলি ঝাড়িতেন।
>
> যথা। পক্ষির বুলি।
>
> 'ভিষিন্, কিটি কিটি কিস্ কিসিন্'।
>
> 'চুকু নুকু চুকু, চুক্ চুকুন্'
>
> 'কিচি মিচি কিচি, কিচিন কিন্'
>
> 'কু কু, রামসালিকে, কু, কু, গঙ্গা বিসং'।
>
> এই সমস্ত দ্বিপদ পক্ষির আকাশ-ভেদি বুলি সকল দ্বিপদ পক্ষিরাই বুঝিতে পারিতেন, অন্যের বুঝিবার সাধ্য কি।

রূপচাঁদের পিতা উড়িষ্যা থেকে কলকাতা এসেছিলেন। পক্ষীর দল গঠনের আগে রূপচাঁদ কিছু লেখাপড়া শেখেন পাঠশালা ও ইংরাজি স্কুলে কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভিড়ে যান তখনকার কলকাতার রঙ্গব্যঙ্গ গান ও আমোদপ্রমোদে। সেকালকার বেশ কজন ওস্তাদের কাছে গান ও বাজনা শেখেন। গান রচনা ও সুর প্রয়োগে তাঁর সহজাত দক্ষতা ছিল। তাছাড়া ছিল নিপুণ পর্যবেক্ষণশক্তি, পরিবেশচেতনা ও ব্যঙ্গবিদ্রূপের দৃষ্টিভঙ্গী। এ ব্যাপারে তাঁর তুল্য প্রতিভা ছিল আরেকজনের, তিনি প্যারীমোহন কবিরত্ন। বস্তুত সেকালের কলকাতায় নিছক রঙ্গব্যঙ্গ ও হাস্যপরিহাসমূলক একক গানে রূপচাঁদ ও প্যারী ছিলেন অতৃতীয় ব্যক্তিত্ব। তার মধ্যে রূপচাঁদের গানে ইংরাজি শব্দের ব্যবহার একেবারে অনবদ্য ও অভিনব। 'লেট মি গো ওহে দ্বারী/আই ভিজিট টু বংশীধারী' কিংবা 'আমারে ফ্রড ক'রে কালিয়া ড্যাম' বর্গীয় গান বাংলা হাসির গানের অগ্রদূত। রূপচাঁদের গানেই আমরা সর্বপ্রথম পাই কলকাতার বর্ণনা ('ধন্য ধন্য কলিকাতা শহর স্বর্গের জ্যেষ্ঠ সহোদর')'। কিন্তু রূপচাঁদের রচিত ভক্তি ও দেহতত্ত্বের গান শুনলে বোঝা যায় কত বড় কবিত্বের সম্ভাবনা তাঁর রঙ্গব্যঙ্গের বেঠিক পথে ব্যয় হয়ে গেছে। রূপচাঁদের জীবন ও গান প্রকৃতপক্ষে আজব শহর কলকাতার একরকম দ্বান্দ্বিক সৃজন।

গোপাল উড়ে আর রূপচাঁদ পক্ষী যেমন নিছক নগর কলকাতার নির্মাণ, তেমন কথা বলা যাবে না গোবিন্দ অধিকারী (জন্ম ১৭৯৮), কৃষ্ণকমল গোস্বামী (জন্ম ১৮১০) ও নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় (জন্ম ১৮৪২) সম্পর্কে। যদিও এই তিনজনের কৃষ্ণযাত্রার গান ছুঁয়ে গেছে কলকাতার শ্রোতৃসমাজকে বিপুলভাবে। এঁদের তিনজনেরই জন্ম কলকাতার বাইরে এবং প্রতিষ্ঠাভূমি বাংলার অগণন গ্রামে গঞ্জে নগরে তবু কলকাতা এঁদের সমাদর করেছে। এঁদের মধ্যে গোবিন্দ ও নীলকণ্ঠ অসামান্য প্রসিদ্ধি পেয়ে গেছেন। গোবিন্দ জীবন সায়াহ্নে কলকাতার পশ্চিমপারে শালকিয়ায় আশ্রয় লেন। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে কলকাতায় মঞ্চ নাটক জনপ্রিয় হওয়া সত্ত্বেও কৃষ্ণকমলের ভক্তিরসাশ্রিত কৃষ্ণযাত্রা এবং তার অন্তর্গত মনোহরশাহী কীর্তন কলকাতাবাসীদের ভালো লেগেছিল। আর নীলকণ্ঠের প্রথম সুরের দীক্ষা তো কলকাতাতেই। মাত্র তেরো বছর বয়সে পিতৃহীন নীলকণ্ঠ বড়বাজারে এক মাড়োয়ারীর বাসনের দোকানে কাজ নিতে বাধ্য হন। সুকণ্ঠ ও সুবিনয়ী নীলকণ্ঠকে স্বেচ্ছায় গান শিখিয়ে দেন তার নিয়োগকারীর রক্ষিতা। সেই গানের সম্পদ ও সংগীতবিদ্যা নিয়ে নীলকণ্ঠ স্বগ্রামে ফিরে আসেন এবং কৃষ্ণযাত্রার দলে জীবিকা সংগ্রহ করেন। পরে তার নিজের দল হয়। তার আগে তিনি গোবিন্দ অধিকারীর দলে বেতনভুক গায়কতা করেছেন। সেকালকার কলকাতার বিদগ্ধ সমাজ নীলকণ্ঠের কৃষ্ণযাত্রার প্রচুর সমঝদারী করেছেন।

আমাদের আলোচনা পুরনো কলকাতার সব রকম গানকে ঘিরে, তার পরিবেশকে বুঝিয়ে আবার ফিরে যাবে এবার উৎসের দিকে। একেবারে সেই আঠারো শতকের বাতাবরণে, যখন নবীন নগর আর তার নবীনতর নাগররা স্বচ্ছ বা স্পষ্ট বিনোদনের কোনো আদর্শ বা পরিকল্পনা পায়নি। একক বা ছোটখাট দলে হয়তো বা শুনছেন রামপ্রসাদী গান কিংবা কীর্তন (মনোহরশাহী) ও কথকতা। পথচলতি বাউল বুঝিবা শুনিয়ে গেল দুচার কলি দেহতত্ত্ব বা আখেরি চেতনের গান। সম্পূর্ণ নতুন এক নগর, অস্পষ্ট ও অস্ফুট তার রস-পিপাসার ধরন, অচেনা নানা মেজাজ-মর্জির মানুষজন। সামনে তাঁদের ছিল না কোনো আত্মপ্রকাশের আকুলতা। সম্মিলিত সমাজমানসে তখনও রয়ে গেছে বিভ্রান্তি আর চাঞ্চল্য। তখনই প্রতিযোগিতামূলক কবিগান, যাতে ছিল উত্তেজনা ও নিম্নরুচির লড়াই, সহসা স্থান করে নিলো কলকাতায়। সেটাই আদি কলকাতার আদি গানের নমুনা।

আসরে ঢোল সহকারে দুইদল কবির পাল্লাপাল্লির এই গীতরীতির জন্ম

সতেরো শতকের শেষাশেষি হুগলী আর নদীয়ায়। এর উদ্ভব কৃষ্ণযাত্রা না ঝুমুর থেকে তা নিয়ে পণ্ডিত মহল দ্বিধাবিভক্ত। তবে প্রথম কবিওয়ালা হিসাবে গোঁজলা গুঁইয়ের (আনুমানিক ১৭১৪ সাল) নামে কোনো বিতর্ক নেই। ১৮৫০ সাল নাগাদ কলকাতায় কবিগানের চিহ্নমাত্রও ছিল না। কিন্তু গোটা আঠারো শতক ও উনিশ শতকের গোড়ায় কবিগান আর কবিওয়ালারা বিপুল জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। ঈশ্বর গুপ্ত এবং অন্যরা যেসব কবিগান সংগ্রহ করেন তার থেকে অনেক কবিওয়ালার হদিশ ও গানের আঙ্গিক পাওয়া গেছে তবে গায়নরীতি বা সুর পাওয়া যায়নি। রাসু-নৃসিংহ, হরু ঠাকুর, নিত্যানন্দ বৈরাগী, রাম বসু, কেষ্টা মুচি, লালু নন্দলাল (পরবর্তীকালে ভোলা ময়রা, অ্যাণ্টনি ফিরিঙ্গি) এই সব কবিওয়ালার নাম লক্ষ করলে বোঝা যাবে কত বিচিত্র জাতি ও বর্ণ এই বিনোদনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। এঁদের গানের প্রসঙ্গ ছিল ভবানী-বিষয়ক, সখী সংবাদ, বিরহ, গোষ্ঠ, লহর ও খেউড়। গানগুলি কতকগুলি লৌকিক তুকে বিভাজন করা হতো। চিতেন, পরচিতেন, ফুকা, মেলতা, মহড়া, খাদ, অন্তরা, পাড়ন এইসব তুকের নাম আজ নিরর্থ শব্দমাত্র। পরবর্তী বাংলা গানেও অবশ্য এসব শব্দ পাওয়া যায়।

পুরনো কলকাতার কবি আর তর্জা গান সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছিলেন, 'উচ্চৈস্বরে চারিজোড়া ঢোল ও চারিখানা কাঁসি সহযোগে সদলে সকলে চীৎকার।' এমন মন্তব্য অবশ্য আখড়াই বা হাফ-আখড়াই সম্বন্ধে খাটবে না। বিশেষত আখড়াই গানে গান ও বাদ্যের একটা ব্যাপক ও মার্জিত ভূমিকা ছিল। আখড়াই গান নদে-শান্তিপুর থেকে হুগলী-চুঁচুড়ায় বিস্তৃত হয়, তাতে আনা হয় নানা রূপান্তর আর ওস্তাদীর ঠাটবাট। তারপরে কলকাতায় আঠারো শতকের শেষে আখড়াই গান বহুল যন্ত্রসহযোগে গীত হতে শুরু হয়েছে। তবে তার চরমোৎকর্ষ ঘটে নিধুবাবুর মামা (মতান্তরে মামাতো ভাই) কুলুইচন্দ্র সেনের প্রতিভার সংযোগে। তাঁর পোষ্টা ছিলেন রাজা নবকৃষ্ণ দেব। কুলুইচন্দ্র ছিলেন তাঁর সভাসদ। ঈশ্বর গুপ্ত এই কুলুইচন্দ্রকে 'আখড়াই গাহনার একজন জন্মদাতা' বলে উল্লেখ করেছেন। কুলুইচন্দ্র প্রণীত আখড়াই গানে শাস্ত্রীয় সুরতালের সংযোগ ঘটেছিল এবং কনসার্টের স্বতন্ত্র পরিকল্পনা ছিল। ১৮০৬ সাল বরাবর এ-জাতীয় সানুপুঙ্খ আখড়াই গান 'সাজের বাজনা' অর্থাৎ বেহালা, ঢোলক, তানপুরা, মন্দিরা, মোচঙ্গ, খরতাল, জলতরঙ্গ, বীণা, সেতার, বাঁশি ইত্যাদি ধ্বনিপুঞ্জে সমৃদ্ধ হয়ে কলকাতায় লোকরঞ্জন হয়ে ওঠে। এই তথ্য থেকে বোঝা যাচ্ছে ইত্যবসরে উন্নত সংগীতবোধের

জন্ম হয়েছে। ইতর অনুষঙ্গের অশ্লীল গান সরে গিয়ে উচ্চাঙ্গ গানের দিন এগিয়ে আসছে ক্রমে। ১৭৯৮ সালের মধ্যে রাজা নবকৃষ্ণের প্রয়াণ ঘটলে তাঁর সন্তান রাজা রাজকৃষ্ণ এগিয়ে আসেন শ্রীদাম দাস, রাম ঠাকুর ও নসিরামের আখড়াই গানের পৃষ্ঠপোষকতায়। অন্যদিকে ১৮০৫ সালের মধ্যে নিধুবাবুর নেতৃত্বে কলকাতায় আরো দুটি সৌখিন আখড়াই দল গড়ে ওঠে। ক্রমে বাগবাজার, শোভাবাজার, মনসাতলা ও পাথুরিয়াঘাটায় সৌখিন আখড়াই দলের মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হয়। তাতে সর্বদাই নিধুবাবুর বাগবাজারের দল বিজয়ী হতো। নিধুবাবুর চমকপ্রদ সংগীত রচনা এবং তাতে তাঁর শিষ্য প্রসিদ্ধ মোহনচাঁদ বসুর গায়ন এই মণিকাঞ্চন সংযোগ ঘটেছিল। সৌখিন আখড়াই দলের অসামান্য সাফল্য ও জনাদরে পেশাদারী আখড়াই দল আসর ত্যাগ করলো। কিন্তু আখড়াই গানও টিকলো না, কারণ আখড়াই গানের রূপরীতির জটিলতা বর্জন করে মোহনচাঁদ অবিলম্বে হাফ-আখড়াই চালু করলেন। এবারে তার যা রূপ হলো তা অনেকটা দাঁড়া-কবির (অর্থাৎ পূর্বকল্পিত রীতিমাফিক) মতো। আখড়াইয়ের পূর্ব গৌরব ক্ষুন্ন হলো। কিন্তু মোহনচাঁদ যুগের হাওয়া বুঝে এই পরিবর্তন করেছিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন বৃদ্ধ নিধুবাবুর পক্ষে বেশিদিন বাঁধনদারী ও গীতরচনা সম্ভব নয়। তাছাড়া 'দাঁড়া-কবি'-গানের উক্তিপ্রত্যুক্তিময় রীতি অনেক শ্রোতাকে সহজে টানে অথচ তাতে কবিগানের রুচিদুষ্টতা নেই। হাফ-আখড়াই তাই শেষ পর্যন্ত হয়ে ওঠে উনিশ শতকের সর্বশেষ জনপ্রিয় গণগীতি। কিন্তু তাতেও ক্ষয়ের চিহ্ন লাগলো। কেননা ঐ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলা গান জেগে উঠলো নবগঠিত মঞ্চাশ্রয়ে, ব্রাহ্মসমাজে এবং কোনো কোনো একক গীতিকারের অনুপম কণ্ঠলাবণ্যে ও বিমিশ্র রাগরাগিণীর সমন্বয়ে, এমনকি প্রতীচীর সুরসমৃদ্ধ হয়ে। বাংলা গানের প্রসঙ্গও বদলে যাচ্ছিল দ্রুত। জেগে উঠছিল প্রণয় গানের পাশে ব্রহ্মসংগীত, নাট্যগানের পাশে দেশবোধের গান। রামমোহন, মাইকেল, কার্তিকেয়-চন্দ্র, মনোমোহন বসু, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, গিরিশচন্দ্র নানাভাবে গড়ে তুলছিলেন নতুন যুগের নতুনতর গান, যা পূর্ণাঙ্গ রূপ পেয়ে গেল উনিশ শতকের কলকাতাতেই এক অপরিসীম প্রতিভাধর গীতিকারের কথা ও সুরে। গীত-সুধার তরে চিত্ত পিপাসিত সেই যুবক ১৮৭৫ সালে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে চোদ্দ বছর বয়সে তাঁর প্রথম গানটি লিখে ফেললেন।

কিন্তু তাই বলে একথা ভাবা ঠিক হবে না যে রবীন্দ্রনাথের একক প্রতিভা সম্ভাবিত করলো নতুন যুগের নতুন গান। তাঁর বিকাশের পিছনে ছিল সমসাময়িক

সংগীত পরিবেশের প্রভাব। সেই সংগীতের পরিবেশ গড়ে উঠেছিল পুরনো কলকাতার নানা রকমের গীতিরীতির গ্রহণে ও বর্জনে। বর্জিত হয়েছিল বিষয়ের স্থূলতা আর বাণীর অশালীনতা। তাছাড়া আসরের ঢক্কানিনাদ, অনুষঙ্গী বাদ্যের কর্ণভেদী আওয়াজ, নৃত্যপরতা আর হালকা মনোরঞ্জনের চটুল ইঙ্গিত থেকে সংগীতকে মুক্ত করার কাজে পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুরবাড়ির শৌরীন্দ্রমোহন ও তাঁর গীতসুহৃদ ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী খুঁজছিলেন নানা নতুন দিশা। দেশি-বিদেশি সুর ও যন্ত্র সমন্বয়ে তৈরি হচ্ছিল নিরীক্ষামূলক বঙ্গৈকতান। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর আর কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণয়ন করছিলেন বাংলা গানের স্বরলিপির পদ্ধতি। ব্রাহ্মসমাজ উদ্যম নিচ্ছিলেন বিষ্ণুপুরের ধ্রুপদকে ব্যবহার করে প্রণয়োচ্ছ্বসিত হালকা বাংলা গানে ভাব ও বন্দিশের গাম্ভীর্য আনতে। ওদিকে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাডিতে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ পিয়ানোর গৎ ভেঙে বাংলা গানে নতুন প্রাণন ও আবেগ আনতে প্রয়াসী ছিলেন। গিরিশচন্দ্র থেকে বাংলা নাট্যসংগীত নানা অনুসন্ধানের পথে নিজের স্বরূপ ও প্রতিষ্ঠাভূমি খুঁজছিল। জেগে উঠছিলো বাংলা গানে দেশভাবনার অনচ্ছ ইঙ্গিত। সংগীত-শাস্ত্র অনুবাদ, সংগীত-সমাজ প্রতিষ্ঠা, সংগীত-পত্রিকা প্রকাশ, সংগীত বিষয়ে নিবন্ধ রচনা সবই চলছিলো সমান্তরালে। অন্তঃপুরিকা সুকণ্ঠী নারীদের আনা হচ্ছিলো পাদপ্রদীপের সামনে। সব মিলিয়ে কলকাতার পুরনো গানের স্মৃতিবেদীর উপরে গডে উঠছিলো এক নবীন গীতি-ভাবনার বনিয়াদ। শিক্ষিত রুচি, মার্জিত কণ্ঠ, সুষ্ঠু সংগীতবোধ, স্থির লক্ষ্য, উন্নত আদর্শ, দৃপ্ত প্রতিজ্ঞা ও উন্নতমানের সৃজনীসামর্থ্য সকলের অলক্ষে নির্মাণ করছিলো রূপ ও রসের জগৎ, শ্রোতা ও গায়কের যুগলবন্দী। প্রতীচ্য ও বিশ্বভাবনাও সেই মহা আয়োজনে যেমন উপেক্ষিত থাকেনি, তেমনই অনাদর হয়নি বাংলাব আবহমান লোকায়ত বর্গের গান। উনিশ শতকের নানা গীতরীতি সতর্ক অনুধাবনে সমীকৃত হয়েছে নতুন ভাবনা ও রূপায়ণে। মনোহরশাহী কীর্তন, কৃষ্ণযাত্রা, ঢপ কীর্তন, সখী সংবাদ, দাশরথির পাঁচালি, কালী মির্জা, শ্রীধর কথক, নিধুবাবুর টপ্পা গান সবই আহরিত হয়েছে নানা মাত্রায় আর ধরনে, সরাসরি কিংবা পরিশ্রুত হয়ে। এইভাবেই পুরনো কলকাতার গানের বিভায় আলোকিত হয়েছে নতুন কলকাতার গান।

তথ্যসূত্র—বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত। চতুর্থ খণ্ড। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যাব। ঈশ্বর গুপ্ত রচিত কবিজীবনী : ভবতোষ দত্ত সম্পাদিত। বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা : বিনয ঘোষ। **Vaisnavism in Bengal : Ramakanta Chakravarti**। বাঙ্গালীর গান : দুর্গাদাস লাহিড়ী সম্পাদিত। 'প্রাঙ্গণ-বিহারিণী রসবতী' : উনিশ শতকের কলকাতার লোকসংস্কৃতিতে মহিলা শিল্পী : সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়।

# গান-জাগানিয়া

'সৃষ্টির চেয়ে সমালোচনাই বৈদগ্ধ্যের সেরা নিদর্শন' : ক্লাইভ বেল

এখন ভাবলে অবাক লাগে যে, আধুনিক কালের বাংলা গানকে যাঁরা ভাবসম্পদ ও মৌলিক রূপনির্মাণের দিক থেকে সকলের গ্রহণযোগ্য করে গেছেন সেই রবীন্দ্রনাথ-দ্বিজেন্দ্রলাল-রজনীকান্ত-অতুলপ্রসাদ আবির্ভূত হয়েছিলেন মাত্র দশ বছর সময়সীমার মধ্যে। রবীন্দ্রনাথের জন্ম ১৮৬১ সালে, দ্বিজেন্দ্রলালের ১৮৬৩, রজনীকান্ত ১৮৬৫ এবং অতুলপ্রসাদের জন্ম ১৮৭১ সালে। সকলের মধ্যে কেমন যেন একটা অলক্ষ যোগাযোগ ছিল। কামারশালায় যেমন লোহাকে আগুন দিয়ে নরম করা মাত্র রূপদক্ষ লৌহ-শিল্পীরা পরের পর আঘাত করে তার রূপনির্মাণ করে, কোনো অদৃশ্য সংগীত-বিধাতার নির্দেশে তেমনই এই চার অলৌকিক কিন্নর বাংলাগানের অনির্ণীত রূপাবয়ব সংগঠনে ও বাঙালীর বাণীময় আত্ম-উদ্‌ঘাটনে পরপর আবির্ভূত হয়েছিলেন। কিন্তু কোনো দেশের কোনো মৌলিক সৃষ্টির ইতিহাস ক্রম-বিচ্ছিন্ন কিংবা আকস্মিক নয়। তাই আমরা লক্ষ করি, বাঙালীর নিজস্ব সংগীত কেমন হবে সে সম্পর্কে উদ্‌বেগ, উৎকণ্ঠা ও আত্মচিন্তা উনিশ শতকের তৃতীয় দশক থেকে আরম্ভ হয়ে গেছে। একদিকে ভারতীয় ধ্রুপদ গানের গম্ভীর আবহ, আরেকদিকে বিদেশী অর্কেস্ট্রার নবীনতা এবং বাংলার নবাব-জমিদার-অভিজাত সমাজ পরিপোষিত উত্তর-ভারতীয় কলাবন্তদের তানবাজী ও সুরের কৌলীন্য—এসবের মধ্যে থেকে কেমন করে বাংলার নিজস্ব গান জন্ম নেবে সে দুর্ভাবনা অনেক চিন্তানায়কের মনে জেগেছিল। বাঙালীর নিজস্ব গানের উদাহরণ হিসাবে তখন জাগ্রত ছিল কীর্তন ও বাউলের অর্ধ-উন্মোচিত ঐতিহ্য, নিধুবাবু ও অন্যান্যদের বৈঠকী গান ও খণ্ড প্রেমগীতি, থিয়েটারি গান, যাত্রা, ঢপ আর পাঁচালির গান। যাকে লোকসংগীত বলা হয়, অর্থাৎ বাউল-ভাটিয়ালি-জারি-সারি-মুর্শিদা, তার অমিত সম্ভাবনা ও সৃষ্টিধর্মিতা তখনো আবিষ্কৃত হয়নি। নবগঠিত ব্রাহ্মসমাজে ভারী ভারী তালে তখন রামমোহন ও অন্যান্যদের নৈর্ব্যক্তিক সংগীত ধ্বনিত হচ্ছিল। বিষ্ণুপুর ঘরানা তখন ক্ষীয়মাণ। বাংলা রঙ্গমঞ্চে দেশি-বিদেশি সুর মিলিয়ে একটা গানের ধাঁচ তৈরি হয়েছিল। কবিওয়ালাদের পরাক্রম তখন

শেষ। গান বলতে অভিজাত মহলে বোঝাতো ওস্তাদী হিন্দুস্থানী গান। মেটেবুরুজে নবাব ওয়াজিদ আলীর নির্বাসন এবং তাঁর সঙ্গে আসা উত্তর-ভারতীয় কলাবন্তদের দল বাংলার সংগীতকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। এদেশের শহর ও গ্রামের অনেক জমিদার, রাজারাজড়া ও সামন্ত প্রভুদের গানের আসরে সে সময়ে বেতনভোগী পশ্চিমী ওস্তাদ ও তাদের সাগরেদরা থাকতেন। তাঁদের কাজই ছিল সব রকমের বাংলা গানকে নস্যাৎ করা এবং ওস্তাদী গানের তানসর্বস্বতাকে বড় করে দেখানো। ঢাকা এবং বৃহৎবঙ্গ ছিল এঁদেরই কর্তৃত্বে। কলকাতা ও বিষ্ণুপুরে বাংলা গানের সংরক্ষণ এবং সংগীতসমাজ সংগঠন বিষয়ে কিছু প্রয়াস ছিল, তা মূলত আনুষ্ঠানিক ও বিচ্ছিন্ন। আদি ব্রাহ্মসমাজের বিষ্ণু চক্রবর্তী ও বিষ্ণুপুরের রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী ছিলেন সেকালের নামী গায়ক। কিন্তু ভিতরে ভিতরে একটা অস্থিরতা, একটা নবসৃষ্টির উদ্বেলতা ছিলই। রবীন্দ্র-পূর্ব কালের বাংলা গানের স্থপতি ছিলেন জনকয়েক সচেতন বাঙালী। তাঁদের মধ্যে বিশেষ স্মরণীয়: রাধামোহন সেন, ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী, শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর, কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, মনোমোহন বসু।

এঁরা একক ও যৌথভাবে সেকালের বাংলা গানের জন্য যা করতে চেয়েছিলেন তার সার কথা হল:

১. নতুন যুগের ভাবানুযায়ী গান রচনা এবং সেই গানের ভাবের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ গীতরীতি অনুসরণ। এই প্রয়াস থেকে বাংলা ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্ খেয়াল, টপ্পা প্রভৃতির প্রবর্তন ও ক্রমোৎকর্ষ ঘটে। নতুন তালেরও সৃষ্টি ( যেমন, আড়া, মধ্যমান ও একতাল ) হয়। গানের বয়নে বিলিতি সুরের সংযোগ ঘটে, ফলে ভাবপ্রকাশের নতুন উপাদান পাওয়া যায়।

২. দেশে-বিদেশে প্রচলিত নানা স্বরলিপি-পদ্ধতির সারাৎসার করে একটি সর্বজনবোধ্য, সরল ও স্বল্পব্যয়ে মুদ্রণযোগ্য স্বরলিপি-পদ্ধতি ( আকারমাত্রিক ) প্রণয়ন এবং তার সাহায্যে বাংলা গানের সংরক্ষণ ও প্রচার।

৩. সংগীত-বিষয়ক পত্রিকা প্রকাশ করে সাধারণ মানুষের মনে সংগীত সম্পর্কে কৌতূহল ও অনুরাগ সৃষ্টি করা এবং সংগীত-সংক্রান্ত সংবাদ প্রচার। সংস্কৃত ভাষায় লেখা সংগীতের কোষগ্রন্থগুলির অনুবাদ, সংগীত বিষয়ে নতুন বই লেখা এবং ভারতীয় ও আন্তর্জাতিক সংগীতের ইতিহাস বাংলায় লেখা। পুরনো গীতকারদের জীবনী রচনা এবং পুরনো বাংলা গানের সংকলন প্রণয়ন।

৪. সংগীত-উন্নয়নী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংগীতবিদ্যালয় স্থাপন করে প্রত্যক্ষ-

ভাবে তরুণ শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদান, বাংলা গানের প্রচার এবং দেশে সংগীতের মান উন্নয়নের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা।

শৌরীন্দ্রমোহন প্রধানত সংগীত বিষয়ে নানা বই লিখে তাঁর নবচেতনার পরিচয় রেখেছিলেন। কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় 'গীত সূত্রসার' লিখে প্রথম যুগান্তকারী সংগীত চেতনার পরিচয় রাখেন। তাঁর নিজব্যয়ে ছাপা 'বঙ্গৈকতান' (ঐকতান বাদ্যের গৎ), **'Hindusthani Airs arranged for the Pianoforte'** এবং 'সংগীতশিক্ষা' বইগুলির পশ্চাৎপটে ছিল পাশ্চাত্য স্বরকে এদেশী গানে গ্রহণ করবার প্রয়াস। তিনিই প্রথম উপলব্ধি করেন: 'খেয়াল ও ধ্রুপদীয় সুরে ঈশ্বর-বিষয়ক ব্যতীত অন্যান্য উত্তমবিষয়ক বাংলা গান নাই বলিলেই হয়; এই আমাদের একটি বৃহৎ অভাব রহিয়াছে। এইজন্য এতদিনেও খেয়াল ধ্রুপদ বাঙালির জাতীয় সঙ্গীত হইতে পারে নাই। হিন্দুস্থানী সঙ্গীত নিরক্ষর লোকের হাতে পড়াতে হিন্দি গীতের ভাবার্থ প্রায়ই লোপ পাইয়াছে; আরও হিন্দি গীতের রচনা প্রায় নিকৃষ্ট; তাহাতে কবিত্ব অতি অল্প, এবং গীতের বর্ণিত বিষয় সকলও শিক্ষিত লোকের রুচির উপযোগী নহে। হিন্দি গান শিক্ষা করিতে ও শুনিতে যে লোকের নীরস বোধ হয়, তাহারও কারণ এই যে কেবল সুরই শুনিতে ও শিক্ষা করিতে হয়; গানের কথার মজা কিছুই পাওয়া যায় না।'

শৌরীন্দ্রমোহন ও কৃষ্ণধন যে বাংলা গান সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করছিলেন তাকে হাতে-কলমে রূপ দেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি আকারমাত্রিক স্বরলিপিকে জনপ্রিয় করেন, সংগীতসমাজ স্থাপন করেন, 'বীণাবাদিনী' ও 'সংগীত প্রকাশিকা' নামে দুটি সংগীত-পত্রিকা সম্পাদন করেন বারো বছর (১৮৯৭-১৯০৯) ধরে। ১৮৯৭ সালে তিনি ১৬৮টি গানের স্বরলিপি সংকলন করে প্রকাশ করেন 'স্বরলিপি-গীতিমালা' নামে। এছাড়া বাংলা সংগীতের ক্রিয়াত্মক দিকে তাঁর দুটি মৌলিকতা উল্লেখযোগ্য। প্রথমত, জ্যোতিরিন্দ্রনাথই বাংলা রঙ্গমঞ্চে সর্বপ্রথম দেশি-বিদেশি সুর সমন্বয়ে অর্কেস্ট্রা সৃষ্টি করেন ১৮৬৭ সালের ৫ জানুয়ারি জোড়া-সাঁকো মঞ্চে 'নবনাটক' অভিনয় উপলক্ষে। তাতে বাজানো হয়েছিল: অর্গান, হারমনিয়াম, বেহালা, পিকলো, ক্ল্যারিওনেট, বড় বাস-বেহালা, করতাল, ঢোল, বাঁয়া-তবলা ও মন্দিরা। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের আরেকটি বড় কাজ ইংরেজি ও আইরিশ মেলডি অবলম্বনে অসামান্য সুর রচনা এবং কিশোর রবীন্দ্রনাথকে গান রচনায় উদ্বুদ্ধ করা। গীতিকার রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবের সঙ্গে জ্যোতিদাদার সহযোগ যেন পূর্বনির্দিষ্ট পরিকল্পনার এক স্পষ্ট ছক।

মনোমোহন বসুর মূল প্রচেষ্টা ছিল বাংলা নাট্যগীতিকে আশ্রয় করে। দেশি যাত্রা-গানের ধারার সঙ্গে বিদেশি অপেরার সংযোগ ঘটিয়ে তিনি যে অভিনব মঞ্চগীতি উদ্ভাবন করেন তারই অনুবর্তনে গিরিশচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, ক্ষীরোদ-প্রসাদ ও দ্বিজেন্দ্রলাল বাংলা নাট্যগীতিকে বৈচিত্র্যমণ্ডিত করেন। প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবের আগে বাংলা গানের দুটি স্পষ্ট ধারা ছিল। একটি দেশাত্মবোধক বাংলা গান এবং আরেকটি বাংলা মঞ্চাশ্রয়ী নাটুকে গান। আত্মোৎঘাটনের চেয়ে তাতে জনমনোরঞ্জনের প্রয়াস প্রধান ছিল।

আমাদের এইটুকু আলোচনায় একটা কথা স্পষ্ট করে বলবার চেষ্টা রয়েছে। কোনো দেশের মৌলিক সংগীতসৃষ্টির সঙ্গে যোগ থাকে যুগ ও সমকালীন মানুষের চাহিদার। একথা নিশ্চিত যে, উনিশ শতকের দ্বিতীয় অর্ধ থেকে খাঁটি বাংলা গানের জন্য একটা বড় রকমের আকুতি ও ব্যাকুলতা দেখা দিয়েছিল। রামমোহনের ধ্রুপদে, আদি ব্রাহ্মসমাজের গায়কদের রচনায়, গিরিশচন্দ্র ইত্যাদির নাট্যগানে সেই আকাঙ্ক্ষার পরিপূর্তি ঘটছিল না। অথচ ওস্তাদ কলাবন্তদের তানসর্বস্ব সুরের কেরামতী বাঙালীর মন ভরাতে পারেনি। নতুন যুগের নবীন গীতকারের আবির্ভাবের জন্য একটা অব্যক্ত যন্ত্রণা সবাই বহন করছিলেন। যিনি গানের ক্ষেত্রে সুরের একাধিপত্য মোচন করে কথার মূল্যকে বুঝবেন, যাঁর রচনায় কথা ও সুরের সংগতি প্রতিষ্ঠা ঘটবে, যাঁর সৃষ্টিতে আবহমান বাংলা গানের এক সুসমঞ্জস বিন্যাস লক্ষ করা যাবে। সবচেয়ে বড় কথা, যাঁর বা যাঁদের গান আধুনিক মানুষের বিচিত্র অন্তর্বেদনা, আনন্দ ও উল্লাসকে রূপ দেবে নৈর্ব্যক্তিক ভাবে। ধর্মনিরপেক্ষ মার্জিতরুচি নান্দনিক বোধসম্পন্ন মেধাবী সংগীতরসিক বাঙালী যে-গান বুঝে নেবে, কণ্ঠে রূপায়িত করবে। অনুষ্ঠানে অথবা ব্যক্তিগত উন্মোচনের তাগিদে যে-গান গাওয়া যায়। যা নিগূঢ়ভাবে নিজের অথচ সকলস্পর্শী।

বলা বাহুল্য, এ সবেরই সার্থক প্রতিফলন ও পূর্ণরূপ আমরা পাই রবীন্দ্রনাথের গানে। দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনীকান্ত ও অতুলপ্রসাদের গানে তারই সম্প্রসারণ বা বৈচিত্র্য, রূপের ও ভাবের অন্যতর বিকাশ ও পরিপূরণ। শৌরীন্দ্রমোহন, কৃষ্ণধন বা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পক্ষে সম্ভব ছিল না এই নবযুগের পক্ষে সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ্য গান রচনা। তবে তাঁরা উজিয়ে দিয়েছিলেন। সংগীতসমাজ, সাংগীতিক মঞ্চ, সংগীত-পত্রিকা ও স্বরলিপি তথা গায়ন ব্যবস্থা না থাকলে রবীন্দ্রনাথ কেমন করে তাঁর বিচিত্র সংগীত সৃষ্টির শতদল মেলতেন? ভারতীয় মার্গসংগীত ও বিলিতি

সুরের চর্চা যদি রবীন্দ্রনাথ যথার্থভাবে করবার সুযোগ না পেতেন তবে কেমন করে তাঁর নিজস্ব গীতরূপটি উন্মোচিত হতো? আদি ব্রাহ্মসমাজের বিষ্ণু এবং ঠাকুরবাড়ির নতুন সংগীত রচনার পুরোধা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁকে গভীর সুরের রসে দীক্ষিত করেন। এইসব অভিজ্ঞতা গ্রহণ-বর্জন করতে করতে এবং নতুন নতুন গীতরূপের ( যেমন, পদ্মাতীরের লোকসংগীত ) সন্ধানী আলোয় রবীন্দ্রনাথ খুঁজে পান তাঁর নিজের পথ। রাধিকা গোঁসাই ও লালচাঁদ বড়ালের অনুবৃত্তির ধারা ছেড়ে তিনি বেছে নেন অভিনব সৃষ্টির পথ। তাতে অনিশ্চয়তা ছিল, ছিল ওস্তাদের রক্তচক্ষুর ভ্রূশাসন, ছিল অভিজাতদের কটাক্ষ। কিন্তু শেষ পর্যন্ত জয় হলো তাঁর অর্থাৎ খাঁটি বাংলা গানের। যা পরাক্রান্তভাবে এই সময় পর্যন্ত অতুলনীয় এবং বিকল্পবিহীন।

এই পর্যন্ত বুঝে নিতে খুব অসুবিধা নেই। কিন্তু এর পরে বোঝা দরকার যে, নতুন যুগের গীতিকার যখন সৃষ্টির পথে রথচক্র চালাবেন তখন বারে বারে তাঁকে দেখতে হবে সঠিক পথ থেকে তিনি ভ্রষ্ট কিনা। তাঁর গান রচনার নবীনতায় যেন গতানুগতিকতার মালিন্য না লাগে। তাঁর গান যেন অন্যদের অব্যক্ত গানকেও জাগিয়ে দেয়। যেন তাঁর গানের বাঙালীয়ানা থেকে ভারতীয়ত্বটুকুও খুঁজে পাওয়া যায়। তার চেয়েও আগে জেনে নিতে হবে গান ব্যাপারটা কী? গানে কথা ও সুরের পরিমাণ কতটা? মার্গসংগীতের সঙ্গে লোকসংগীতের সম্পর্ক কোথায়? গানের সঙ্গে কবিতার সম্পর্ক কতখানি নিগূঢ়?

রবীন্দ্রনাথের সংগীত রচনার ইতিহাস সম্পর্কে যাঁরা জানেন তাঁরা মনে করতে পারবেন একসময়ে 'ভারতী' ও 'সাধনা' পত্রিকার পাতায় তিনি বারবার এসব প্রশ্ন নিজেই তুলেছেন এবং উত্তর খুঁজেছেন। তাঁর সংগীতসৃষ্টি ও সমীক্ষা একই সঙ্গে চলেছিল। এ কাজে তিনি ছিলেন নিঃসঙ্গ। পৃথিবীর কোনো দেশের কোনো বিশিষ্ট সংগীতকারকে এমন করতে হয়নি। ইয়োরোপীয় সংগীতের প্রতিভাধর স্রষ্টারা নিজেদের সৃষ্টি নিয়েই মশগুল থাকতেন। তার অভিনবত্ব কোথায়, স্বদেশীয় সংগীতের সঙ্গে কোনখানে তার যোগ, এসব তাঁদের লিখে বোঝাতে হয়নি। রবীন্দ্রনাথকে যে সংগীতসৃষ্টির পাশাপাশি তার ভাষ্যরচনাও করতে হয়েছিল তার কারণ তাঁর আবির্ভাবকালে এদেশের বেশির ভাগ সংগীত-রসিকের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল বিকৃত অথবা বাংলা গান সম্পর্কে হীনমন্য। তাছাড়া একজন সার্থক কবি কেন গানও লেখেন এই অনুচ্চারিত প্রশ্নটির নিজস্ব সমাধান রবীন্দ্রনাথকেই করতে হয়েছিল। কেননা সব মননশীল স্রষ্টাকেই তার নিজ

সৃষ্টির তাৎপর্যটুকু আত্মবিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে বুঝে নিতে হয়। মনে রাখতে হবে, রবীন্দ্রনাথ খুব অসাধারণ মাপের সংগীতকার। ধূর্জটিপ্রসাদ রবীন্দ্রনাথের সংগীত-সামর্থ্যের মূল্যায়ন করতে গিয়ে খুব স্পষ্ট করে লিখেছেন : The two thousand and more of them could not each be individual. But probably nowhere else in India the number of such songs be more varied. Even European lieders were not so many. Indian classical songs were, generally speaking, about a hundred, of which about fifty were popular.

এবং আরেকটি বিষয়েও ধূর্জটিপ্রসাদ দ্বিধাহীনভাবে স্বীকার করে লিখেছেন যে ভারতবর্ষে তানসেন, বৈজু, গোপাল, সদারঙ্গ প্রমুখ সংগীতকারদের চেয়ে রবীন্দ্রনাথ যে অনেক বড় সেকথা খুব অত্যুক্তি নয়। তাঁর বক্তব্য : The profusion of these songs, their variety, their individuality in spite of their typicality, and the combination of words with melodic forms would mark out any song maker as one of the greatest. To say that he is greater than Tansen, Baizu, Gopal, Sadarang and Adharang and the rest of them is probably not an exaggeration.

এই কথাগুলি যদি সত্য বলে আমরা মানি তবে এ কথা আমরা স্বীকার করতে বাধ্য যে, রবীন্দ্রনাথের সংগীতকার হিসেবে আবির্ভাব খুব একটা আকস্মিক ব্যাপার নয়। তাঁকে এজন্য দীর্ঘ প্রস্তুতি নিতে হয়েছিল। সম্মুখীন হতে হয়েছিল অনেক আত্মজিজ্ঞাসা ও স্ববিরোধিতার। দেশি গানের ঐতিহ্য, মার্গ সংগীতের গুণগত দিক, বিলিতি সুরের বৈচিত্র্য এবং এইসব মিলিয়ে তৈরি করতে হয়েছিল তাঁর নিজস্ব সংগীতবন্ধ। তার প্রচার ও সংরক্ষণের জন্যও তাঁকেই উদ্যোগ নিতে হয়েছিল।

আসলে ১৮৮০ সালে বিলেত থেকে ফেরবার পর আকস্মিকভাবে হারবার্ট স্পেনসারের এক প্রবন্ধ 'The origin and function of music' পাঠ করে রবীন্দ্রনাথের মনে সংগীত সম্পর্কে নবভাবনা জেগে ওঠে। ফলে হৃদয়ভাবকে কত স্বাভাবিক ও সহজভাবে ব্যক্ত করা যায় সংগীতের মাধ্যমে সেইটাই তাঁর অন্বিষ্ট হয়ে ওঠে। এই চিন্তার ক্রিয়াত্মক রূপ ফুটে ওঠে তাঁর 'বাল্মীকি প্রতিভা', 'কাল-মৃগয়া' ও 'মায়ার খেলা' গীতিনাট্যে এবং তার তাত্ত্বিক ভাষ্য রূপ পায় 'সংগীত

ও ভাব' প্রবন্ধে। প্রবন্ধটি তিনি পাঠ করেন ১২৮৮ বঙ্গাব্দের ৮ বৈশাখ বেথুন সোসাইটিতে এবং পরে মুদ্রিত হয় ঐ বছরের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় 'ভারতী' পত্রে। এরপর তিনি ১৩৪২ সাল পর্যন্ত 'ভারতী', 'প্রবাসী' ও 'সবুজপত্র' কাগজে একাদি-ক্রমে সংগীত বিষয়ে তাঁর মতামত ব্যক্ত করেন। সেসব রচনায় সংগীত বিষয়ে তিনি যেসব মৌলিক ভাবনাচিন্তা ব্যক্ত করেছেন বর্তমান আলোচনায় স্থানাভাব-বশত তা বর্জিত হল। তবে আমাদের এমন সিদ্ধান্ত গ্রহণে বাধা নেই যে, রবীন্দ্রনাথ গান রচনার ক্ষেত্রে সচেতন ছিলেন বলে এবং গান রচনা তাঁর পক্ষে অবসর বিনোদনের কৃত্য ছিল না বলেই, বারবার তাঁকে নিবন্ধ লিখে নিজের সৃষ্টির মৌলিকতা বোঝাতে হয়েছে। ইতিমধ্যে তাঁর এই নিরন্তর প্রয়াসে বাংলায় গড়ে ওঠে একদল নতুন সংগীত-শ্রোতা, যাঁরা রবীন্দ্র-রচিত নবসুরের আনন্দে মশগুল হয়ে ওঠেন এবং প্রকারান্তরে তাঁরাই হয়ে ওঠেন রবীন্দ্রসংগীত তথা নতুন বাংলা গানের সমঝদার ও প্রচারক।

ত্রিশের দশকে এই নতুন সমঝদারের দল নানা প্রবন্ধ নিবন্ধ আলোচনা বিতর্ক ও চিঠি চালাচালি করে বাংলা গানের আসর জমজমাট করে তোলেন। সবুজ-পত্র, প্রবাসী, বিচিত্রা, বঙ্গবাণী ও পূর্বাশার পাতা এঁদের নানাজাতীয় সাংগীতিক বিতর্কে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন এঁদের সকলেরই নমস্য ও শিরোধার্য। অতুলপ্রসাদ ছিলেন এঁদের অগ্রজপ্রতিম। এঁদের সব বিতর্কের শেষ রায় দিতে হতো রবীন্দ্রনাথকেই। তাতে তাঁর নিজেরও লাভ হতো। তাঁর সংগীত রচনা নতুন নতুন প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে বিবর্তিত হতো নতুন নতুন পথে। আজ একথা স্পষ্ট যে রবীন্দ্রনাথের শেষ বিশ বছরের সংগীত রচনা সবচেয়ে গভীরতা-সন্ধানী, বিচিত্র রসপূর্ণ এবং কথা ও সুরের সৌষম্যে অদ্বিতীয়।

রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করে নতুন বাংলা গানের ভাবনা বুঝে নিয়ে যাঁরা ত্রিশের দশক থেকে সংগীত-তত্ত্ব নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছেন তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য প্রমথ চৌধুরী, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, অমিয়নাথ সান্যাল ও দিলীপ-কুমার রায়। এঁদের পাশাপাশি গৌণত উল্লেখযোগ্য ইন্দিরা দেবীচৌধুরাণী, সুরেন্দ্র-নাথ ঠাকুর, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রলাল রায় ও বিশ্বপতি চৌধুরীর নাম। এই সব রবীন্দ্রোত্তর সংগীততাত্ত্বিকদের বুদ্ধি ও মেধার একটা স্বতন্ত্র সুনাম ছিল। সংগীতবিদ্যার বাইরে অন্যান্য ব্যাপারেও তাঁরা ছিলেন কৃতবিদ্য। রবীন্দ্রনাথ এঁদের সংস্পর্শে আনন্দ পেতেন এবং এঁদের কারো কারো পত্রোত্তরে অসামান্য সব সাংগীতিক মতামত ব্যক্ত করে গেছেন। আজ বিশেষভাবে এইসব রবীন্দ্র-

পরবর্তী সংগীততাত্ত্বিকদের মতামতের সার নিষ্কাশন করা দরকার। তার থেকে জানা যাবে :

১. বিশ শতকের গোড়ায় বাঙালী বুদ্ধিজীবী বাংলা গানকে কোন দৃষ্টিতে দেখতেন।

২. তাঁদের কাছে হিন্দুস্থানী গান ও বাংলা গানের আবেদনে কতটা তর-তম ছিল।

৩. তাঁদের নিজেদের সংগীত-অভিজ্ঞতা কতটা ছিল।

৪. রবীন্দ্রনাথের সংগীত-ভাবনা তাঁদের কী পরিমাণে প্রভাবিত করেছিল।

৫. বাংলা গানের ভবিষ্যৎ বিকাশ সম্পর্কে তাঁরা কী ভেবেছিলেন।

প্রমথ চৌধুরী, ধূর্জটিপ্রসাদ, অমিয়নাথ সান্যাল ও দিলীপকুমার রায়ের জীবন-পটভূমি ও সংগীত বিষয়ে অভিজ্ঞতা ছিল আলাদা আলাদা। এঁদের মধ্যে প্রমথ চৌধুরী ছিলেন বহুবিদ্যাবিদ্ রসিক। 'সবুজপত্রে'র সম্পাদকরূপে তিনি বাংলা সাহিত্য ও চিন্তাক্ষেত্রে একটি স্পষ্ট নতুন পথ নিতে চেয়েছিলেন। নিজেও ছিলেন মৌলিক গল্পকার, কবি ও প্রাবন্ধিক। ধূর্জটিপ্রসাদ প্রধানত প্রবাসী অধ্যাপক। তাঁর আলোচনা ও অভিজ্ঞতার পরিধি ছিল বহুবিস্তৃত। মুখ্যত অর্থনীতিবিদ্ ও সমাজতাত্ত্বিক হলেও তাঁর প্রধান প্রেম ছিল সংগীতে। মৌলিক অন্তঃশীল ভাবনা-প্রবাহী উপন্যাস রচনায় তিনি অগ্রণী। অমিয়নাথ সান্যাল বৃত্তিতে ছিলেন চিকিৎসক, কিন্তু সংগীত শোনার অভিজ্ঞতায় ও তার মূল্যায়নে নিরন্ত আগ্রহী। প্রাচীন ভারতের সংগীতচিন্তা বিষয়ে তাঁর শাস্ত্রজ্ঞান ছিল মৌলিক। ভারতীয় রাগরাগিণীর বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে তাঁর স্বীকৃতি ছিল আন্তর্জাতিক স্তরের। স্মৃতির অতল থেকে উদ্ধৃত অবিনশ্বর তাঁর কলাবন্ত-স্মৃতি মৌলিক রচনার আস্বাদবহ। দিলীপকুমার মুখ্যত গায়ক ও কম্পোজার। বহুভাষাবিদ্ ও অনুবাদক। একসময়ে তিনি সারাভারতে ভ্রাম্যমাণ ছিলেন খাঁটি হিন্দুস্থানী গানের প্রাণরস খুঁজতে। দেশ-বিদেশে গান গাওয়ার অভিজ্ঞতা ও বিখ্যাত মানুষদের সঙ্গে আলাপ ছিল তাঁর নেশা। কবি ও ঔপন্যাসিক রূপেও তাঁর খ্যাতি ছিল।

দেখা গেল, রবীন্দ্র-পরবর্তী কালের চারজন প্রধান সংগীত-তাত্ত্বিকই খুব যোগ্য ব্যক্তি এবং সংগীত আলোচনার বাইরেও যশস্বী। তবে সংগীত তাঁদের অন্যতর রচনাকে ও চিন্তাভাবনাকে অনেক ক্ষেত্রে নতুন পথ দেখিয়েছে। আমাদের বর্তমান আলোচনায় আমরা আলাদাভাবে দেখতে চাই প্রায়-সমকালীন এই চার বাঙালী বাংলা ও ভারতীয় সংগীতকে কী চোখে দেখতে চেয়েছেন, তাঁদের সংগীত-

ভাষ্যের নতুনত্বই বা কোনখানে। সেই সূত্রে উন্মোচিত হবে বিশ শতকের বাংলার সাংগীতিক চিন্তানায়কদের বীক্ষণকোণ, যা আজ পর্যন্ত আলোচনা হয়নি।

**প্রমথ চৌধুরী ১৮৬৮-১৯৪৬**

'আমি ছেলেবেলা থেকেই সঙ্গীতপ্রিয় ছিলুম'—প্রমথ চৌধুরীর 'আত্মকথা'য় এই মন্তব্য এক গুরুত্বপূর্ণ স্ববিরোধ সৃষ্টি করে, কারণ এর পাশাপাশি মন্তব্য হচ্ছে 'আমি গানবাজনার আবহাওয়ার ভিতর মানুষ হইনি' এবং 'আমাদের পরিবার সঙ্গীতছুট'। অর্থাৎ যদিও তিনি পারিবারিক কোনো সংগীত-উত্তরাধিকার বা আবহাওয়া পাননি তবু তাঁর স্বাভাবিক সংগীতরসিক মন সমকালীন পরিবেশ ও দেশকাল থেকে অভিজ্ঞতা আহরণ করেছিল। পৈতৃক ভদ্রাসন পাবনার হরিপুর এবং শৈশবের লীলাভূমি যশোহরে তাঁর কোনো সংগীত-অভিজ্ঞতা হয়নি। 'আমি কৃষ্ণনগরে এসে মায়ের কাছে দু-চারটি সেতারেব বোল শুনেছি। আমার মাতুল পরিবারে সঙ্গীতের চর্চা ছিল, তাই আমার মায়ের গানের গলাও ছিল—কানও ছিল।...আমি যে মধ্যে মধ্যে সঙ্গীত সম্বন্ধে বাচালতা করি, তার কারণও সঙ্গীতের প্রতি আমার আবাল্য অনুরাগ।' তিনি প্রথম ভালো গান শোনেন কৃষ্ণনগর এসে কৈশোরকালে। সেখানে এক আত্মীয়ের মুখে আদি ব্রাহ্মসমাজের কতকগুলি গান শোনেন। এই কৈশোরেই তাঁর সাংগীতিক অনুভূতি কেমন অন্তর্মুখী ছিল আর নজির পাই পূরবী সুরের একটি গান শোনার বিবরণে: 'এ গানটি আমার সে-বয়সেও ভাল লাগেনি; অত্যন্ত depressing মনে হয়েছিল। আজ পর্যন্ত পূরবী শুনলে আমার মন খারাপ হয়ে যায়।' ওখানে এক সহপাঠীর মুখে একটি হাম্বীর, একটি বাগেশ্রী ও একটি সোহিনী শোনেন। তখনকার দিনের যাত্রার গান ও বিদ্যাসুন্দরের টপ্পাও শোনেন এবং 'তার নকল করতে গিয়ে আমি আবিষ্কার করি যে, আমার গলায়ও মিহি তান আছে'।

> বাড়ীতে একটি টেব্‌ল্‌-হারমোনিয়ম ছিল। দাদা সেটি বাজিয়ে গান গাইতেন। তার একটি গানের প্রথম লাইন আমার মনে আছে:
> ও পাড়াতে দুধ যোগাতে যাইগো আমার বেলা হল।
> তারপর যখন একটি পিয়ানো এল, তখন দিদি এক মিশনারী মেমের কাছে পিয়ানো শিক্ষা সুরু করলেন। তিনি Raindrops Patter-নামক একটি বিলিতী-সুর এক আঙুল দিয়ে বাজাবার চেষ্টা করতেন।
> এইসময় নেত্য বলে এক বৃদ্ধা টপওয়ালী মধ্যে মধ্যে মার কাছে এসে

তাঁকে গান শোনাত। কি ভরাট তার গলা! সে গাইত ভারি ভারি রাগ।

সাড়ে তেরো বছরে কলকাতায় পড়তে এসে প্রমথ চৌধুরী আবিষ্কার করে আশ্চর্য হলেন যে, 'কলকাতার ভদ্রসন্তানরা একদম সঙ্গীতছুট'। হেয়ার স্কুলে এক ছোকরার মুখে শোনেন ইটালিয়ান ঝিঁঝিটে 'প্রেমের কথা আর বোলো না আর তুলো না'। অবশ্য তার মধ্যে ঝিঝিট খুঁজে পেলেন না। তখনকার কলকাতার সর্বত্র প্রচারিত 'আয়লো অলি কুসুম তুলি' গানের কথা ও সুর তাঁর 'কানে ঝাঁটা মারত'।

'আমি অল্প বয়স থেকেই গান গাইতুম। আমার কণ্ঠস্বর ছিল musical। এই কারণে, কানে যে সুর আসতো, গলায় তা বদলি হত' বলেছেন তিনি। কলকাতার ছাত্রজীবনে অনেক গানের আসরে যেতেন প্রমথ চৌধুরী। সঙ্গী থাকতেন গোবরডাঙ্গার সুরবাহারী জ্ঞানদা মুখার্জি। পরিচয় হয় লালচাঁদ বড়ালের সঙ্গে। 'তাঁর কণ্ঠস্বর ছিল বেজায় হেঁড়ে আর গাইতেন বেশির ভাগ রামমোহনের রচিত গান।' লালচাঁদের সঙ্গে যান মহেন্দ্র চাটুজ্যের হারমোনিয়াম শুনতে। সেখানে শোনেন ছোট দুঁদি খাঁর গান। আরেকবার যান প্রমথ বাঁড়ুজ্যের বেহালা শুনতে। তখনো রবীন্দ্রনাথের গান শোনেননি তিনি। ইতিমধ্যে তিনবছর কলকাতায় থেকে আবার ফিরে যান কৃষ্ণনগরে। সেখানে সত্য লাহিড়ির মুখে শোনেন বাংলা কানাড়া। শশী কামারের গান শোনেন। 'সে সব গান খেয়াল নয়; অল্প ধ্রুপদ আর বেশির ভাগ টপ্পা ও ঠুংরি।' আর শোনেন বদ্রি সুকুলের সেতার।

এর বছর খানেক পরে রবীন্দ্রনাথ কয়েকদিনের জন্য কৃষ্ণনগরে আসেন তাঁদের বাড়ি। সেখানেই তিনি প্রথম রবীন্দ্রনাথের গান শোনেন। 'গলা ছিল তাঁর আশ্চর্য। অথচ তাঁর গান একেবারে তানবর্জিত। আমার হিন্দী-গানে অভ্যস্ত কানে তাঁর গান যেন কেমন-কেমন লাগল।' এছাড়াও তাঁর মনে হয়েছে—'রবীন্দ্রনাথের অল্প বয়সের গান অধিকাংশই পিলু বারোয়াঁ জাতের ছিল, এবং তার তাল ছিল বিলম্বিত নয়—নাচুনে।' রবীন্দ্রনাথ মাঝে মাঝে তাঁর ভাইঝি প্রতিভাকে নিয়ে আসতেন। 'তার তুল্য গান গাইতে আমি আর কাউকে কখনো শুনিনি।'

আবার কলকাতা বাস শুরু হল। আদি ব্রাহ্মসমাজে তখন গান শেখাতেন বিষ্ণু। 'তাঁর গানে তানের বাহুল্য ছিল না।' প্রমথ চৌধুরী প্রসঙ্গত বলেছেন:

'রবীন্দ্রনাথকে আমি কখনও যন্ত্র বাজাতে দেখিনি।' এই সময় তিনি লালচাঁদের সঙ্গে এক ওস্তাদের কাছে গান শিখতে যান। তার কাছে শেখেন একটি মাত্র ইমন-কল্যাণ। 'আমার রীতিমত সঙ্গীত-শিক্ষা ঐ পর্যন্ত।' ইতিমধ্যে রবীন্দ্রনাথের ভাইঝি প্রতিভার সঙ্গে তাঁর দাদার বিবাহ হয়। প্রতিভা দেবী ছিলেন 'হাফ-ওস্তাদ এবং নিত্য গান অভ্যাস করতেন। তিনি পিয়ানোয় বাজাতেন ওস্তাদী বিলাতী বাজনা।' তাঁর কাছে বেতোফেনের ফিউনারাল মারচ ও মুনলাইট সোনাটা শোনেন বহুবার এবং 'Wagner-এর Valkyrie-র Overture শুনে মনে হলো যেন অন্য এক লোকে চলে গেছি। তাই থেকে আমার বিলিতী গানবাজনার উপর যে-অশ্রদ্ধা ছিল, তা কমে যায়।' পরে মনে হয়েছে, 'য়ুরোপীয় যন্ত্রসঙ্গীতের ভিতরকার কথা হচ্ছে ধ্বনির পরিমাণ বাড়ানো; অপরপক্ষে আমাদের দেশের সঙ্গীতের উদ্দেশ্য ধ্বনিকে মৃদু থেকে মৃদুতর করা। এককথায়, য়ুরোপীয় সঙ্গীতের অর্থ হচ্ছে স্বরের multiplication আর আমাদের হচ্ছে division।'

এম. এ. পাস করবার পরে বিশ্বনাথ নামে হিন্দুস্থানী ওস্তাদের কাছে প্রমথ চৌধুরী কিছুদিন গান শেখেন। একটি কেদারা ও একটি ইমন-কল্যাণ শিখে সে পর্যায়ের গান শেখা সাঙ্গ হয়। ১৮৯৩ সালে তিনি বিলাত যান। তিন বছর পরে ফিরে আসেন ও ইন্দিরা দেবীকে বিবাহ করেন। এবারে রবীন্দ্রনাথের নব-পর্যায়ের গান তাঁর ভালো লাগে। 'কারণ বুঝতে পারি যে, সে-সব গানের সুর ক্লাসিকাল রাগ-রাগিণী থেকেই উদ্ভূত। এবং তার ২।৪টি গান আমি নিজেও গাইতে পারতুম—যথা 'আহা জাগি পোহালো বিভাবরী' (ভৈরো), ও 'তুমি যেয়ো না এখনি' (ভৈরবী)। তারপর বর্ষামঙ্গলের কয়েকটি গান, যথা 'বাদলমেঘে মাদল বাজে', 'তিমির অবগুণ্ঠনে', 'যেতে যেতে একলা পথে'—এগুলি আমার অত্যন্ত প্রিয় হয়ে ওঠে।'

প্রমথ চৌধুরীর সংগীত-জীবন থেকে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতা পরবর্তী কালে তাঁর সংগীত সমীক্ষা ও নতুন বাংলা গানের মূল্যায়নে কাজে লেগেছিল। 'সবুজপত্র'কে তিনি নিয়োজিত করলেন সংগীতের বিতর্কভূমিরূপে। সেখানেই প্রকাশিত হয় রবীন্দ্রনাথের যুগান্তকারী প্রবন্ধ 'সংগীতের মুক্তি' (ভাদ্র ১৩২৪)। তাঁর বিশ্বাস ছিল: 'সংগীত বিদ্যা লাভ করতে হলে, প্রাক্তন সংস্কার এবং শিক্ষা দুই চাই। এ ক্ষেত্রে প্রথমত. অধিকারী ভেদ আছে, দ্বিতীয়তঃ technique-এর যথেষ্ট সার্থকতা আছে! সংগীত বিদ্যায় অশিক্ষিত পটুত্ব বলে কোনো জিনিস নেই।'

অন্যত্র তিনি বলেছেন—'যিনি জীবনে দু ছত্র কবিতা রচনা করতে পারেননি

কিম্বা করেননি, তিনি কাব্যের শ্রেষ্ঠ সমালোচক হলেও হতে পারেন—কিন্তু যিনি সপ্তস্বরকে কখনও হাতে কিম্বা গলায় আয়ত্ত করতে চেষ্টা করেননি, তিনি সঙ্গীতের সমালোচক হতে পারেন না। কেননা সঙ্গীতশিক্ষা প্রয়োগসাপেক্ষ।'

প্রমথ চৌধুরী তাঁর সংগীত-অভিজ্ঞতা চমৎকারভাবে কাজে লাগিয়েছিলেন তাঁর গল্পে। তাঁর কাহিনীতে অনেক গায়ক-গায়িকা আছে যাদের মুখে তিনি বহু বিখ্যাত হিন্দুস্থানী গান বসিয়েছিলেন। সেই গানগুলি হল: ১. গৌরী তু নে নয়ন লাগাওয়ে জাদু ডারা, ২. নৈয়া ঝাঁঝড়া, ৩. প্রভু অবগুনে চিতে না ধর, ৪. সাহেব আল্লা রহিম করিম, ৫. হাস হাসকে ঘুমট খোলে লালবনা, ৬. গোরে গোরে মুখপর সোহে, ৭. চমেলি ফুলি চম্পা। এসব গান তাঁর গীত-অভিজ্ঞতার ঝুলি থেকেই বেরিয়েছিল। আরেক গল্পে একটি চরিত্রের বর্ণনা প্রসঙ্গে লিখেছেন: 'তিনি শ্যামা পাখিকে ছোট এলাচের দানা ঘিয়ে ভেজে নিজ হাতে খাওয়াতেন। এলাচ খেলে নাকি শ্যামার গানের লজ্জৎ বাড়ে।' এ তো গানেব জগতে একেবারে খানদানী সহবতের চিহ্ন!

এবারে উল্লেখ করা যায় তাঁর গল্পের থেকে কয়েকটি বর্ণনা, যাতে মেলে তাঁর সংগীত-রসিক মনের অপূর্ব স্বাক্ষর।

> ১. তার গলার স্বরে আমার বুকের ভিতর কি-যেন ঈষৎ কেঁপে উঠল, কেননা সে আওয়াজ বাঁশির নয়, তারের যন্ত্রের। তাতে জোয়ারি ছিল।
>
> ২. আমার সঙ্গিনী অমনি দাবার ঘরটি উল্টে ফেলে খিল খিল করে হেসে উঠলেন। মনে হল পিয়ানোর সব চাইতে উঁচু সপ্তকের উপর কে যেন অতি হালকা ভাবে আঙুল বুলিয়ে গেল।
>
> ৩. আমার মনের এই কড়িকোমল পর্দাগুলির উপর সে তার আঙুল চালিয়ে যখন যেমন ইচ্ছে তখন তেমনি সুর বার করতে পারত। তার আঙুলের টিপে সে সুর কখনও বা অতিকোমল, কখনও বা অতিতীয়র হত।
>
> ৪. উজ্জ্বল নীলমণি তাঁর মিহি মেয়েলি গলা তারায় চড়িয়ে বক্তৃতা শুরু করলেন। 'পিকোলো'-র আওয়াজ যেমন ব্যাণ্ডের গোলমালকে ছাড়িয়ে ওঠে তাঁর আওয়াজও এই হৈ-চৈ-এর উপরে উঠে গেল।
>
> ৫. ঘোষাল বললেন, আমি গানবাজনার সায়েন্স জানিনে। জানি শুধু আর্ট, আর আমার বিশ্বাস এক্ষেত্রে সায়েন্স আর্ট থেকে বেরিয়েছে—আর্ট সায়েন্স থেকে বেরোয়নি।

৬. আমরা যাকে খেয়াল বলি, তা শুনলে সে কানে হাত দিত। ও ঢংয়ের গানের নাকি গা নেই, আছে শুধু গহনা।

বোঝা যায়, এসব বর্ণনা ও মন্তব্যের নেপথ্যে, শিখণ্ডীর আড়ালে ধানুকীর মতো, প্রমথ চৌধুরীর সংগীত-বিষয়ক মৌলিক মতামত ও তির্যক বাক্যবন্ধ রয়ে গেছে নিগূঢ়ভাবে।

প্রমথ চৌধুরীর সংগীত-চেতনার কয়েকটি স্বতন্ত্র লক্ষণ আগে বলে নেওয়া দরকার। 'আত্মকথা'য় তাঁর স্বীকারোক্তি: 'ঘনিষ্ঠতার ফলে ঠাকুর পরিবারের ঐকান্তিক সংগীত চর্চার প্রভাব থেকে আমি মুক্ত ছিলুম না'—অত্যন্ত সত্য। সংগীত বিষয়ে ঠাকুরবাড়ির পরিশীলিত বোধ ও রুচি, রবীন্দ্রনাথের সাহচর্য ও নির্দেশ এবং সহধর্মিণী ইন্দিরার সঙ্গে সাংগীতিক অভিজ্ঞতার বিনিময় তাঁর সার্বিক সংগীতচেতনাকে সমৃদ্ধ ও নিয়ন্ত্রিত করেছিল। এছাড়া তাঁর সংগীত-চেতনার আরেকটি লক্ষণ হল অন্যান্য মনস্বী লেখককে সংগীত-বিষয়ক রচনা ও বির্তকে উদ্বুদ্ধ করা এবং সেই সূত্রে নিজেও লেখা। সবুজপত্র কাগজে তিনি রবীন্দ্রনাথ ছাড়া ধূর্জটিপ্রসাদ, সুরেশ চক্রবর্তী, দিলীপকুমার, বিশ্বপতি চৌধুরী ও ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীকে বাংলা সংগীত বিষয়ে বির্তকে বিজড়িত করেন। এই প্রসঙ্গে সবুজপত্রে ও অন্যত্র প্রকাশিত তাঁর গান সম্বন্ধে রচনাবলির তালিকা লক্ষণীয়:

> 'দ্বিজেন্দ্রলালের স্মৃতিসভায় কথিত,' জ্যৈষ্ঠ ১৩২২; 'দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের হাসির গান,' আষাঢ় ১৩২৩; 'হিন্দুসংগীত,' কার্তিক ১৩২৩ 'সুরের কথা,' পৌষ ১৩২৩, 'কথা ও সুর,' শ্রাবণ ১৩২৪; 'ভারতচন্দ্র—সংগীত পণ্ডিত,' চিত্রাবলী, ১৩৪২; 'পূর্বস্মৃতি,' গীতবিতান বার্ষিকী, ১৩৫০; 'কথা ও সুর,' পূর্বাশা, আশ্বিন ১৩৪৪।

তাঁর সংগীত সংক্রান্ত রচনার সবচেয়ে প্রধান বৈশিষ্ট্য হল চিন্তার স্বচ্ছতা এবং অনবদ্য গদ্যের বুদ্ধিদীপ্ত শৈলী। বাংলা সংগীত সংক্রান্ত রচনায় এমন প্রসাদগুণ এমনকি রবীন্দ্রনাথের লেখাতেও নেই। দু'য়েকটি উপভোগ্য উৎকলন অনেকের ভালো লাগবে। যেমন:

> ১. আপনারা দেশি-বিলেতি সংগীত নিয়ে যে বাদানুবাদের সৃষ্টি করেছেন, সে গোলযোগে আমি গলা যোগ করতে চাই। এ বিষয়ে বক্তৃতা করতে পারেন এক তিনি যিনি সংগীতবিদ্যার পারদর্শী, আর এক তিনি যিনি সংগীতশাস্ত্রের সারদর্শী; অর্থাৎ যিনি সংগীত সম্বন্ধে হয় সর্বজ্ঞ, নয় সর্বাজ্ঞ।

২. দেশি-বিলেতি সংগীতের মধ্যে স্পষ্ট প্রভেদ আছে। বিলেতি সংগীতে হারমনি আছে, আমাদের নেই। এই হারমনি-জিনিসটে স্বরের যুক্তাক্ষর বই আর কিছুই নয়, অর্থাৎ ও-বস্তু হচ্ছে সংগীতের বর্ণপরিচয়ের দ্বিতীয় ভাগের অধিকারে। আমাদের সংগীত এখনও প্রথম ভাগের দখলেই আছে। আমাদের পক্ষে সংগীতের দ্বিতীয় ভাগের চর্চা করা উচিত কিনা, সে বিষয়ে কেউ মনস্থির করতে পারেননি। অনেকে ভয় পান যে, দ্বিতীয় ভাগ ধরলে তাঁরা প্রথম ভাগ ভুলে যাবেন।

৩. গানের সৃষ্টি বোবায় করেছে এ কথা বলাও যা—আর নাচের সৃষ্টি ঘোড়ায় করেছে, এ কথা বলাও তাই।

৪. ভৈরবীতে কড়ি মধ্যম লাগালে রাগ বজায় থাকে কিনা, এ তর্কের অবশ্য কোনও অর্থ নেই। কড়ি মধ্যমের স্পর্শে যদি ভৈরবীর ভৈরবীত্ব নষ্ট হয়, তাহলে তাকে না হয় 'কৈরবী'ই বলা গেল—তাতে সে সুর অসুর হয়ে ওঠে না।

এসব আপাত-লঘু বৈঠকি ঢঙের আলাপচারির অন্তরালে রয়ে গেছে প্রমথ চৌধুরীর সংগীতবোধের গভীর ইঙ্গিত। সহজ ভাষায় জটিল বিষয়ের বর্ণন যে-কোনো লেখকের পক্ষে শ্লাঘনীয় গুণ। আর এই জাতীয় সিদ্ধান্তমূলক মন্তব্য করতে যে কঠিন সাংগীতিক প্রজ্ঞা লাগে তা বলে বোঝানো যায় না। বাংলা সংগীত সমালোচনায় প্রমথ চৌধুরী যে রবীন্দ্ররীতির প্রথম সার্থক উত্তরসূরি তাতে সন্দেহ নেই।

কিন্তু সংগীতের নানা বিতর্কিত প্রসঙ্গে তাঁর মতামত কী ছিল, সে আলোচনা না করলে তাঁর সংগীত সম্পর্কে বিশিষ্ট দৃষ্টিকোণ ও সংস্কারটি স্পষ্ট হবে না।

প্রথমেই দেখা যায়, প্রমথ চৌধুরী ভারতীয় মার্গসংগীতে উৎসাহী ছিলেন। তাঁর 'হিন্দুসংগীত' নামক শীর্ণ বইটিতে তিনি বারবার মার্গসংগীতের জয়কার দিয়েছেন। তাঁর সিদ্ধান্ত মার্গসংগীত এককালে ছিল দেশি সংগীত। 'এ সংগীতে ভারতবর্ষের কোনও প্রাচীন দেশীসংগীতের একটি বিশেষ ধারা পূর্ণ পরিণতি লাভ করেছে। প্রাকৃতের হিসাবে সংস্কৃতের যে স্থান, দেশীসংগীতের হিসাবে মার্গসংগীতেরও সেই স্থান।' এরপর আমাদের বর্তমান প্রচলিত দেশীসংগীত বিষয়ে তাঁর ধারণা : 'কালক্রমে আমাদের এই দেশীসংগীত হয়ত এক অপূর্ব মার্গ-সংগীতে পরিণত হবে।' সেইসঙ্গে তিনি লক্ষ করেন : 'আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের দেশে সংগীতশিক্ষার পুরো ঝোঁকটা পুনরাবৃত্তির উপরেই পড়েছে।'

বিশ শতকের তিনের দশকে বাংলার সংগীতক্ষেত্রে একটি প্রধান বিতর্ক সৃষ্টি হয় গানে কথা ও সুরের পারস্পরিক ভূমিকা ও মাত্রা নিয়ে। এ ব্যাপারে প্রমথ চৌধুরী কয়েকটি স্পষ্ট মন্তব্য করেছেন। যেমন : 'সুর বাদ দিয়ে গানের কথায় যা অবশিষ্ট থাকে তা অনেকস্থলে না থাকারই সামিল।' আরেক লেখায় বলেছেন : 'কথায় রস…উপভোগ করার অর্থ, তার ধর্ম অনুভব করা। ঐ রসের সন্ধান একমাত্র অভিধানের মধ্যে পাওয়া যায় ; অপরপক্ষে আমার মতে সঙ্গীতের ব্যাকরণ আছে কিন্তু অভিধান নেই।' আসলে হিন্দুস্থানী সংগীতে অভ্যস্ত তাঁর কান এবং রবীন্দ্রসংগীতে মুগ্ধ তাঁর মন কথা ও সুরের মধ্যে সখ্য খুঁজতে চেয়েছে। তাই তাঁর মনে হয়েছে : 'কাব্য যত মহান হয়, ততই তা রাগ-রাগিণী নিরপেক্ষ হয়ে ওঠে।…সুর যে পরিমাণে কথা থেকে পৃথক হয়, সেই পরিমাণে তা সঙ্গীত হয়ে ওঠে, এবং কথা যে পরিমাণে সুর থেকে পৃথক হয়, সেই পরিমাণে তা ভাষা হয়ে ওঠে।'

দ্বিজেন্দ্রলালের গান সম্পর্কে প্রথম মৌলিক আলোচনার গৌরব সম্ভবত প্রমথ চৌধুরীর প্রাপ্য। গান সম্পর্কে তাঁর অন্তর্দৃষ্টি কতখানি গভীর ও ইঙ্গিতবাহী ছিল তার প্রমাণ নিম্নোদ্ধৃত বিশ্লেষণে :

> আমার দৃঢ় ধারণা এই যে দ্বিজেন্দ্রলাল আগে কবিতা রচনা করে পরে তাতে সুর বসাতেন না, কিন্তু আগে তাঁর মনে একটি সুর আসত তারপরে কথা সেই সুরকে অনুসরণ করত। এ রকম মনে করবার কারণ এই যে, যে কথা সুরে বসে না সে কথায় তাঁর প্রতিভা পূর্ণ বিকশিত হয়ে ওঠে নি। দ্বিজেন্দ্রলালের মনের প্রকৃতির একটি উদ্দাম ভাব ছিল, সুতরাং তাঁর মনোভাব যদি সংগীতের কঠিন বন্ধনের মধ্যে ধরা না পড়ত তা হলে তাঁর রচনা আর্ট হত কিনা সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে।

হিন্দুস্থানী গান ও বাংলা গানের ব্যাপারে তাঁর ধারণা খুব স্বচ্ছ এবং সংগীতের ক্ষেত্রে যে কোনো নিরীক্ষা ও মিশ্রণ তাঁর উদার মনের সায় পেত। নিরপেক্ষ রস-দৃষ্টিতে তাঁর মনে হয়েছে :

> দ্বিজেন্দ্রলাল অবশ্য একটি নতুন ঢঙের সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু তাতে করে হিন্দু-সংগীতের ধর্ম নষ্ট হয় নি—কেন না ওস্তাদি ঢং ভারতবর্ষীয় সংগীতের একমাত্র ঢং নয়।…কিন্তু বাঙালীর যা সম্পূর্ণ নিজস্ব বস্তু কীর্তন—তাতে রাগরাগিণীর এতটা রূপান্তরিত করা হয়েছে যে, সে গান শুনে অনেক ওস্তাদ কানে হাত দেন। কিন্তু ওস্তাদেরা স্বীকার না

করলেও আমরা স্বীকার করতে বাধ্য যে, বাঙ্গলার কীর্তন হিন্দুসংগীত। সুতরাং দ্বিজেন্দ্রলাল আমাদের রাগরাগিণীর উপর হস্তক্ষেপ করায় তাঁর অহিন্দুত্বের পরিচয় দেন নি—পরিচয় দিয়েছেন শুধু তাঁর বাঙালীত্বের।

আশ্চর্য যে, প্রমথ চৌধুরী তাঁরা কোনো সংগীত-আলোচনায় অতুলপ্রসাদ ও রজনীকান্তের নামোচ্চারণ করেননি। কিন্তু বাংলা গান, তার নিজস্ব শক্তি ও স্বাতন্ত্র্য বিষয়ে তাঁর অহংকার কোথাও গোপন রাখেননি। এক কথায় তাঁর সংগীত বীক্ষণের ভঙ্গিটি ছিল রসিকের এবং তাঁর সাহিত্য ও শিল্প আলোচনার মতো সংগীত সমীক্ষার ধারাটিও ছিল স্বচ্ছ, সরস, গোঁড়ামিহীন, গভীর ওসংরক্ত।

সংগীত-সমালোচক হিসাবে ধূর্জটিপ্রসাদের মতামত খুব ঋজু, একমুখী ও কোনো আপস-চেষ্টা-বিহীন। সংগীতের রসোপভোগ ব্যাপারটিকে তিনি সর্বজনগ্রাহ্য বলেও মনে করেন না। তাঁর মতে সংগীত এক মহৎ চিত্তবৃত্তির উৎসার, যা বহু সাধনালব্ধ এবং তার সমালোচনা করাটাও যার-তার কর্ম নয়। তিনি পরিষ্কার বলেছেন: 'সঙ্গীত আলোচনা টেকনিক্যাল হলেই সঙ্গীতের উন্নতি হয়, প্রসার অবশ্য না ও হতে পারে।' তিনি মনে রেখেছেন: 'সাঙ্গীতিক বুদ্ধি আর লেখা-পড়ার বুদ্ধি এক নয।' তিনি বিশ্বাস করতেন সংগীতের ক্ষেত্রে 'পরীক্ষালব্ধ সিদ্ধান্ত দ্বারাই সমালোচনা সম্ভব'। তার বারবার মনে হয়েছিল, 'বাঙলা সাহিত্যে সমালোচনার ইতিহাস থাকলেও, সুর-সমালোচনার ইতিহাস নেই' এবং 'সঙ্গীত এখনও সাহিত্যের মতন সাধারণের ভোগ্য হয়নি—এখনও দরবারী চীজ হয়েই আছে, এখনও পেশাদারের মধ্যে, একটি trade union-এর মধ্যে আবদ্ধ রয়েছে, যেখানে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের প্রবেশ নিষেধ'। এইসব ধারণা তাঁর মাথায় ছিল বলেই তিনি সংগীত-সমালোচক হয়েছিলেন এবং তার জন্য সুদীর্ঘ প্রস্তুতি ও গান শোনার অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন। তাঁর পক্ষে ব্যাপারটা ছিল আদর্শঘটিত। যেন একটা আচলায়তন ভাঙতে চেয়েছিলেন। সেইজন্য তাঁর রচনায় সংবেদন-শীতলতার সঙ্গে একরকম তত্ত্বদর্শিতা আছে যা আত্মজিজ্ঞাসার নামান্তর। অ্যামেচারের আমগ্ন উপভোগ তাঁর পছন্দ ছিল না, তিনি প্রতি পদে বিশ্লেষণে বিশ্বাসী ছিলেন। সেইজন্যই তাঁর সংগীত আলোচনায় বাচনিক সরসতা বিরল অথচ ঝকঝকে বুদ্ধির শাণিত দীপ্তি বারবার চমৎকৃত করে। সংগীত ছাড়া

অন্যান্য বিষয়ে তাঁর ব্যুৎপত্তি ও উপলব্ধি অনেক সময় তিনি সংগীতবিচারে কাজে লাগিয়েছেন এবং নতুন সিদ্ধান্ত খুঁজে পেয়েছেন বহু ক্ষেত্রে। একটা উদাহরণ দিই। রবীন্দ্রসংগীত সম্বন্ধে তাঁর একটি সিদ্ধান্ত এই চিন্তা-পরম্পরায় এসেছে যে,

> একসময়ে অবশ্য ছিল, যখন রবীন্দ্রনাথ হিন্দুস্থানী সুরের ছকে গান বসাতেন। যখন থেকে দেশী সঙ্গীত, অর্থাৎ বাউল, কীর্তন, ভাটিয়ালের স্রোত তাঁর প্রতিভাকে অনুপ্রাণিত করলে তখনই তিনি নিজের সন্ধান পেলেন, স্বাধীন হলেন। এতদিন হচ্ছিল অনুকরণ, হাতে খড়ি, এখন শুরু হল সৃষ্টি। এই বোধহয় জীবনের রীতি। দেশের সন্ধান, দরবার ও নগরের বাইরের মাটির ও গ্রামের সন্ধান, শূদ্র ও যবনের সন্ধান যখন পাওয়া যায়, তখনই মানুষ, জাতি, সভ্যতা নবজীবন লাভ করে। মাটির সন্ধান পেয়েছেন বলে রবিবাবু সঙ্গীতকে নবজীবন দিতে পেরেছেন।

এই বিশ্লেষণে সংগীত-সমীক্ষায় তাঁকে আলোকরেখা দেখিয়েছে সমাজবিজ্ঞান ও ইতিহাস। তাঁর রচনা এইভাবেই বারবার নানা বিদ্যার আলোকসম্পাতে দীপ্ত হয়েছে এবং আমরা লাভ করেছি এক প্রজ্ঞাবান রসিক সংগীত সমালোচককে। দিলীপকুমার তাঁর সম্পর্কে লিখেছেন, 'বুদ্ধিতে ক্ষুরধার, আলাপে রসাল, ব্যঙ্গে নিপুণ, হাসিতে দরাজ, আতিথ্যে দিলদরিয়া ও বন্ধুত্বে অটল।'

ধূর্জটিপ্রসাদের সংগীত-বিশ্লেষণের একটি বড বৈশিষ্ট্য হল সুদীর্ঘকালব্যাপী এ ব্যাপারে তাঁর মনোনিবেশ। তাঁর আটষট্টি বছরের জীবনে সংগীত সম্পর্কে মতামত ব্যক্ত ও বিচার করতে তিনি কোনোদিন কুণ্ঠিত হননি। বারবার ভেবেছেন ও লিখেছেন তবে মতামত কচিৎ পালটেছেন। জীবনের শেষপর্বে তিনি কবুল করেছেন : 'সঙ্গীত সম্পর্কে আমার আগ্রহে মন্দা পড়েছে।…একদিন মনে হতো সঙ্গীত সম্বন্ধে আমার উৎসাহ মৃত্যু দিন পর্যন্ত কমবে না এবং কমে যদি তো চিত্রকলায়, সাহিত্যে, কবিতায়। এখন দেখছি কোনো গান-বাজনা শুনতে গেলেই মনে ওঠে কে কবে ঐ গান, ঐ গৎ, ঐ রাগ কিভাবে গাইতো, বাজাতো। বার্ধক্যের চিহ্ন, হয়তো বা স্মৃতির ক্রিয়া সঙ্গীতেই সবচেয়ে বেশি। প্রুস্ত-য়ের লেখাতেও তাই দেখি।' এই শেষ আত্মবিচারেও কী গভীর প্রজ্ঞা!

স্বভাবত জানতে ইচ্ছা করে ধূর্জটিপ্রসাদের সংগীতিক অভিজ্ঞতার বনিয়াদ কেমন ছিল। বাবা ছিলেন সেতারী, মা-র গান খুলত বিশেষ করে টপ্পায়। মামার বাড়ির পরিবেশ ছিল সংগীতমুখর। মামাতো ভাই ত্রিপুরাচরণের সংগীত-

সামর্থ্য ছিল বড় মাপের। 'খেয়াল, টপ্পা, ঠুংরী—এসব আমি তখন উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের মধ্যেই ধরতাম না। বাবাও ঠিক তাই। তাঁর মাথাব্যথা ছিল ধ্রুপদ, একমাত্র ধ্রুপদ নিয়েই।' অবশ্য ছেলেবেলার কথা। পরে ধূর্জটিপ্রসাদের সংগীত সংস্কার অনেক উদার ও অপক্ষপাতী হয়ে ওঠে। এর মূলে ছিল সবুজপত্রের আসর তথা প্রমথ চৌধুরীর প্রেরণা এবং বন্ধু দিলীপকুমার রায়ের সাহচর্য। তাঁর চাকরি জীবনও তাঁকে সংগীত সুধারস আহরণে খুব সাহায্য করেছিল। ১৯২২ সাল থেকে ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ বত্রিশ বছর লক্ষ্ণৌ শহরে অধ্যাপনা সূত্রে থাকার ফলে উত্তর-ভারতীয় সবরকম উচ্চ ও দেশী সংগীত শোনার প্রচুর অভিজ্ঞতা ছিল। সেখানে ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল প্রবীণ ভাতখণ্ডেজী এবং তরুণ কৃষ্ণ রতন-ঝংকারের সঙ্গে। প্রতিদিনের মরমী সান্ধ্যসঙ্গী ছিলেন অতুলপ্রসাদ। এ প্রসঙ্গে তাঁর মুগ্ধ স্মৃতিচারণ :

> আমি তাঁর কর্মান্তের, বিবামের সঙ্গী ছিলাম। আমাদের পরিচয় হয় সঙ্গীতের দৌত্যে, সঙ্গীতের আসরে। কৈশরবাগে তখন তিনি থাকতেন, অনেক রাত পর্যন্ত গানবাজনা হতো। তারপর কত আসরে বসে তাঁর গান বাজনা শুনেছি তার সংখ্যা নেই। ভালো গান বাজনা শুনলে তিনি বালকের মতো অধীর হযে উঠতেন, অস্ফুট চিৎকার করতেন, মুখ দিয়ে উর্দু জবান বেরুত, একস্থানে বসে থাকতে পারতেন না, আবার তৎক্ষণাৎ লজ্জিত হতেন। কতবার বলেছেন, দেখ, একটু ব্যাকুল বা বেসামাল হয়ে পডলে আমাব জামা ধরে টেনো। তোমাকেই বা কে সামলায় তার ঠিক নেই।

শেষ উক্তিটি বড চমৎকাব! ধূর্জটিপ্রসাদেব অভিনিবিষ্ট সংগীত-প্রাণতার ছবি এ বর্ণনায় স্পষ্ট। লক্ষ্ণৌ শহরেব বিখ্যাত সংগীত মহাবিদ্যালয মরিস কলেজের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা ছিল। তাছাড়া প্রবাস থেকে ছুটিছাটায় কলকাতায় এলেই রবীন্দ্রনাথের দুর্লভ সঙ্গ পেতেন। তাঁর সঙ্গে সংগীত প্রসঙ্গে অন্তহীন বিতর্ক ও চিঠি চালাচালিতে ধূর্জটি ছিলেন অক্লান্ত। তাতে আমাদের লাভ এইখানে যে, রবীন্দ্রনাথের সংগীত-বিষয়ক বহু মতবাদ আমরা সেই সূত্রে পেয়ে যাই। তাঁদের এই পত্রবিনিময় থেকে জন্ম নেয় একটি বই, যার নাম 'সুর ও সংগতি' (১৩৪২)। এ বইয়ের যুগ্ম লেখক হিসাবে নাম আছে রবীন্দ্রনাথ ও ধূর্জটিপ্রসাদের। নিঃসন্দেহে বিরল ও ঈর্ষাযোগ্য সম্মান। রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্নেহ অপাত্রে দান করেননি। কারণ বিস্ময়কর ছিল ধূর্জটিপ্রসাদের সর্বভারতীয় সংগীত সংক্রান্ত

প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা এবং তার মূল্যায়ন সামর্থ্য। ১৯৩৮ সালে প্রকাশিত তাঁর 'কথা ও সুর' বইয়ের ভূমিকায় তিনি তৎকালীন ভারতীয় সংগীতকারদের যে বিবরণ দিয়ে গেছেন তা. উদ্ধৃত করলে তাঁর অধিকারের ব্যাপ্তি বোঝা যাবে। লিখছেন :

> সর্বত্রই খানদানী কিংবা সত্যকারের পুরানো ঘরোয়ানা চাল লুপ্তপ্রায়। ...তাঁরা নির্বংশ, নচেৎ তাঁরা শহরবাসী। সেনীয়া-বংশের গায়ক-গোষ্ঠীর কুলপতি গিধৌড়ের বিখ্যাত গায়ক মহম্মদ আলি খাঁ এবং বীণকার-গোষ্ঠীর প্রধান অধিনায়ক উজির খাঁ আজ জীবিত নেই। সেনীয়ার একটি ঘর এখনও জয়পুরে আছেন, তাঁরা সেতারই বাজান। জাকরুদ্দীন, আলাবন্দে খাঁ এবং তাঁর পুত্র নসীরুদ্দীন এখন জনস্মৃতির মণিকোঠায়। রবাবী আরেকজনও নেই। শরদের পীঠস্থান রোহিলখণ্ড, বিশেষত রামপুরে। সেখানকার বিখ্যাত শরদীয়া ফিদা হোসেনের এবং মহীশূরের বিখ্যাত বীণকার শেষান্না ও রামপুরের বীণকার উজীর খাঁর মৃত্যু প্রায় সমসাময়িক। পীঠাপুরমের সঙ্গমেশ্বর শাস্ত্রী কয়েক বৎসর পূর্বে নিজের বীণার পাশে দেহরক্ষা করেছেন। ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ বেহালা-বাজিয়ে নাইডু ভিজিয়ানাগ্রামে থাকেন। তিনি অন্ধ হয়ে আসছেন, দেওয়াসের রাজাব আলির বয়স সত্তরের কাছাকাছি। ইন্দোরের বিখ্যাত বীণকার মুরাদ আলি অল্পদিন হোলো মারা গেছেন, গোয়ালিয়রের অদ্বিতীয় ধ্রুপদীয়া ওমরাও খাঁ, টিকমগড়ের মৃদঙ্গী হরচরণ লাল অশীতিপর বৃদ্ধ। গোয়ালিয়রের রাজা ভেইয়া, বরোদার ফৈয়াজ খাঁ, মৈহারের আলাউদ্দিন এখনো জীবিত—কিন্তু তাঁদের স্থান অধিকার করবার যোগ্য ব্যক্তি নেই।

কত অনায়াসে ধূর্জটিপ্রসাদ পরিক্রমা করে নেন ভারতের সংগীত সাম্রাজ্য। বাস্তবিক ঈর্ষাজনক ছিল তাঁর গান শোনার কৌতূহল। নিজেও গান গাইতেন এবং সংগীতের তত্ত্বচিন্তা করতেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর খোলাখুলি স্বীকারোক্তি : 'গান আমাকে অধ্যাপকীয় মনোভাব থেকে অনেক বাঁচিয়েছে। যদিও গানে পাগল ছিলাম তবু যেন সেটা বুদ্ধির দিক থেকেই ফুটে উঠেছে।'

অভিজ্ঞতা, রুচি, তত্ত্বদর্শিতা, শ্রেষ্ঠ গুণজ্ঞদের সঙ্গ এবং সরস হৃদয়বৃত্তি দিয়ে ধূর্জটিপ্রসাদ গড়ে তুলেছিলেন তাঁর নিজস্ব সাংগীতিক দৃষ্টিকোণ। যা খানিকটা সিনিকাল অথচ যুক্তিপূর্ণ। মাঝে মাঝে চমকে উঠতে হয় মৌলিকতার বিদ্যুতে আবার কখনও নড়ে বসতে হয় বক্তব্যের কশাঘাতে। দুয়েকটা উদাহরণ দিই :

১. রবীন্দ্রনাথ চিরকাল ওস্তাদী সঙ্গীতে অভ্যস্ত হলেও নিজে ওস্তাদ নন।

২. বাংলাদেশের গানে হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের প্রভাব অনেকখানি—সে প্রভাব দূর করা যাবে না, দূর করা উচিত নয়। বাউল কিংবা কীর্তন হাজার মধুর হলেও তার এমন ক্ষমতা নেই যে হিন্দুস্থানী সঙ্গীতকে তাড়িয়ে দেয়। দেশের রাজনৈতিক ইতিহাস হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের সপক্ষে।

৩. কোনো সমালোচক শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে বর্তমান সঙ্গীত পদ্ধতিকে জলাঞ্জলি দিতে পারেন না। শিক্ষিত সমালোচনার ভিত্তি একমাত্র বর্তমানে যেভাবে গাওয়া হয় তা-ই হতে বাধ্য—শাস্ত্রানুসারে কি গাওয়া উচিত তা দেখলে চলবে না।

৪. রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রাণ কথার মাধুর্য নয়, কথা ও সুরের সঙ্গতিও ততটা নয়, যতটা গানটির ডিজাইন। কথা বাদ দিয়ে, কেবল স্বরবর্ণের সাহায্যে সুরটি গাইলেই বোঝা যায়।

এর পাশাপাশি তাঁর কতকগুলি দ্ব্যর্থহীন সাংগীতিক প্রত্যয়ও উদ্ধারযোগ্য যার থেকে মানুষটিকে অনাবিলভাবে আবিষ্কার করা যায়। যেমন :

১. লোকনৃত্য, লোকসঙ্গীত, লোকশিক্ষা নিয়ে মাতামাতির মধ্যে সজীব রুচির চেয়ে শহরসুলভ ক্লান্তিরই পরিচয় বেশি।

২. জনসাহিত্য, জনসঙ্গীত, জননৃত্য নিয়ে মাতামাতি করার অবশ্য একটা কারণ আছে। ধ্রুপদ-খেয়াল শেখা, গাওয়া শক্ত; ভারত নৃত্য অত্যন্ত কঠিন জিনিস; মেঘদূত, মেঘনাদ বধ বোধের জন্য কাঠখড় চাই। 'পীপলস্ আর্টে' ও-সব বালাই নেই, অন্তত, তাই আমরা মনে করি। পরিশ্রম, ডিসিপ্লিন, মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকদের পছন্দ নয়; এবং তাঁরাই এখনকার আমরা।

৩. যাঁরা বলেন সঙ্গীতে 'ইণ্টারেস্টেড', আধুনিক সাহিত্যে 'ইণ্টারেস্টেড', লোকসঙ্গীতে, এবস্ট্র্যাক্ট ছবিতে 'ইণ্টারেস্টেড' তাঁরা ভদ্রলোক, নিতান্ত ভদ্র, কিন্তু সঙ্গীত, সাহিত্য, চিত্রকলার পক্ষে নিতান্ত ভয়ঙ্কর।

৪. তানকারীর সময় আমীর খাঁ মাথা চুলকোতেন এবং মাথায় ও গালে থুতু মাখতেন। কিন্তু সত্যি গুণী, বাঘের মতন রাগকে কামড়ে ধরতেন।

এইসব তির্যক মন্তব্যের লেখক ধূর্জটিপ্রসাদের সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিচয় মেলে 'আমরা ও তাঁহারা' বইয়ে রীতিমত সংলাপ রচনার ঢঙে যখন তিনি লেখেন তাঁর ভারতীয়

সংগীতের ইতিহাস। তবে সব লেখকেরই যেমন অবসেশ্চন থাকে তাঁর তেমনই ছিল মেয়েদের সংগীতচর্চা বিষয়ে দারুণ কঠোর মনোভাব। একটি লেখায় বলছেন, 'কি জানি কেন, কথা-জড়ানো সাহিত্য-মাখানো, সাহিত্যিক রসে চোবানো সঙ্গীতের প্রসারে আমি একটু ভীত হয়েছি। ঐ সাহিত্যের আশীর্বাদেই মেয়েরা ঢুকে পড়েছেন, কেবল আসরে নয়, সঙ্গীতের মধ্যে। খুরশেদ আলি বলতেন, ঠুংরি মেয়েদের জন্য নয়। অর্থাৎ, ঠুংরিটাও নয়।' অন্যত্র বলেছেন: 'নানা কারণে বাংলাদেশে হিন্দুস্থানী পদ্ধতির পুনরাবৃত্তি অসম্ভব। বাঙ্গালী বোধ হয় কখনও অন্ধ অনুকরণ করতে পারেনি; স্বভাবের দোষে নয় ইতিহাসেরই আশীর্বাদে। তবে সঙ্গীত আসরে স্ত্রী জাতির অভিযানের ফলে কি হবে বলা যায় না।' তবে মেয়েদের গান সম্পর্কে তাঁর সবচেয়ে নির্মম মন্তব্য হল: 'ভাল কথা—সঙ্গীত-গায়কবৃন্দ একটু আধটু ধ্রুপদ খেয়াল শিখুন না। আর গায়িকারা —তাঁদের যেন শীঘ্র শীঘ্র বিবাহ হয়, ঘব সংসার ভরে যায়।'

এই সব শ্লেষ বা তির্যকতায় তাঁর সংগীত সংক্রান্ত প্রান্তিক চিন্তার কিছু কিছু প্রতিফলন থাকলেও ধূর্জটিপ্রসাদের বিশ্লেষণ অত্যন্ত বুদ্ধিদীপ্ত এবং একক। তাঁর মতামত কতখানি গ্রহণযোগ্য হবে সে সম্পর্কে তাঁর কোনো উদ্বেগ ছিল না মনে হয়। ফলে পাঠক-নিরপেক্ষ তাঁর নানা মন্তব্য ও সিদ্ধান্ত বহু প্রশ্ন ও প্রতিপ্রশ্ন জাগায়। তবে বাংলা সংগীত সমালোচনার ইতিহাসে ধূর্জটিপ্রসাদেব নাম অন্তত একটি কারণে অবিস্মরণীয় থাকা উচিত। তিনি সর্বপ্রথম রবীন্দ্রসংগীতের মূল সুরের স্বরূপ ও গাঠনিক বিন্যাস সম্পর্কে চিন্তাদ্যোতক তত্ত্ব প্রতিপাদন করে গেছেন। কোনো কোনো সিদ্ধান্তে মতভেদ স্বাভাবিক কিন্তু অমোঘ তাঁর ভাবনার প্রাতিস্বিকতা। তিনি রবীন্দ্রনাথকে খুব বড় কম্পোজারেব মহিমায় ভূষিত করে গেছেন শেষোক্তের জীবিতকালেই, অথচ রবীন্দ্রসংগীতেব সীমাবদ্ধতা ও রূপায়ণ সমস্যা তাঁব চিন্তাকে এড়ায়নি। প্রসঙ্গত উদ্ধারযোগ্য তাঁর কিছু মত, যা নতুনত্বে ঝকঝকে:

> ১. রবীন্দ্রসঙ্গীত হিন্দুস্থানী সঙ্গীতেরই অঙ্গ। যেসব গানে অঙ্গভঙ্গ হয়েছে মনে হয়, সেখানেও অনেকক্ষেত্রে তিনি রীতি-বিগর্হিত কাজ করেন নি। রাগ-ভ্রষ্টতার জন্য প্রধানতঃ দায়ী কবিতার কোনো বিশেষ ভাব, যাকে মূর্তি দেওয়া প্রচলিত বিশেষ রাগরূপের মধ্যে একপ্রকার অসম্ভব। তবু রবীন্দ্রসঙ্গীত বর্ণসঙ্কর নয়।
>
> ২. রবীন্দ্রসঙ্গীতে স্বরকে কথার উপলখণ্ড অতিক্রম করতে হয়। স্বরের

যদি সুরগত শক্তি থাকে, তবে উপলগুলিও সঙ্গে ভেসে যেতে পারে। কিন্তু সাধারণতঃ তার সে শক্তি কম না হলেও উপলখণ্ডেরই ওজন ভারি, তার সৌন্দর্য সত্ত্বেও। এই কারণেই রবীন্দ্রসঙ্গীতে "আ" করে, মুখ খুলে উদাত্ত স্বরে গাওয়া চলে না, তালের বৈচিত্র্য ও মর্যাদা রাখা যায় না।

৩: হিন্দুস্থানী গায়ক-পদ্ধতিতে মাধুর্য রাগের ও বন্দেশের—গায়কের নয়। এবং এতটাই নয় যে, গায়কের কণ্ঠস্বর পর্যন্ত গৌণ।···বন্দেশী গানে, যেমন সেনিয়া ধ্রুপদ-ধামারে কি সদারঙ্গী খেয়ালে, রাগ ও বন্দেশ অভিন্ন। এইখানে রবীন্দ্রসঙ্গীতের সঙ্গে 'পাক্কা' গানের মিল। গরমিল আরও গভীর।···শ্রোতা রবীন্দ্রসঙ্গীত যখন শুনছেন, তখন তাঁর সামনে রয়েছে গায়ক-গায়িকা আর কানে আসছে সঙ্গীতের রূপ। কিন্তু ঐটুকু : অর্থাৎ কানে আসছে না রাগ-রূপ। বেশ—কিন্তু সেইসঙ্গে কবিতার রূপও আসা উচিত ছিল না, কারণ রবীন্দ্রসঙ্গীত যদি রাসায়নিক প্রক্রিয়া, বহুব্রীহি সমাস কিংবা emergent value-র দৃষ্টান্ত হয়, তবে তাকে অত সহজে ভাঙা যায় না, ভাঙা উচিত নয়। অথচ শ্রোতার কানে সঙ্গীতের সাহিত্যিক (কবিতার) রূপটা ভেসে উঠছে। এই প্রকার Partial fission-এর জন্য মাধুর্য কবিতায় ও গায়ক-গায়িকার ব্যক্তিত্বে, এমনকি রূপে আশ্রয় করে। Fission সম্পূর্ণ হয় হিন্দুস্থানী গায়ন-পদ্ধতিতে। ওস্তাদ কথাকে অবহেলা করেন—এটা সত্য নয়। তিনি বন্দেশ দেখাবার পর তান ও বাটোয়ারার সাহায্যে সমন্বয়টি ভেঙে দেন। ফলে শক্তি মুক্ত হয়, শত গুণ বৃদ্ধি পায়। অন্ততঃ পুরোপুরি প্রকাশ পায়। মনোযোগের কেন্দ্র কিন্তু রবীন্দ্রসঙ্গীতে নড়ে বেড়ায় কবিতা ও গায়ক-গায়িকার মধ্যে।· ·গায়ন-পদ্ধতির জন্য রবীন্দ্রসঙ্গীতে সুরাংশ আরও কমছে এবং কবিতা ও ব্যক্তিত্বের প্রাধান্য আরও বাড়ছে।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানে সুরবিহার ( Improvisation ) করতে দিতে রাজি হননি। এ নিয়ে তাঁর সঙ্গে দিলীপকুমারের খুব বিতর্ক হয় এবং দিলীপকুমার রবীন্দ্রসঙ্গীত গাওয়া বন্ধ করেন বরাবরের জন্য। কিন্তু কেন রবীন্দ্রনাথের এই নিষেধ ? ধূর্জটিপ্রসাদের মতে :

প্রথামত উচ্চসঙ্গীতে রাগের একটা বড়, মোটা কাঠামো থাকে, তারই

মধ্যে গাইয়ে-বাজিয়েকে বিচরণ করতে হয়। সেই সময়টুকু তাঁর ব্যক্তিগত কৃতিত্বের অবসর। কৃতিত্বের রঙ হলো ভাব, একসপ্রেশন। রবীন্দ্রনাথের প্রতিটি গান এক একটি 'ডিজাইন', সেইটাই কাঠামো, সেইটাই একসপ্রেশন। তার ওপর ব্যক্তিগত একসপ্রেশন চাপালে বিপদ ঘনিয়ে ওঠে। হয়ে পড়ে ন্যাকামি। ন্যাকামির মানে আদিখ্যেতা, অর্থাৎ আধিক্য। আমার মনে হয়, এই জন্যই রবীন্দ্রনাথ তাঁর সুর নিয়ে ছিনিমিনি করতে দিতে গররাজি ছিলেন। দিলীপ ঠিক ধরতে পারেনি। আরও অনেকেই পারেন না। বেদমন্ত্রের উচ্চারণে শুদ্ধতার ওপর অতোটা জোর দেওয়া হতো কেন আমাদের ভাবা উচিত। ঐ প্রকার শুদ্ধতায় একটা সৃষ্টির দিক আছে।

এই পর্যন্ত তাঁর বিশ্লেষণ সঠিক এবং নতুন দিকদর্শী। কিন্তু এরপর তিনি লেখেন সম্পূর্ণ অন্য কথা :

এনায়েৎ খাঁর হাতে একই পিলু, একই কাফি বহুবার শুনেছি, প্রতিবারই নতুন, প্রতিবারই সৃষ্টি। শুদ্ধতার উপর অতোটা জোর দেবার অবশ্য অন্য একটা সামাজিক দিক আছে। ঐ জোর দিয়েই উচ্চশ্রেণী, এলিট গ্রুপ—যেমন ব্রাহ্মণ, উলেমা ম্যাণ্ডারীন, নিজেদের শ্রেণী আধিপত্য বজায় রাখে। রবীন্দ্রসঙ্গীতে যদি ঐ ধরনের দলীয় স্বার্থ তৈরি হয়ে থাকে, তবে তাকে ভাঙাই উচিত।

তাহলে বক্তব্যটি কী দাঁড়ালো? নিতান্তই স্ববিরোধী নয় কি? শুদ্ধতার প্রয়োজন আছে অথচ এলিটিস্টদের দুর্গ ভাঙা উচিত—এই দুই সিদ্ধান্ত একই সঙ্গে কেমন করে আমরা গ্রহণ করব?

ধূর্জটিপ্রসাদ স্পষ্টত হিন্দুস্থানী সংগীতের অনুরাগী এবং কথাবহুল প্রাদেশিক গানের সিদ্ধি সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ। তবে এ ব্যাপারে তিনি প্রান্তবাদী নন। তাঁর মনে হয়েছে 'সব সুরের খেলাই এই জগৎ থেকে দূরে নিয়ে যায়, রবীন্দ্রসঙ্গীত ও তেলানা, দুইই।' তিনি মেনে নিয়েছেন, 'রবীন্দ্রসঙ্গীতের ভৈরবীও সুর, আবার ভৈরবীর তেলানাও সুর।' কিন্তু আমাদের প্রশ্ন, দুটি কি সত্যিই এক?

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ধূর্জটিপ্রসাদের যে পত্র-বিতর্ক হয়েছিল তাতে তিনি হিন্দুস্থানী সংগীতের পক্ষ নিয়েছিলেন। অবশ্য তা কতটা তর্কের খাতিরে আর কতটা তাঁর বিশ্বাসজাত বলা শক্ত। রবীন্দ্রনাথকে তাঁর প্রথম জিজ্ঞাস্য ছিল গানে আলাপের ভূমিকা বিষয়ে। 'রচনা হল কথা ও সুরের মিশ্রণে এক নতুন

রসসামগ্রী। আলাপ কিন্তু প্রাথমিক, রাগিণীর রূপবিকাশই তার একমাত্র কাজ; এখানে না আছে অর্থবাহী কথা, না আছে কথাবাহী অর্থ। আলাপের গন্তব্য নেই অথচ উদ্দেশ্য আছে। উদ্দেশ্য বিকাশের মধ্যেই নিহিত। উদ্দেশ্য রাগিণীকে reveal করা।...আলাপিয়ার সুবিধাও রয়েছে—রচনার, বিশেষতঃ কথার, বাঁধন তাকে মানতে হচ্ছে না।...আলাপই আমাদের pure music। সংগীত বলতে আমি আলাপকেও বুঝি।' এবং তিনি আলাপকে প্রাধান্য দিতে ইচ্ছুক ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর আলাপ সংক্রান্ত বক্তব্যকে খারিজ করে দেন এই বলে যে 'আলাপের উপাদান-রূপে আছে বিশেষ রাগরাগিণী, সেগুলি গানের সীমার দ্বারা পূর্ব হতেই কোনো রচয়িতার হাতে নির্দিষ্ট রূপ পায়নি। আলাপে গায়ক আপন শক্তি ও রুচি অনুসারে তাদের রূপ দিতে দিতে চলেন। এ স্থলে অত্যন্ত সহজ কথাটা এই: যিনি পারলেন রূপ দিতে তাঁকে আর্টিস্ট হিসাবে বলব ধন্য, যিনি পারলেন না, কেবল উপাদানটাকে তুলো ধুনতে লাগলেন, তাঁকে গীতবিদ্যা-বিশারদ বলতে পারি, কিন্তু আর্টিস্ট বলতে পারি নে।'

ধূর্জটিপ্রসাদের দ্বিতীয় জিজ্ঞাস্য ছিল 'চারপদী দরবারী কানাড়ার তানসেনী ধ্রুপদ ও খাম্বাজের ঠুংরির মধ্যে পার্থক্য আছেই। Great হলেই তাকে ভোঁতা হতে হবে...ছোটো হলেই ইঙ্গিতমুখর হতে হবে এমন কোনো বাধ্যবাধকতা আছে কি?' এবং 'আমি জানি আমার কান অশিক্ষিত নয়, আমার কানে শ্রুতির তারতম্য পর্যন্ত স্পষ্ট। এই কানে যেটা ভাল লাগে সেইটাই হবে আর্ট।...এই ব্যক্তিগত রুচিকে বাদ দিলে সংগীতের ভবিষ্যৎ-নিরূপণের অন্য কী ব্যক্তি-সম্পর্কহীন পথ নির্দেশক চিহ্ন থাকতে পারে?'

এর জবাবে রবীন্দ্রনাথ সংক্ষেপে জানান, বড় বা ছোট সব সংগীতের মৌল প্রয়োজন 'আর্টের সংহতি' এবং 'ভালো লাগা এবং না-লাগা নিয়ে বিরোধ অন্য সকল রকম বিরোধের চেয়ে দুঃসহ'। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কোনো নির্দেশিকা দেননি।

ধূর্জটিপ্রসাদের তৃতীয় বিতর্ক-জিজ্ঞাসা সবচেয়ে মৌলিক। তাঁর জিজ্ঞাসা, 'কোনো দেশ কিংবা জাতির বৈশিষ্ট্য' বলে কিছু আছে কিনা। এবং 'বাংলা সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যের অস্তিত্ব নিয়েই যদি কোনো ব্যক্তি সন্দিহান হয়, তবে সে ব্যক্তি তার দোহাই'এ মানবে না যে, ভবিষ্যতের বাংলা গান পুরাতন বাংলা গানের ধারাতেই চলবে।' সেইজন্যই প্রশ্ন, 'হিন্দুস্থানী গায়কি-পদ্ধতির সঙ্গে আমাদের পরিচয় এক দিনের নয়, পুরাতন ও ঘনিষ্ঠ। অথচ, এই ধারার সঙ্গে

বাংলাদেশের সংস্কৃতির যোগ নেই, যোগ রইল যাত্রা-কীর্তন-ভাটিয়ালের সঙ্গে— এ কেমন করে হয়?' রবীন্দ্রনাথ জবাবে জানিয়ে দেন: 'ভিন্ন ভিন্ন গণজাতির মধ্যে চরিত্রগত হৃদয়গত প্রভেদ অন্তত দীর্ঘকাল থেকে চলে আসছে' এবং 'বাঙালীর মধ্যে যে হিন্দুস্থানী গানের অনুশীলন দেখা যায়, সেটা নিতান্তই ধনীর-আঁচল-ধরা পূর্বানুবৃত্তি।...দূর শতাব্দীর বাদশাহী আমলের বাইরে আমরা যে আজও বেঁচে আছি সংগীতে তার যদি কোনো প্রমাণ না পাওয়া যায়, তাহলে এ নিয়ে গৌরব করতে পারব না। তার চেয়ে নিজের শাকভাত এবং কুঁড়েঘরও শ্রেয়।'

নানা স্ববিরোধিতা ও কট্টর মতামত সত্ত্বেও ধূর্জটিপ্রসাদ বাংলা সংগীত সমালোচনাব ইতিহাসে গুরুত্ব পান তাঁর জিজ্ঞাসার স্বাতন্ত্র্যে এবং স্পষ্টবাদিতায়। তাঁর গদ্য রচনা যথেষ্ট স্বাদু নয়, এজন্য তাঁর জনপ্রিয়তা কম। কিন্তু সংগীত-বিষয়ক তাঁর ইংরাজি রচনাগুলি এ ব্যাপারে ব্যতিক্রম। এখনও পর্যন্ত তাঁর মতো সংগীতের সার্বিক আবেদন ও বিন্যাসগত নানা চিন্তা, শ্রোতার রুচি ও শিল্পীর স্বাধীনতা-বিষয়ক আলোচনা আর কেউ করতে পারেননি।

প্রমথ চৌধুরী, ধূর্জটিপ্রসাদ বা দিলীপকুমারের মতো প্রতিষ্ঠিত সারস্বত সাধক ছিলেন না অমিয়নাথ, অথচ তাঁর সংগীত সম্বন্ধীয় লেখাগুলি আশ্চর্যরকম ধারালো, রসবোধে নিবিড় এবং প্রয়োজনমতো শ্লেষ পরিহাসে দারুণ উপভোগ্য। রীতি-মতো লেখক না হয়েও এই যে লেখনীদক্ষতা তার কারণ তাঁর উপলব্ধির সততা ও রসবোধের গাঢ়তা। রচনার বিষয় সম্পর্কে নিশ্চিত দক্ষতা ও ধারণার স্পষ্টতা থাকলে স্টাইল আপনি এসে যায় একথা আরেকবার প্রমাণ করেন তিনি। সম্ভবত বিশ শতকের সংগীত সমালোচকদের মধ্যে তাঁর রচনাভঙ্গি সবচেয়ে সাহিত্য-পদবাচ্য। তাঁর 'স্মৃতির অতলে' তো মৌলিক বইয়ের মতো সুখপাঠ্য।

অমিয়নাথের চিন্তা-চেতনার মধ্যে হিন্দুস্থানী গানের সৌন্দর্য এবং বাংলা গানের স্বভাব আকুলতা একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ সংগতি পেয়েছিল। বাঙালীর সংগীত সাধনার ঐতিহ্য এবং বাংলা গানের সৃষ্টিগুণ সম্পর্কে তাঁর অভিমান ও অহংকার তিনি কোথাও রাখেননি।

১৮৭৫ সালের জাতক অমিয়নাথ লিখেছেন: 'আমার বাল্য ও যুবাবয়সে

ভাব পেয়েছে বলেই এঁর গৌরব বৃদ্ধি করেছে। এঁর মধ্যে সকলের বিকীর্ণ জ্যোতিকেই দেখতে পাই বলে সকলের পরিচয় এঁর মধ্যে নূতন হয়ে দেখা দেয়। আবার এঁর নিজস্ব রশ্মিছটার এমনই মহিমা যে—সেদিকে কিছুক্ষণ দৃষ্টিপাত করে অন্যের দিকে তাকালে সেগুলিকে ম্লান ও খর্ব বোধ হয়।'

অমিয়নাথের সংগীত বিশ্লেষণের এই অন্তঃশীল রসদৃষ্টিটুকু বাংলাদেশে অভিনব। তিনি সব সময়েই জোর দেন গান শোনার অভিজ্ঞতাজাত উপলব্ধিকে। গাইয়ে-লোকের চোখের মধ্যে সুরের যে এইটি অগ্নিকোণ আছে এ তাঁরই মৌলিক আবিষ্কার। আবার তিনিই বুঝেছিলেন যে, অনুভবের ইন্দ্রধনু উদিত হয় জ্ঞান-সূর্যের বিপরীত দিকে। তাই সংগীত বিশ্লেষণে তিনি কখনও সংগীতশাস্ত্রকে সাক্ষী মানেননি, মেনেছেন নিজের সংগীত বিবেককে, যা বহু পরিশীলনে মার্জিত। এর জন্য তাঁকে ব্যয় করতে হয়েছে যৌবনের অনেকগুলি দিন, জয় করতে হয়েছে বহু বয়সোচিত প্রলোভন। তিনি নিজেই ভেবে আশ্চর্য হয়ে লিখেছেন: 'শ্যামলালজী আর বাদল খাঁ সাহেব আমাকে বেঁধে ফেলেছিলেন। কেউ কি কখনও ভাবতে পারে যে, কলিকাতায় অবস্থানকারী আমার মতো একটি তাজা চোখ-কান খোলা তরুণ যুবক গড়ের মাঠের খেলার কথা জানেনি, চলচ্চিত্রের আকর্ষণকে তুচ্ছ মনে করেছে, সমবয়স্কদের সঙ্গ ছেড়ে চুরাশি আর চুয়ান্ন বৎসরের বৃদ্ধ প্রৌঢ়ের সঙ্গ বেশী লোভনীয় মনে করেছে?' এবং পরবর্তী সারাজীবনে তিনি কোনো চাকরি নেননি। শুধুই সংগীতচর্চা আর সমীক্ষা, বিশ্লেষণ আর অধ্যয়ন। আশ্চর্য!

সংগীত সমালোচক হিসাবে অমিয়নাথ ছিলেন স্বভাবকুণ্ঠ। ধূর্জটিপ্রসাদের মতো অনর্গলভাষী লেখক যদি তিনি হতেন তবে আমাদের লাভই হতো। কিন্তু দেখা যায়, সংগীত বিশ্লেষণে ও তার বীক্ষণে তিনি যে পরিমাণ সময় ব্যয় করেছেন তার এক দশমাংশ সময় দেননি লেখায়। তবু সামান্য যা লিখেছেন তা রঙে রসে উপলব্ধিতে ও বিষয়গৌরবে চিরন্তন সামগ্রী। তবে কোনো বিতর্কমূলক ব্যাপারে তিনি কলম ধরেননি। তাঁর লেখার ধরনটি ছিল রসিকের, রসপিপাসুর। কোথাও কোথাও একটু ব্যঙ্গের খরশান, কোথাও একটু সৌন্দর্যমুগ্ধ দ্যোতনা, দুয়েকটা ছেড়ছাড় টানটোন। কিন্তু আগাগোড়া হৃদয়গ্রাহী। কয়েকটি মন্তব্য উদ্ধারের লোভ সামলানো কঠিন। অদ্বিতীয় গায়ক কালে খাঁ ছিলেন একটু বাতিকগ্রস্ত অথচ সরলমতি। তাঁর সম্পর্কে অমিয়নাথের বর্ণনা:

কালে খাঁ সাহেবের সঙ্গে আলাপ-পরিচয়ের পর বুঝেছিলাম তাঁর

> অন্তঃকরণ হীরকের মতই স্বচ্ছ। সেই হীরের বনাই, যাকে বলে কাটিং একটু এলোমেলো অসমান।

কালে খাঁ বড়বাজারের যে গলিতে থাকতেন তার বর্ণনা :

> সে গলির এমন গড়ন পেটন যে মনে হল—সূর্য কখনও তাকে বে-আবরু করতে পারবে না।

যৌবনের লাস্যপ্রতিমা গহরজান বাঈয়ের শেষ বয়সের বর্ণনা :

> সেই সন্ধ্যালগ্নের গহর বললে মনে পড়ছে, এলোমেলো হাওয়ার একটি ঘূর্ণী যা নিজেও থাকে না, পরকেও দিশেহারা করে দিয়ে যায়।

এইসব রচনাংশে তিনি অপ্রতিম এইজন্যে যে, নিছক দেখার বাইরে তাঁর একটা রসস্থ মন ছিল। সেই মনের প্রবর্তনাতেই তাঁর দেখা। বিশ শতকের প্রথম ত্রিশ বছর কলকাতার সংগীত জগৎ, তার গীতি উচ্ছলতা ও সমঝদারির প্রকৃত ছবি যদি কেউ বিশ্বাস্যভাবে এঁকে থাকেন তবে তা অমিয়নাথ। তা একই সঙ্গে সমাজ ইতিহাস ও কাব্য। অনুভূতিতে প্রগাঢ়, দৃষ্টিসুখে রূপময়, সৃষ্টিশীলতায় জারিত। অন্যান্য সংগীত সমালোচকদের সঙ্গে তাঁর পার্থক্য বিরাট। তিনি ইতিহাস রচনা বা তত্ত্বের কচকচির দিকে একবারও যাননি অথচ প্রতিষ্ঠা করেছেন অনেক মানবিক ও সৃষ্টির সত্য। ভালো গান শোনার যে হৃদ্‌গত অনুভব তাকে তিনি ভাষায় রূপ দিয়েছেন, যা প্রায় অসম্ভবের পর্যায়ে পড়ে। স্বতঃস্ফূর্ত গায়ক মৌজুদ্দিনের কণ্ঠে উদারার নিখাদ থেকে মুদারার কোমল ধৈবত পর্যন্ত একটি মীড় শুনে তাঁর মনে হয়, 'অভিমানের অন্তে যেন হৃদয়ের সঞ্চিত মাধুর্য উছলে পড়েছে একটিমাত্র অশ্রুরেখার মধ্যে।' এ বর্ণনা তো কোনো গড়পড়তা সংগীতরসিকের নয়, এ তো মুগ্ধ শ্রোতার দ্বিতীয় সৃষ্টি। গান যে একাকী গায়কের নয় তার নমুনা হিসাবে শ্রোতা অমিয়নাথের অনুভবে কালে খাঁর একটি গানের বিশ্লেষণে এইভাবে আসে :

> শব্দগুলি কখন সূক্ষ্ম গমকের নিস্বনে কেঁপে কেঁপে ওঠে, কখনও বা জমজমার মাদকতায় হেলতে দুলতে সপ্তকের এদিক-ওদিক যেখানে সেখানে নৃত্যের আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে ঘুরে ফিরে চলে যায়। শীতের অন্তে বসন্তের আমেজে পত্রপল্লবের মত যেন কথার টুকরোগুলি ঝকঝক করে ওঠে। বসন্ত আর যৌবন সমাগম একসঙ্গে। এদের আভাস ইঙ্গিতে রাগলতিকার বৃন্তে দেখা যায় গিটকারির গুচ্ছ, আধফুটন্ত ফুলের স্তবকের মত। ললিতাপঞ্চম রাগিণীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গেই তো দেখি বসন্তের চমক!

সুরশ্রুতির শিহরন তো যেন গানের শরীরে যৌবনেরই জাগরণ! এ কি বাস্তবিকই ললিতাপঞ্চমে উন্মত্ত যৌবন বিভ্রম? না কি গুণীর হৃদয়ে প্রতিভার উন্মাদনার চরম একটি মূর্তি?

বাংলা সংগীত সমালোচনার ইতিহাসে অমিয়নাথ সান্যাল আমাদের এক মহৎ অর্জন, যদিও সেই সমৃদ্ধ উত্তরাধিকার সম্বন্ধে আমরা খুব একটা সচেতন নই। তাঁর ইতিহাসবোধ এমনই অমোঘ ছিল যে, বিশেষ কোনো গীতরূপের উদ্‌ভবের সঠিক কারণ পর্যন্ত ধরতে পারত। প্রসঙ্গত একটি উদাহরণ। উনিশ শতকে একসময়ে টপ্পা যাত্রা পাঁচালীর প্রভাবে বাংলা গানে প্রেম প্রণয় মিলন বিরহ প্রসঙ্গে ভাব ও উদ্দীপনা খুব এসে গিয়েছিল। ফলে শিক্ষিত রুচিশীল সমাজ গান সম্পর্কে শুচিবায়ুগ্রস্ত হয়ে পড়ে এবং এমনকি অমিয়নাথের ভাষায় 'শিক্ষিত ব্যক্তি ডুগি-তবলা দেখে চমকে উঠে সরে যেতেন।' তার জন্য শিক্ষাপ্রধান শহরগুলিতে গান চর্চা প্রায় বন্ধ হয়ে এসেছিল। অমিয়নাথ এই অবস্থার বর্ণনার পর লিখছেন: 'শ্লীল গানের মধ্যে যা থাকল—সেগুলিকে "শেষের সেদিন মন কর রে স্মরণ" অথবা "দিবা অবসান হল কি কর বসিয়ে মন"-এর নির্বেদাত্মক শ্রেণীর মধ্যে রাখা যায়। …এরূপ পরিস্থিতিকে ভাল করে কল্পনা করলে বুঝতে পারি আদি ব্রাহ্ম সমাজের প্রথম ও মধ্যাবস্থায় পশ্চিমা ঢংয়ের ধ্রুবপদের ছন্দে বা বাংলা ভাষায় ব্রহ্মবিষয়ক শান্ত-রসের গান কেন রচনা ও প্রচার করা হযেছিল। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভাকেও দোহন করা হয়েছিল, এবং সে সময়ে অর্থাৎ টাটকা থাকতে থাকতে কিছু না কিছু অমৃতস্বাদ নিশ্চয়ই ছিল।'

অনবদ্য এই সমাজ-ইতিহাসমূলক বিশ্লেষণ করে তিনি সিদ্ধান্ত করেন: 'ঐ গান বা ঢংএর গান সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়েছে।' কিন্তু এর কারণ কি? তাঁর মতে: 'এক-মাত্র কারণ এই যে বাঙ্গালীর মন প্রাণ ইতিপূর্বেই অমৃতরসের আস্বাদন করে ফেলেছে মহাজন পদাবলীর কীর্তনের মধ্যে, নিধুবাবু শ্রীধরের গানের মধ্যে, দাশু রায় গোবিন্দ অধিকারীর গানের মধ্যে দিয়ে। তাকে কি আর শান্তরসের গান দিয়ে লুব্ধ করা যায়?' ফলত যায়নি এবং এই ফাঁকে 'একদল শিক্ষিত সঙ্গীতামোদী ব্যক্তি প্রচার আরম্ভ করলেন যে—নাদব্রহ্ম প্রভৃতি যাবতীয় সূক্ষ্ম ব্যাপাব একমাত্র হিন্দী গানে ও তম্বুরার মধ্যে লুকিয়ে বসে আছে; অতএব একমাত্র পশ্চিমা গানই চতুর্বর্গের চাবিকাঠি সমর্পণ করতে পারে—বাংলা ভাষায় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত হতে পারে না।'

অমিয়নাথের বেশির ভাগ লেখায় এমন অন্তর্বীক্ষণ দিয়ে ইতিহাসকে পরোক্ষ-

ভাবে দেখানো হয়েছে যা একমাত্র রবীন্দ্রনাথের রচনায় আমরা পাই। তিনি প্রমথ চৌধুরী বা ধূর্জটিপ্রসাদের মতো নানা বিদ্যার আলোয় সংগীতকে বোঝবার ও বোঝাবার প্রয়াস পাননি। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তাঁর নিপুণ সাংগীতিক মেধা ও প্রমা তাঁকে নিয়ে গেছে সত্য নির্ণয়ের সঠিক পথে। সেইজন্য তাঁর রচনা-শৈলী মজবুত এবং ভাষাবিন্যাস প্রসাদগুণযুক্ত। তিনি সংগীতবিচারের ক্ষেত্রে গায়ক, গায়কী, পরিপার্শ্ব, আলাপ বা তানের ব্যবহারিকতার চেয়ে বেশি জোর দিয়েছেন গানের ভেতরকার বুনন আর তার অন্তবস্থিত কল্পনাকে। এই সত্যটিকে তিনি ব্যক্ত করে গেছেন :

> শ্যামলালজী বলতেন গানের মেজাজই হল আসল কথা। গায়কেব মেজাজ নয়। তন্নুলালজী আরও গভীর রহস্যের আভাস দিয়ে বলতেন, গানেরও অরমান্ অর্থাৎ নিজস্ব আকাঙ্ক্ষা আছে, যা গাইয়ের আকাঙ্ক্ষা থেকে স্বতন্ত্র।···অন্তত এটুকু বুঝতে পেরেছিলাম যে, গানের মেজাজ বা আকাঙ্ক্ষা যখন গায়ককে সুর-মীড়-মুরকির আবর্তে টেনে নিয়ে যাচ্ছে তখন গানের অন্তরেই গানের রহস্য আছে, গায়কের অন্তরে নয়।

এমন ভূয়োদর্শী সংগীত আলোচক তাঁর জীবিতকালে প্রাপ্য স্বীকৃতি ও রসিকেব অভিনিবেশ পাননি। উদাসীন, আত্মকুণ্ঠ, মরমী এই অদ্ভুত মানুষটি শেষজীবনে সংগীততত্ত্ব সম্পর্কেও সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত হয়ে নিজেব বেশির ভাগ পাণ্ডুলিপিব বহ্ন্যুৎসব করেন নিজের হাতে।

বিশ শতকের সংগীততাত্ত্বিকদের মধ্যে দিলীপকুমার রায়ের ভূমিকা, যোগ্যতা ও উত্তরাধিকার একটু স্বতন্ত্র মর্যাদার। প্রসিদ্ধ গীতকার দ্বিজেন্দ্রলালের তিনি পুত্র এবং উনিশ শতকের প্রখ্যাত কালোয়াত দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্রের পৌত্র। তাঁর সাংগীতিক অভিজ্ঞতা স্বদেশে ও বিদেশে পরিব্যাপ্ত। সংগীতের তত্ত্ব আলোচনায় তিনি সমকালীন পৃথিবীর দুই প্রখ্যাত সংগীতবিদ্ রবীন্দ্রনাথ ও রোমা রল্যাঁর সঙ্গে বহু আলাপচারি করেছেন। সবচেয়ে বড় কথা তিনি নিজে রবীন্দ্রোত্তর কালের একজন সর্বস্বীকৃত কম্পোজার ও পারফরমার। তিনি দ্বিজেন্দ্রলাল, অতুলপ্রসাদ, নজরুল, হিমাংশু দত্ত ও নিশিকান্তের অগণিত গান স্বকণ্ঠে ও বিশিষ্ট গায়কী আরোপ করে গেয়ে জনপ্রিয় ও পুনর্জীবিত করে গেছেন। বাংলা গানে হিন্দুস্থানী গানের ঐতিহ্যবাহী তান সংযোগ করে এবং বিদেশী সুর

মাত্রেরই কর্তব্য আমাদের সঙ্গীতের প্রতি শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার চেষ্টা পাওয়া। কেননা একথা আমরা না বুঝলে আমাদের সঙ্গীতের মুক্তি নেই যে, আমাদের ললিতকলাটি আজ যে সম্প্রদায়ের একচেটে হয়ে পড়েছে তাঁদের দ্বারা আর যে ব্রহ্মেরই উপাসনা সম্ভব হোক না কেন, শব্দব্রহ্মের উপাসনা যে সুসাধ্য নয় এটা ধ্রুব।… মনে হয় যে, আমাদের ঠিক আগেকার যুগেও আজকের মতন দু-চারজন মুষ্টিমেয় গুণীই সত্য শিল্পের মন্দিরে প্রদীপটুকু জ্বালিয়ে রাখতেন। প্রবীণেরা হয়ত একথা অপ্রমাণ করবার জন্য ডজন দুই তিন সাত আট গজী কালোয়াতি নাম আওড়ে আমাদের নিরুত্তর করে দেবার প্রয়াস পাবেন।…যদি আমরা একটু নির্ভীকভাবে সে-যুগের মহাকালের ভুক্তাবশিষ্ট দু-একজন কালোয়াতের গান শুনতে যাই—যেমন ধরুন সঙ্গীত রত্নাকর বৈরম-কুলতিলক মহাধনুর্ধর আল্লাবন্দে খাঁর খাণ্ডারবাণী ধ্রুপদের হুহুংকার আলাপ। ইনি অনেকটা আইডিয়া দিতে পারেন, সে-যুগে কাদের ওস্তাদ বলে লোকে দূরে থেকে নমস্কার করেই পৃষ্ঠপ্রদর্শন করত।'

আসলে দিলীপকুমারের সংগীত চেতনা ও বোধ গড়ে উঠেছে নানা অভিজ্ঞতা ও ভ্রামণিকতার সূত্রে। তাঁর সংগীতবিষয়ক নানা মতামত ও ধারণা অনেকবার পরিবর্তিত হয়েছে এবং সে সবই নতুন অভিজ্ঞতাব অভিঘাতে। স্মৃতিচারণের ভঙ্গিতে তিনি লিখেছেন :

'আমাদের বাংলাদেশে তিনশ্রেণীর গায়ক বহুদিন থেমেই সমাদৃত : কীর্তন, বাউল ও বৈঠকী গান ওরফে ওস্তাদ বা কালোয়াৎ। পঞ্চাশ ষাট বৎসর আগে কীর্তন বাউল সচরাচর অবজ্ঞাত হ'ত, সম্মান পেতেন ওস্তাদ কালোয়াৎ—ধ্রুপদী ও সঙ্গীতজ্ঞ মহলে খেয়ালী। হিন্দি টপ্পা ঠুংরির তখনও প্রবর্তন হয়নি বাংলাদেশে।

কিন্তু পরে যখন বাংলায় হিন্দি-ঠুংরি গান অল্পস্বল্প চালু হয় তখন প্রথম-দিকে আমি ভেবেছিলাম যে এরই নাম নব সুরসৃষ্টি। সে সময়ে রবীন্দ্রনাথই আমার এ ভ্রম সংশোধন করেন, বুঝিযে বলেন—কেন হিন্দি ঠুংরি গায়ককে সুরকার উপাধি দেওয়া যায় না। তিনি বুঝিয়ে দেন যে, গানে সুরকার হতে হলে সে-গানের মধ্যে সবচেয়ে আগে থাকা চাই একটি বিশিষ্ট সুরস্বাতন্ত্র্য!

> আমাদের এ যুগের কীর্তনীয়ারাও সুরকার পদবী পেতে পারেন না—বাউলরা তো নয়ই—যেহেতু তারা পড়ে-পাওয়া সুর শিখেই গেয়ে বেড়াত গ্রামে। ওদিকে তানসেন, বৈজু বাওরা, গোপাল নায়ক প্রমুখ হিন্দি সুরকারদের ধ্রুপদ, সদারঙ্গ আধারঙ্গের খেয়াল, শোরীর টপ্পা তথা কদর পিয়া্র ঠুংরি রসে গায়কেরা নানা তানবিস্তার সৃষ্টি করলেও নতুন এমন কোনো 'বন্দেশ'-এর আমদানি করেননি যার গৌরবে তাঁরা 'সুরকার' শিরোপা দাবি করতে পারতেন। রামপ্রসাদী, ভাটিয়ালি, সারি প্রভৃতি গ্রাম্য গানের সুরও নিজের নিজের চলতি খাতেই বয়ে চলত—গানের জাতি ধর্মকেই ফুটিয়ে তুলে—সুর-বৈশিষ্ট্যকে নয়। সুরকার বলতে কী বোঝায় এবং তাঁর কৃতিত্ব ঠিক কোনখানে প্রথম বুঝতে শিখি আমরা দুজন প্রতিভাধরের সুরকারুর স্বাদে—রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলাল।

এইরকম গ্রহণ-বর্জনের মধ্যে দিয়ে দিলীপকুমারের সংগীত-প্রত্যয় গড়ে উঠেছে। তবু তাঁর মধ্যে ছিল অনমনীয় বহু সাংগীতিক ধারণা। গান রচনার অনেক রহস্য ও রূপায়ণ বিষয়ে ছিল অপরিবর্তনীয় মতামত। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর পত্র-বিতর্ক ও প্রত্যক্ষ আলাপচারি (যা তিনি স্মৃতি থেকে লিখে গেছেন) এ ব্যাপারে নির্ভুল সাক্ষ্য। তার সার সংকলন করলে তাঁর সংগীতচিন্তার মূল কথা ও প্রাতিস্বিকতা ধরা পড়বে। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর মতভেদ ঘটেছিল কয়েকটি বিষয়ে। যেমন :

> ১. তিনি রবীন্দ্রসংগীতের 'সুরে একটা অনড় রূপ বজায় রাখার বিরোধী' ছিলেন। তাঁর দাবি ছিল : রবীন্দ্রসংগীতে 'গায়ককে গানের সুরের variation করবার স্বাধীনতা দিতে হবে'।
>
> ২. তার কারণ : 'ভারতীয় গানের ধারায শিল্পী চিরকাল কম-বেশি স্বাধীনতা পেয়ে এসেছেন'।
>
> ৩. তাছাড়া কবিতার মতো গানেরও একটা আবেদন আছে। সেই আবেদন অনুযায়ী গায়ক যদি সুরবিহার করেন তাতে আপত্তি কোথায় ?

রবীন্দ্রনাথের অনবদ্য জবাব :

> 'তাই বলে কি বলতে চাও যে, আমার গান যার যেমন ইচ্ছা সে তেমনিভাবে গাইবে ?···হিন্দুস্থানী সংগীতকার, তাঁদের সুরের মধ্যেকার

ফাঁক গায়ক ভরিয়ে দেবে এটা যে চেয়েছিলেন। তাই কোনো দরবারী কানাড়ার খেয়াল সাদামাটাভাবে গেয়ে গেলে সেটা নেড়া-নেড়া না শুনিয়েই পারে না। কারণ, দরবারী কানাড়া তানালাপের সঙ্গেই গেয়, সাদা-মাটাভাবে গেয় নয়। কিন্তু আমার গানে তো আমি সেরকম ফাঁক রাখি নি যে, সেটা অপরে ভরিয়ে দেওয়াতে আমি কৃতজ্ঞ হয়ে উঠব।'

দিলীপকুমার এর জবাবে জানান : রবীন্দ্রসংগীতে তান দেওয়া অসমীচীন কিনা তা 'ফলেন পরিচীয়তে'। কেউ যদি রবীন্দ্রসংগীতে তানালাপ দিয়ে গেয়ে দেখিয়ে দেন তার সৌন্দর্য তবে 'আপনার সত্যের খাতিরে স্বীকার করে নিতেই হবে যে, হিন্দুস্থানী ও বাংলা গানের মধ্যে যে একটা অনপনেয় গণ্ডি আপনি টানতে চান' তা থাকবে না। অবশ্য এক্ষেত্রে প্রয়োগজ্ঞান আবশ্যিক।

গানের রূপায়ণ ব্যাপারে আসলে দিলীপকুমার ছিলেন হিন্দুস্থানী গানের পন্থী। তাই তাঁর ধারণা 'গানের মূল কাঠামোটা বজায় রেখে…ইচ্ছামত স্বর-বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে,' রবীন্দ্রনাথের গানকে 'একটা নূতন সৌন্দর্যে গরীয়ান করে তুলতে' পারা যায়। এ ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের আপত্তি জেনে তিনি মন্তব্য করেছেন : 'আপনি এতে করে বাজে শিল্পীব দ্বারা আপনার গানের caricature নিবারণ করতে পারবেন না' এবং 'মনে হয় না যে, আপনি শুধু ইচ্ছা করলেই আপনার মৌলিক সুর হুবহু বজায় থেকে যাবে।'

বস্তুত শেষ পর্যন্ত দিলীপকুমারের বক্তব্য ছিল যে, যেসব বাংলা গান সহজ সুরে রচিত ও গীতযোগ্য তা নিয়ে তাঁর কোনো বিতর্ক বা বক্তব্য নেই। সেগুলি সম্পর্কে তিনি গায়কের স্বাধীনতার দাবিদার নন। কিন্তু 'আমি কেবল বলি এই কথা যে, আর-এক শ্রেণীর বাংলা গান কেন সৃষ্টি করা অসম্ভব হবেই হবে যার মধ্যে হিন্দুস্থানী সংগীতের, সম্পূর্ণ না হোক, অনেকখানি সৌন্দর্য আমদানি করা চলবে? আমার সম্প্রতি অতুলপ্রসাদ সেনের কতকগুলি গান শুনে আরও বেশি করে মনে হয়েছে যে, এটা শুধু সম্ভব তাই নয়, এটা হবেই।'

এই তর্ক-বিতর্কের পরিণামে দিলীপকুমার স্বয়ং তাঁর নিজের গানে হিন্দুস্থানী গানের সৌন্দর্য আমদানি করতে থাকেন এবং নানা ধরনের বাংলা গান গাইবার সময় (এখানে উল্লেখযোগ্য যে, অতুলপ্রসাদের অনেক গানে তিনি Improvise করেছেন) তানের প্রয়োগ করেন। রবীন্দ্রসংগীতে সে অনুমতি মেলেনি বলেই আর কোনোদিন তিনি রবীন্দ্রসংগীত গাননি, প্রতিবাদ হিসাবে। এখানে লক্ষণীয় যে,

অন্যান্য বাঙালী সংগীত-তাত্ত্বিকদের সঙ্গে তাঁর বিরাট পার্থক্য। তিনি গান গেয়ে সেই অভিজ্ঞতা থেকে তত্ত্ব তৈরি করেছেন এবং তত্ত্ব তৈরি করে সেইমতো গান রচনা করেছেন বা গেয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে গানের ক্ষেত্রে কথা ও সুরের সমন্বয় বিষয়ে তাঁর একই রকম তর্ক হয়েছিল এবং তার পরিণামে বলেছিলেন :

> ১. আপনি যেমন সুরের পক্ষে কথাকে ছাড়িয়ে যাওয়াটা অপরাধ বলে মনে করেন, আমিও তেমনি কথার পক্ষে সুরকে দাবিয়ে রাখার দোষ দেখাতে চাই—এইমাত্র।
>
> ২. আমার মনে হয় আপনি গানে সুরের যতটা দাবি মানতে রাজি, আমি সুরকে তার চেয়ে বড়ো স্থান দিয়ে থাকি। এটা শুধু আমার তর্কের খাতিরে বলা নয়—এ নিয়ে আমি সত্য সত্যই যাকে বলে একস্‌পেরিমেণ্ট করতে করতে নিত্য নূতন আলো পাচ্ছি বলে মনে করি। কাজেই, আমার এই অনুভূতিকে কেমন করে অস্বীকাব করি ?

আমার উদ্ধৃত শেষ দুটি বাক্য পড়লে দিলীপকুমারের সংগীত সমালোচনার অভিনবত্ব ধরা পড়বে। তিনি তাঁর গান গাওয়ার অনুভূতিকে খুব বড় ভূমিকা দিয়েছিলেন তাঁর সাংগীতিক-প্রত্যভিজ্ঞা গঠনে। হয়ত তাঁর রচনাতেই রবীন্দ্র-পরবর্তী কালের আধুনিক গান একটা সত্যিকারের সৃজনবেগ ও সত্যমূর্তি নিয়ে আমাদের অনুপ্রাণিত করত ; কিন্তু ত্রিশ দশকের পর পণ্ডিচেরীতে তাঁর অকাল স্বেচ্ছানির্বাসন আমাদের গানকে উদ্দেশ্যহীন ভবিষ্যের দিকে ঠেলে দিল। তিনি চিরকালের জন্য মেনে নিলেন ভক্তিমার্গের নিশ্চিন্ত আশ্রয়। বাংলা গানেরও শুরু হল অনিশ্চিত-পথ পরিক্রমা।

এতক্ষণকার দীর্ঘ আলোচনায় আমরা বোঝাতে চেয়েছি, কোনো দেশের মৌলিক গীতিধারায় বিবর্তন ও অগ্রগতিতে খুব বড় ভূমিকা থাকে স্রষ্টাদের পাশাপাশি সমকালীন সংগীত-তাত্ত্বিকদের মৌলিক ও বিতর্কিত চিন্তাধারায়। রবীন্দ্রনাথ থেকে অতুলপ্রসাদ পর্যন্ত বাংলা গানের যে সবচেয়ে ফলবান ঐতিহ্য এদেশে গড়ে উঠেছিল তার ভিত্তিমূলে ছিল একটা জাতিগত আকাঙ্ক্ষা ও প্রস্তুতি। তৎকালীন সংগীত সমালোচকদের রচনায় রয়ে গেছে তার নিগূঢ় ইতিহাস এবং অন্তঃশীল নানা সমস্যা ও সমাধানের ইঙ্গিত।

# 'এ কি মধুর ছন্দ'

## দ্বিজেন্দ্রলালের গান

দিলীপকুমার রায় তাঁর পিতার স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে এক জায়গায় লিখেছেন, দ্বিজেন্দ্রলাল নাকি একদিন বলেছিলেন বাঙালী গীতরসিকরা তাঁকে বা রবীন্দ্রনাথকে কখনও ভুলে যাবে না। দ্বিজেন্দ্রলালের ভাষায় কথাগুলি এইরকম: 'না রে না, আমাকে কি রবিবাবুকে ভুলে যাবে না। আর কেন যাবে না জানিস?—এইজন্যে যে, আমরা রেখে যাচ্ছি যা বাঙালীর প্রাণের জিনিস—সুরে বাঁধা গান। আমি যে কী সব গান বেঁধে গেলাম সেদিন তুইও বুঝবিই বুঝবি।'

পঞ্চাশ বছর বয়সে যখন দ্বিজেন্দ্রলালের অকাল প্রয়াণ ঘটে তখন দিলীপকুমারের বয়স মাত্র সতেরো বছর। বাকি জীবনে দিলীপকুমার নিশ্চয়ই বুঝেছিলেন তাঁর পিতার সংগীত-নির্মাণের অনন্যতা ও সৃষ্টির ঐশ্বর্য। তার সম্প্রচার ও স্বরলিপি প্রণয়নেও তিনি ছিলেন যথাসম্ভব যত্নশীল। যথাসম্ভব, কেননা তাঁর সতেরো বছরের সংগীত-মেধায় কতটাই বা ধারণশক্তি ছিল। দ্বিজেন্দ্রলালের অন্যূন পাঁচশো গানের সুর ও প্রকরণ কি দিলীপকুমারের স্মৃতিধার্য থাকতে পারে? অন্যদিকে গানের রচনা বিষয়ে অনর্গল ও সোচ্ছ্বাস দ্বিজেন্দ্রলাল কিন্তু গানের সংরক্ষণ ও প্রচার বিষয়ে ছিলেন সম্বৃত ও উদাসী। তাঁর চারপাশের অনুরাগী ভক্তবৃন্দ এবং স্তাবকের দল যতটা রবীন্দ্র-বিদ্বেষে মশগুল ছিলেন ততটা দ্বিজেন্দ্র-প্রতিভার প্রতি অনুরক্ত ছিলেন না। এককথায় বলা যায় দ্বিজেন্দ্রলালের যদি থাকতো একজন দিনেন্দ্রনাথের মতো ভাণ্ডারী তবে দ্বিজেন্দ্রসংগীত আজকের এই কুণ্ঠিত ভূমিকার দীনতা মেনে নিত না।

দ্বিজেন্দ্রলালের গানের অনন্যতা আর তার আবশ্যিক সুর সংরক্ষণ সম্পর্কে খুব সচেতন ছিলেন গুণজ্ঞ প্রমথ চৌধুরী। দ্বিজেন্দ্রপ্রয়াণের দ্বিতীয় বার্ষিক স্মৃতি-সভায় তিনি তাই বলেছিলেন: 'আমার শেষ কথা এই যে, ৺দ্বিজেন্দ্রলালের সুরগুলির স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করতে পারলেই তাঁর যথার্থ স্মৃতিরক্ষা করা হবে। এ সকল সুরের বিশেষত্বের লোপ পাবার সম্ভাবনা খুব বেশী, কেননা সুর মুখে মুখে কথার চাইতেও বেশী বদলে যায়। ৺দ্বিজেন্দ্রলালের গানগুলি যদি আমরা অতি সত্বর

স্বরলিপিতে আবদ্ধ না করি, তাহলে অদূর ভবিষ্যতে সে সব সুর আমাদের চল্‌তি সুরেতে পরিণত হবে।'

এমন ভবিষ্যৎদর্শী ইঙ্গিত আজ আয়রনির মতো দ্বিজেন্দ্রলালের গানে জড়িয়ে গেছে। আমাদের স্মরণকালের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রসংগীতের সুর এতটাই বিকৃত হয়েছে, এতখানি চল্‌তি সুরে (যাকে বলে 'বন্যার সুর') বদলে গেছে যে তার মূলরূপ কেমন ছিল তা গবেষণার বিষয়। সে-গানে ভাষা ও শব্দবিকৃতিও ঘটেছে যথেচ্ছ। 'ধনধান্য পুষ্প ভরা' কথাগুলি এখন প্রায় সকলেই উচ্চারণ করেন 'ধনধান্যে পুষ্পেভরা' এইভাবে। গ্রামোফোন কোম্পানী ও আকাশবাণী দ্বিজেন্দ্রলালের গান একাধিক সুরে সম্প্রচার করেন এমন ঘটনা আমরা নিত্যই দেখি। তাঁর একই গান দু রকম সুরে ও ঢঙে গেয়ে দুজন প্রখ্যাত শিল্পী রেকর্ড প্রকাশ করেছেন এমন নমুনা দুষ্প্রাপ্য নয়। অর্থাৎ এই মুহূর্তে দ্বিজেন্দ্রলালের গান আমাদের সবচেয়ে অবহেলিত উত্তরাধিকার এবং সকরুণভাবে অভিভাবকত্বহীন। রবীন্দ্রসংগীতের তত্ত্বাবধানে আছে 'স্বরবিতান' ও বিশ্বভারতী মিউজিক বোর্ড, অতুলপ্রসাদের গানের অভিভাবক ব্রাহ্মসমাজ এবং স্বরলিপি 'কাকলি', রজনীকান্তের গানের প্রত্যক্ষ পরিচালক তাঁর সুযোগ্য দৌহিত্র। অথচ দ্বিজেন্দ্রলালের উদাসী স্বভাব যেমন তাঁর জীবিতকালে গান সংরক্ষণে তৎপর ছিল না, তেমনই তাঁর অকালপ্রয়াণের দুর্ভাগ্য এবং অকারণ রবীন্দ্রবিরোধিতার কালিমা একশ্রেণীর গীতরসিকের মনকে চিরকালের মতো তাঁর গান সম্পর্কে করেছে অনুৎসাহী। দিলীপকুমারের সন্ন্যাসগ্রহণ, পণ্ডিচেরী ও পুণায় প্রবাসী জীবনও দ্বিজেন্দ্রসংগীতের প্রার্থিত প্রতিষ্ঠাক্ষেত্রকে চঞ্চল করে দিয়েছে অনেকটাই। তাঁর গানে সুরবিকৃতি ও সুরের সাধারণীকরণ ঘটেছে দুই সূত্রে। রঙ্গমঞ্চে সাধারণ নটনটীদের অমার্জিত কণ্ঠপ্রয়োগে এবং অদীক্ষিত স্বৈরতায় আর স্বদেশী গানের সম্মেলক সুরমর্দনে। জনপ্রিয়তার স্বভাবই এই বিকৃতিকরণ। এখন যে কোনো বিদ্যালয়ে প্রারম্ভিক গান হিসাবে 'জনগণমন' গায়ন শুনলে একথা হৃদয়ঙ্গম হবে। দ্বিজেন্দ্রলালেব স্বদেশী গানগুলি এককালে এদেশে এতখানি জনপ্রিয় হয়েছিল যে তাতে সকল দেশানুরাগীর সুর ও অ-সুর কণ্ঠ সংযোজিত হয়ে আজ সেগুলির রূপ দাঁড়িয়েছে এক ধ্বস্ত উপসংহারে।

দ্বিজেন্দ্রলালের গান সম্পর্কে সামগ্রিক আলোচনায় তাই আজ প্রথমেই মনে পড়ে তাঁর দুর্ভাগ্যজড়িত জীবন এবং মরণোত্তর অখ্যাতির দায়ভাগের কথা। সে সব বিস্তারিতভাবে নানা রচনাতেই আছে। আপাতত আমাদের প্রয়াস হবে তাঁর সাংগীতিক জীবন উন্মোচন ও সংগীত-রচয়িতা হিসাবে মূল্যনির্ধারণ।

দ্বিজেন্দ্রলালের রক্তে ছিল গান। তাঁর পিতা দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র রায় ছিলেন উনিশ শতকের প্রখ্যাত কালোয়াত। রাগরাগিণীর জ্ঞান তাঁর ছিল খুব পাকা। তিনি ছিলেন সুকণ্ঠ গায়ক এবং গান রচনাতেও দক্ষ। পিতার সংগীত-সংস্কার দ্বিজেন্দ্রলালের চেতনায় সঞ্চারিত হয়েছিল। ছ'সাত বছর বয়সেই তিনি পিতার কণ্ঠে 'ক্যায়সে কাটে পেয়ালা মের নাগরী' গানটি শুনে নিজের চেষ্টায় হার্মোনিয়াম শিখে নেন। মাত্র ন'বছর বয়সে অগ্রজের ফরমায়েসে মৌলিক গান রচনার কৃতিত্ব দেখান। স্বভাববিষণ্ন এই কিশোরের গান শুনে রামতনু লাহিড়ী মন্তব্য করেন :

> এই অল্প বয়সে তোমার হৃদয়ে এমন কি বিষাদ বা দুঃখ থাকিতে পারে যাহাতে তোমার প্রায় প্রত্যেক গানেরই সুরে এমন বিষাদের ছায়া আসিয়া পড়ে ?

সন্দেহ কি যে এই বিষাদ, এই রোমান্টিক সন্তাপ দ্বিজেন্দ্রলালের অন্তর্গত গীতিস্বভাবেরই এক সামান্য লক্ষণ।

রবীন্দ্রনাথের চেয়ে দুই বছবের অনুজ দ্বিজেন্দ্রলাল ( ১৮৬৩—১৯১৩ ) স্বপ্রবর্তনায় গান লিখতে থাকেন খুব কিশোর বয়সে। তাঁর প্রথম গীতসংকলন 'আর্যগাথা প্রথম ভাগ' ( ১৮৮২ ) প্রকাশিত হয় তাঁর বিলাত যাত্রার আগে। এ-সংকলনে রয়েছে তাঁর বারো থেকে সতেরো বছরের মধ্যে লেখা একশো আটখানি গান। বিষয়, প্রধানত প্রকৃতি ঈশ্বর ও স্বদেশস্তুতি। গানগুলির ধরন যে অনেকটাই কবিতা-ঘেঁষা তা খুব সহজেই বোঝা যায়। ভবিষ্যতে যিনি বাংলাগানের ক্ষেত্রে উপহার দেবেন অসামান্য সব প্রেমের গান, তাঁর কিন্তু আর্যগাথার যুগে মনে হয়েছিল,

> যতদিন না দুঃখিনী মাতৃভুমির এই দুঃখ, দৈন্য ও হীনতা সম্পূর্ণ বিদূরিত হয় ততদিন ভারতবাসীর মুখে প্রেম-সঙ্গীত ভাল দেখায় না।

অচিরে এই স্বদেশপ্রেমী এদেশে তাঁর উচ্চশিক্ষা সাঙ্গ করে কৃষিবিদ্যা আয়ত্ত করতে স্টেট স্কলারশিপ নিয়ে রওনা হন ইংলণ্ড অভিমুখে ১৮৮৪ সালে এবং সেখানে তাঁর ভারতীয় মার্গসংগীত-লালিত জীবনে খুব বড় অভিঘাত আসে বিলিতি গানের সুর সংক্রামে। বিলিতি গানের প্রথম অভিজ্ঞতা তাঁর পক্ষে মনোরম হয়নি। সেকথা স্বীকার করে লিখেছেন :

> আমি সলজ্জে স্বীকার করি যে, এককালে আমারও ইংরাজী গানে বিশুদ্ধ ও আন্তরিক ঘৃণা ছিল। আমি যেদিন ইংলণ্ডের সর্বপ্রধান সঙ্গীত-রচয়িতার রচিত সর্বোত্তম oratoria শুনিতে টিকিট কিনিয়া 'আলবার্ট'

হলে প্রবেশ করিলাম ও গুটিকতক গান শুনিলাম সেদিন ইংরাজী সঙ্গীতের হীনত্ব ও অপদার্থত্ব আরও সম্যক হৃদয়ঙ্গম করিয়া গৃহাভিমুখে দ্রুতপদচারণ করিয়া, একেবারে শয়নকক্ষে উপনীত হইলাম এবং কেন যে লোকে পয়সা ব্যয় করিয়া এরূপ সঙ্গীত শোনে, ইহা পর্যালোচনা করিতে করিতে শয়ন করিয়া কতক শান্তি উপভোগ করিলাম।

কিন্তু কালক্রমে দ্বিজেন্দ্রলালের মনোভাব সম্পূর্ণ বদলে গেল। সেই কথা প্রসঙ্গে লিখেছেন :

ক্রমে বিলাত-প্রবাসে, নানা বন্ধুর নিকটে ছোটখাট ইংরাজী গান শুনিতে শুনিতে ভাবিলাম, "বাঃ, এ মন্দই বা কি ?" ক্রমে তাহার অনুরাগী হইয়া আরও শুনিতে চাহিতাম ; এবং শেষে আমার ইংরাজী গান শিখিবার প্রবৃত্তি হইল ও পয়সা দিয়া গান শিখিতে আরম্ভ করিলাম।

এখানে আমাদের মনে পড়ে, বাঙালী সুরকারদের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলালের গানই সবচেয়ে বেশি ও সার্থকভাবে বিলিতি সুরের ব্যবহার হয়েছে। রবীন্দ্রনাথও একটা পর্যায় পর্যন্ত তাঁর গানে বিলিতি সুরের প্রয়োগ করেছেন কিন্তু রবীন্দ্রসংগীতের সামগ্রিক নির্মিতিতে বিলিতি সুরের প্রভাব খুব নগণ্য। অথচ দ্বিজেন্দ্রলালের গানের স্বভাবধর্মে বিলিতি গানের ধরন একটা বিশেষ স্থান করে নিয়েছে। গিরিশচন্দ্র বসু ইংলণ্ডের সিসিস্টার কলেজে দ্বিজেন্দ্রলালের সহপাঠী ছিলেন। তিনি দ্বিজেন্দ্রলালের বিলিতি সংগীতের শিক্ষা সম্পর্কে জানান :

যাঁহার কাছে সেখানে তিনি গান শিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন সে রমণীটি তাঁহার নাকী সুরের সংস্কার ও ভরাট গলার চর্চা করার জন্য তাঁহাকে বহুবার বিশেষ অনুরোধ করিয়াছেন। সেই অনুরোধের পরিণামে, পরে যে কি ফল ফলিয়াছিল তাহা আজ বঙ্গবাসী কাহারও অজ্ঞাত নাই। যিনিই তাঁহার গান একবার শুনিয়াছেন তিনিই জানেন দ্বিজুর গলা কিরূপ ভরাট ছিল এবং পরে তাঁহার সুরের সঙ্গে নাকের আর অণুমাত্র সংস্রব ছিল না।

ইংলণ্ডপ্রবাসে দ্বিজেন্দ্রলাল শুধু বিলিতি গান শিখলেন না, আইরিশ ও স্কচ গানের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় হল। এরই প্রত্যক্ষ প্রভাবে তিনি ১৪টি ইংরাজি গান, ১৩টি স্কচ গান এবং ৭টি আইরিশ গান বাংলায় অনুবাদ করেন। অনুবাদগুলি আক্ষরিক। প্রসঙ্গত বলা দরকার দ্বিজেন্দ্র-অনূদিত অনেকগুলি স্কচ ও আইরিশ

গানের মূল রূপ রবীন্দ্রনাথকেও মুগ্ধ করেছিল, তবে রবীন্দ্রনাথ সেই গানের সুরে নতুন বাণী বসিয়েছিলেন।

১৮৮৬ সালে দ্বিজেন্দ্রলাল বিলাত থেকে ফিরে ১৮৮৭ সালের এপ্রিল মাসে সুরবালা দেবীকে বিবাহ করে সংসারী হন। যদিও বিদেশে একজন ইংরাজ নারীর সঙ্গে তাঁর প্রণয় হয় তবে শেষ পর্যন্ত তা পরিণয়ে সার্থকতা পায়নি। পত্নী হিসাবে সুরবালা দ্বিজেন্দ্রলালের স্বনির্বাচন। তাঁদের ষোলো বছরের অবিমিশ্র আনন্দের দাম্পত্যজীবন মূলত দ্বিজেন্দ্রলালের গান রচনার সবচেয়ে ফলবান সময়। ইতিমধ্যে ১৮৮৬ সালের ডিসেম্বর মাস থেকে শুরু হয়েছিল দ্বিজেন্দ্রলালের সরকারি চাকুরির (তাঁর ভাষায় 'দাস্য') বিড়ম্বনা, যার অবসান ঘটান তিনি ১৯১৩ সালে তাঁর মৃত্যুর তিন মাস আগে স্বেচ্ছা অবসর নিয়ে। প্রথম যৌবনে তাঁর বিলাত প্রবাসের অপরাধে নৈষ্ঠিক হিন্দুসমাজ তাঁকে একঘরে করেন। এই অবরোধ তাঁকে প্রতিবাদী করে তোলে। একদিকে ব্যঙ্গ প্রহসন লিখে আরেকদিকে হাসির গান রচনা করে তিনি সব্যসাচীর মতো স্রষ্টার আসনে বসলেন। দ্বিজেন্দ্রলালের সমাজ আর দেশকাল অনেকাংশে তাঁকে গীতিকার বানিয়েছে। অবশ্য তাঁর অন্তস্তলে স্ফুটনোন্মুখ ছিল এক অন্তঃশায়ী লিরিক গীতিকারের একান্ত সম্ভাবনা। সুখী প্রণয়ের শুশ্রূষা আর সরকারি বদলীর চাকরির খণ্ডিত প্রবাস-জীবনের মজলিশি পরিবেশ তাঁর চমৎকার প্রেমের আর নিসর্গের গানগুলি আদায় করে নিয়েছে। ইতিমধ্যে তাঁর গানের সংস্কার অনেকটাই হয়ে গেছে পরিমার্জিত। চাকরিসূত্রে তিনি ১৮৮৮ থেকে ১৮৯৩ সাল পর্যন্ত ছিলেন ভাগলপুর ও মুঙ্গেরে। সেখানে তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয় সেকালের বিখ্যাত খেয়াল গায়ক তাঁর আত্মীয় সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের। সুরেন্দ্রনাথ তাঁর বিস্তারধর্মী খেয়াল গানে টপ্পার অন্তর্দ্যুতি লাগিয়ে একরকম গীতি-প্রকরণ খুব চমৎকার গাইতেন। তাকে চল্‌তি কথায় বলে টপ্‌খেয়াল। দ্বিজেন্দ্রলালের অন্তর্মুখী প্রেমের ও বিষাদবেদনার গানগুলি গড়ে ওঠে এই টপ্‌ খেয়ালের রীতিতে। সেই দিক থেকে দ্বিজেন্দ্রলালের সংগীত জীবনে সুরেন্দ্রনাথের প্রভাব খুব সুদূরপ্রসারী। এ সম্পর্কে সত্যিকারের ভাষ্য পাওয়া যায় দিলীপকুমারের স্মৃতিচারণায় এই ভাষায়,

> ওস্তাদ গাওয়াইয়ার চেয়ে আমাদের কাছে ঢের বেশি আদরের ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ। তাঁর খেয়াল (বা টপ্‌ খেয়াল) ছিল এমন অদ্বিতীয় সৃষ্টি যে শুনলে চমকে যেতে হত। কবি হিন্দুস্থানী গানের মর্মে প্রবেশ করেন কৈশোরেই তাঁর পিতৃদেবের খেয়াল শুনে শুনে। কিন্তু তারপর তিনি

> খুব বেশি ভক্ত হয়ে উঠেছিলেন বিলিতি গানের। সুরেন্দ্রনাথই তাঁকে ঘরের ছেলে করে ঘরে ফিরিয়ে আনেন—অর্থাৎ ভারতীয় গানের নিজস্ব ক্ষেত্রে।

সংগীতের ক্ষেত্রে প্রকৃষ্ট আত্মপ্রকাশের ব্যাপারে এই সঠিক রূপবন্ধের নির্বাচন খুব জরুরী। রবীন্দ্রসংগীতের নিজস্ব চারতুকের বিন্যাস অথবা অতুলপ্রসাদের স্বক্ষেত্র ঠুংরি তাঁদের গীতিস্বভাবের উন্মোচনে সবচেয়ে কার্যকর হয়েছিল। তেমনই দ্বিজেন্দ্রলালের এই টপ্‌খেয়াল আর তার সঙ্গে বিলিতি সুরের মুভমেণ্ট মিলেমিশে একটা চমৎকার নির্মিতি। এই প্রকরণ তিনি পঁচিশ বছরের মধ্যেই আয়ত্ত এবং আত্মস্থ করে ফেলেছিলেন। কিন্তু তাঁর স্বাধীনচিত্ততা ও সাহসী স্বভাব ইংরাজ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে পদে পদে মনান্তর সৃষ্টি করে চাকুরিক্ষেত্রে। ফলে তাঁকে অনবরত বদলী করা হতে থাকে স্থানান্তরে। সেই বদলীর ঘনঘটা এবং চাকরিস্থলের দূরত্ব দেখবার মতো। যেমন মধ্যপ্রদেশ (১৮৮৬), মজঃফরপুর (১৮৮৭) মুঙ্গের ও ভাগলপুরের অন্তর্গত শ্রীনগর ও বনেলি এস্টেট (১৮৮৮-১৮৯৩), দিনাজপুর (১৮৯৩), বাঁকিপুর-পাটনা (১৮৯৪), ঢাকা (১৮৯৪-৯৫) কলকাতা (১৮৯৫-১৯০৫ মোট ৬টি পদে ৮ স্থানে), খুলনা (১৯০৫-৬) মুর্শিদাবাদ (১৯০৬), জেহানাবাদ (১৯০৭), গয়া (১৯০৭), ২৪ পরগণা (১৯০৯)। দ্বিজেন্দ্রলাল একটি চিঠিতে দেবকুমার রায়চৌধুরীকে লেখেন : 'ক্রমাগত transfer (বদলি) আমাকে যথার্থই যেন অস্থির করে তুলেছে'। এই অস্থিরতা যে তাঁর সৃষ্টিশীল জীবন তথা গান রচনার প্রশান্ত অবকাশকে বারে বারে বিপন্ন করেছে তাতে আর আশ্চর্য কি? দিলীপকুমার তাঁর পিতার সম্পর্কে লিখেছেন :

> 'তিনি সুগায়ক ছিলেন, কিন্তু ওস্তাদ ছিলেন না যেমন ছিলেন ঠাকুর্দা। শিখলে ওস্তাদ হতে পারতেন কিন্তু আশৈশব তাঁকে পড়াশুনোই বেশি করতে হয়েছিল, ফিরে এসে চাকরির হাড়ভাঙা খাটুনি।

তবু এই ভয়ানক স্থানান্তরের অভিশাপের মধ্যে তাঁর মজলিশি স্বভাব এবং উপভোগ্য দাম্পত্য জীবন দ্বিজেন্দ্রলালের মধ্যে এমন এক স্বয়ম্বশতা সৃষ্টি করেছিল যে তার টানে বহু বিচিত্র হাসির গান ও প্রণয়সংগীত রচনায় তাঁর ক্ষান্তি ছিল না। সেই সব গান নিয়ে তাঁর দ্বিতীয় গীতি সংকলন 'আর্যগাথা দ্বিতীয় ভাগ' (১৮৯৩) প্রকাশ পায় প্রথম ভাগের দশ বছর পরে। এ-সংকলনের অধিকাংশই প্রেমের গান। গানগুলি দুই পর্যায়ে সাজানো—'কুহু' আর 'পিউ'। পিউ-পর্যায়ে রয়েছে স্কচ, আইরিশ ও ইংরাজি গানের অনুবাদ। আর্যগাথার ভূমিকায় দ্বিজেন্দ্রলাল লেখেন,

'দশ বৎসরে আমার জীবনে যুগান্তর হইয়াছে।' গানের সুরের গভীরতা ও বিন্যাসের চাতুর্যে সেই যুগান্তর আভাসিত।

কিন্তু ইতিমধ্যে ভেতর ভেতর তৈরি হয়ে উঠছিলেন তিনি আরেক শস্ত্রে। কাপট্য শঠতা ঘেরা আমাদের সমাজের চালচলন, তার গোঁড়ামি আর সংস্কারান্ধতা, অন্যদিকে নকল সাহেবিয়ানা আর ইংরাজের গোলামি দেখে দেখে তাঁর অমল মনে গড়ে উঠছিল একটা প্রতিরোধের অঙ্গীকার। 'আষাঢ়ে' কাব্যে, নানা প্রহসন নাট্যে এবং প্রধানত হাসির গানে অনর্গলিত হলো সেই রোষ আর ক্ষোভ। সে-গান হাসাতে হাসাতে পিঠে চাবুক মারে। সেকালের আত্মচেতন মানুষ সেই গানে চমকে ওঠে। দ্বিজেন্দ্রলাল যেসব জায়গায় চাকরিসূত্রে বদলী হতেন সেখানেই বসতো হাসির গানের আসর। গায়ক ছিলেন তিনি নিজে। এমনই একাধিক হাসির গানের আসরে দ্বিজেন্দ্রলালের গান শুনে রজনীকান্ত সেন শুরু করেন হাসির গান রচনা। হাসির গান রচনায় দ্বিজেন্দ্রলাল বিলিতি গানের গায়কী এবং ভারতীয় রাগরাগিণী ব্যবহার করেছিলেন, এইখানেই ছিল নতুনত্ব। বিষয়ের লঘু চপলতা ঢেকে দেওয়া হয়েছিল সুরনির্মিতির গাম্ভীর্যে। আসরগুলিতে শেষ পর্যন্ত হাসির গান অবশ্য টেনে আনতো শোচনা। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় সে গান শুনে বলেন, 'এ তো হাসির গান নয় দ্বিজেন্দ্রবাবু, এ যে কান্নার গান'। স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'এ কি হাসির গান ? এ যে cruellest tragedy'।

হাসির গান সংকলিত হয়ে প্রকাশ পায় অনেক পরে ১৯০০ সালে। এদিকে সত্যি সত্যিই ঘনিয়ে আসছিল দ্বিজেন্দ্রলালের জীবনে সবচেয়ে সংকটময় সময়, তাঁর cruellest tragedy। ১৯০৩ সালে নিতান্তই আকস্মিকভাবে তাঁর ষোলো বছরের সস্মিত দাম্পত্যজীবন ভেঙে গেল স্ত্রীর মৃত্যুতে। তখন দ্বিজেন্দ্রলালের বয়স মাত্র চল্লিশ। কিন্তু জীবনের ভরকেন্দ্রই যেন টলে গেল। ছ'বছরের পুত্র দিলীপ আর পাঁচ বছরের কন্যা মায়াকে নিয়ে চিরউদাসী দ্বিজেন্দ্রলাল নিমজ্জিত হলেন এক অতলান্ত সাংসারিকতায়, যেখানে তিনি ছিলেন সবচেয়ে বেমানান। কল্যাণী গৃহিণীর অভাব তাঁর সৃষ্টিশীল জীবনে পালা বদল ঘটিয়ে দিল। শুকিয়ে গেল তাঁর স্বতঃস্ফূর্ত হাসির গানের উৎস। প্রেমের গানেও রইল না সেই আবেগমত্ততা। এই সময় তাঁর জীবনে যে-শূন্যতা ঘনিয়ে ওঠে তা আর কখনও ভরেনি। ১৯০৬ সালে মাত্র তেতাল্লিশ বছরে লেখা তাঁর চিঠিতে কী শ্রান্তি! সেখানে লেখেন—

> মাঝে মাঝে মনে হয় যে, আমার জীবনের উজ্জ্বল অধ্যায় শেষ হয়ে গিয়েছে। এখন এ জীবন কেবল ধারণ করা মাত্র।

১৯০৭ সালে লিখছেন,

> আপন মনের দিকে চেয়ে দেখি সেখানে এ সংসারের উপরে অবিমিশ্র বিতৃষ্ণা ছাড়া আর তো কিছুই খুঁজে পাই না। আসক্তি বা ভোগলিপ্সা তিলার্দ্ধ নাই। তবে, কেন—কিসের জন্য এই পুঞ্জীভূত বিড়ম্বনা নিরন্তর ভোগ করে মরি?

১৯০৬ সাল থেকে গয়া প্রবাসকালে দ্বিজেন্দ্রলালের জীবনে শূন্যতা ভরাতে দুটি অবলম্বন এসে যায়। একদিকে ব্যক্তিগত ক্লান্তিমোচনে তিনি হয়ে পড়েন সুরাসক্ত, আরেকদিকে আসে ঐতিহাসিক ও স্বাদেশিক নাটক লেখায় টান। ইতিমধ্যে ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন সারাদেশে নতুন করে জাগিয়ে দেয় আমাদের দেশাত্মবোধ। কলকাতার রঙ্গমঞ্চ উত্তাল হয়ে ওঠে দ্বিজেন্দ্রলালের ঐতিহাসিক ও জাতীয়তাবাদী নাটকের আবেগে। তিনি পরপর লেখেন প্রতাপ সিংহ ( ১৯০৫ ), দুর্গাদাস ( ১৯০৬ ), নূরজাহান ( ১৯০৮ ), মেবার পতন ( ১৯০৮ ), সাজাহান ( ১৯০৯ ) ও চন্দ্রগুপ্ত ( ১৯১১ )। এ সব নাটকে তাঁর অসামান্য স্বদেশী গানগুলি সংযোজিত হয়ে এক নতুন মাত্রা আনে। বিশ্বাসের ওজস্বিতা, ভাবের গাঢ়তা এবং সুরের গূঢ় বিন্যাস তাঁর স্বদেশী গানে এক চমৎকৃতি সৃষ্টি করল। বাঙালী লাভ করল এক নতুন গানের উত্তরাধিকার। কিন্তু তবু আত্মিক অবক্ষয় আর সদাসঙ্গী বিষাদ দ্বিজেন্দ্রলালকে টানতে থাকে মাদকের অনিবার্য আকর্ষণে। আত্মপক্ষ নিয়ে তিনি বন্ধুকে চিঠিতে লেখেন,

> তোমাদের স্ত্রী আছেন, সংসারে অন্যান্য নানারূপ আশ্রয় অবলম্বন আছে; কিন্তু আমার তার কোনটাই নাই, কিছুই নাই। এই জন্য, ভয়ানক ঔদাস্য ও অবসাদ আসিয়া যখন আমার দেহ-মনকে অভিভূত করিয়া, জড়াইয়া ধরে তখন—In order to shake off that lethargy, dullness and depression আমার একটু একটু পান করা দরকার বোধ করি। ওটা যে আমার পক্ষে শুধু একটা support and strength (সহায় ও বল) তা নয়, Necessityও (প্রয়োজনও) বটে।

শেষ দশ বছরে ( ১৯০৩—১৯১৩ ) পত্নীবিরহিত দ্বিজেন্দ্রলালের যে-ভগ্ন বিগ্রহ আমরা দেখি তা বেদনায় ভারাক্রান্ত, বিষাদে পরিম্লান। এরই মধ্যে গয়াপ্রবাসে তাঁর মধ্যে ঝলকে ওঠে স্বদেশী গান লেখার উন্মাদনা। সে সময়ে একবার গয়ায় বেড়াতে যান জগদীশচন্দ্র বসু। দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁকে গেয়ে শোনান 'মেবার পাহাড়' গানটি। শুনে জগদীশ বলেন,

আপনার এ গানে আমরা কবিত্ব উপভোগ করিতে পারি, কিন্তু যদি আমি মেবারের লোক হতেম তাহলে আমার প্রাণ দিয়ে আগুন ছুটত। তাই আপনাকে অনুরোধ করি আপনি এমন একটি গান লিখুন যাতে বাঙ্গালার বিষয় ও ঘটনা—বাঙ্গালীর বিষয় ও ঘটনা থাকে।

এই অনুরোধের অল্পদিন পরেই, দেবকুমার রায়চৌধুরীর বিবরণে জানা যায়, এক দুপুরে আহারান্তে হঠাৎ দ্বিজেন্দ্রলাল প্রেরিত হন এক তাৎক্ষণিক রচনার আবেগে। তিনি বলেন,

> দেখ, আমার মাথার মধ্যে একটা গানের কয়েকটা লাইন আসিয়া ভারি জ্বালাতন করিতেছে। তুমি একটু বোসো ভাই,—আমি সেগুলো গেঁথে নিয়ে আসি। আধ ঘণ্টার মধ্যে রচিত হয় বিখ্যাত গান 'বঙ্গ আমার জননী আমার'। গান তাঁকে এতটাই উজ্জীবিত করতে পারত যে ঐ তীব্র হতাশার জীবনেও তিনি আর কিছু না বলিয়া, হাততালি দিতে-দিতে, সারাটা ঘরময় ঘুরিয়া-ঘুরিয়া, নাচিয়া-নাচিয়া, আবার গাহিতে লাগিলেন—
>
> কিসের দুঃখ কিসের দৈন্য কিসের লজ্জা কিসের ক্লেশ?
> সপ্ত কোটি মিলিত কণ্ঠে ডাকে যখন আমার দেশ?

দ্বিজেন্দ্রলালের অন্যতম জীবনীকার নবকৃষ্ণ ঘোষ অনুমান করেছেন এই গান দ্বিজেন্দ্রলালের জীবনে নিয়তির মতো এসেছিল। কেননা এই গান গাইতে গেলেই দ্বিজেন্দ্রলাল আত্মসংযম হারাতেন। আক্রান্ত হতেন উচ্চ রক্তচাপে।

> এই গীতটি গায়িতে গায়িতে একদিন স্যার কৈলাসচন্দ্র বসু মহাশয়ের বাটীতে দ্বিজেন্দ্রের মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য হয়, আর একদিন ইভনিং ক্লাবে এই গানটি শিক্ষা দিবার সময়, পরে পুনরায় একদিন ঝামাপুকুরে তদীয় মিত্র শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের ভবনে ঐ গানটি গায়িতে গিয়া দ্বিজেন্দ্রের মস্তিষ্কে শোণিতাধিক্য হয় এবং প্রতিবারই তাঁর সংজ্ঞাশূন্য হইবার উপক্রম হয়। ইহাই দ্বিজেন্দ্রর প্রাণান্তকারী সন্ন্যাস রোগের সূত্রপাত।

দ্বিজেন্দ্রলাল নিজে এই গান সম্পর্কে মন্তব্য করেন, 'ও গানটা গায়িতে গেলে আমার কেন জানি না, ভয়ানক মাথা গরম হয়ে উঠে।'

স্বদেশী গান তবে এতটাই ছিল তাঁর জীবন সম্পৃক্ত? শেষ জীবনে অবশ্য দ্বিজেন্দ্রলালের সবচেয়ে আকর্ষণ ছিল নাটক রচনায়। নাটক ও রঙ্গমঞ্চের তো একটা

আলাদা মাদকতা আছে। তাছাড়া অভিনেত্রীদের সঙ্গে তাঁর সংস্পর্শের একটা বিতর্কিত প্রসঙ্গও শোনা যায়। তিনি নিজে অবশ্য পরিহাস করে লিখেছিলেন, 'অ্যাকট্রেসদের কটাক্ষবাণ সদাই নাকের কাছাকাছি / তবু তো বেঁচে আছি।'

যাইহোক শেষ দশ বছরে দ্বিজেন্দ্রগীতির সবচেয়ে বড় আশ্রয় ছিলেন বাংলা রঙ্গমঞ্চের নটনটীরা। তাঁর গান এঁদের কণ্ঠেই রূপ পেয়েছিল। তাই, মঞ্চের প্রয়োজনেই, দ্বিজেন্দ্রলালের অনেক গান বিন্যাসে খুব নাটকীয় এবং স্বগতোক্তির মতো। বহুশই তাতে আছে নৃত্যের চটুল ছন্দ ও ভাবের তরলীকৃত আবেগ বহুলতা। কে না বলবেন যে তাঁর গীতি প্রতিভা চূড়ান্ত অপব্যয়িত হয়েছে এই রঙ্গমঞ্চে? সকলেই মানবেন মঞ্চে তাঁর গান রূপায়ণে কখনই সুবিচার হয়নি। তাঁর বেশিরভাগ গানই যে নারীর জবানীতে তার কারণ সেগুলি নাটকের নারীচরিত্রের কথা ভেবে লেখা। তাঁর পাঁচশো গানের মধ্যে নাটকে বহুল ব্যবহৃত গানের সংখ্যা আড়াই শো। তবু রঙ্গমঞ্চকে আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাতে হয়। রঙ্গমঞ্চের উন্মাদনা ছাড়া বিষাদ ভারগ্রস্ত উত্তর-চল্লিশ দ্বিজেন্দ্রলাল আর কি অন্য কোনো প্রেরণায় গান লিখতেন?

দেবকুমার রায়চৌধুরীর 'দ্বিজেন্দ্রলাল' বইটি পড়লে জানা যায়, নিছক আত্ম-প্রেরণার বাইরে কোনো উত্তেজক ঘটনা বা অন্যের প্ররোচনাতেও দ্বিজেন্দ্রলাল অনেক গান লিখেছিলেন। তাঁর গান রচনার পদ্ধতি সম্পর্কে প্রমথ চৌধুরী ঠিকই অনুমান করেছেন যে, প্রথমে তাঁর মনে আসত একটা সুরের ছক, বাণী জুড়তেন পরে। যাকে বলে কথা ও সুরের যুগল সম্মিলিত মূর্তি তা দ্বিজেন্দ্রলালের গানে ঐ জন্যই কম। অনেক ক্ষেত্রে তাঁর গান একটা সুরের ও তালের ডিজাইনে বাঁধা। 'এ কী মধুর ছন্দ' বা 'আজি গাও মহাগীত মহা আনন্দে' শুনলে কথাটা স্পষ্ট হয়।

দ্বিজেন্দ্রলাল কত অনায়াসে গান লিখতে পারতেন তার দুটি উদাহরণ এখানে উল্লেখ করা যায়। তাঁর অন্তরঙ্গ সুহৃদ অধরচন্দ্র মজুমদার প্রসঙ্গে নবকৃষ্ণ ঘোষ লেখেন,

> সাজাহান নাটকে একটি জায়গা বাদ রাখা ছিল। একদিন কথায় কথায় দ্বিজেন্দ্র অধরবাবুকে জিজ্ঞাসা করেন: 'এখানে একটা কি গান দেওয়া যায় বলুন দেখি?' অধরবাবু স্থান কাল পাত্র দেখিয়া বলিলেন—'একটি রাত্রির বর্ণনা দিন না।' দ্বিজেন্দ্র তৎক্ষণাৎ—'আজি এসেছি আজি এসেছি বঁধু হে' লিখে ঐ স্থানে বসাইলেন।

এছাড়া ১৮৮৮ থেকে ১৮৯৩ সালের মধ্যে ভাগলপুর-মুঙ্গেরে নববিবাহিত জীবন

যাপনের অবকাশে পত্নী সান্নিধ্যে ও দাম্পত্য মাধুর্যে অনেক প্রেমের গান লেখেন তাৎক্ষণিক আবেগে। তার সব অনুপুঙ্খ আজ দুষ্প্রাপ্য। তবে ১৮৮৬ সালে সদ্য বিবাহিত দ্বিজেন্দ্রলালের একটি প্রখ্যাত প্রণয় সংগীতের রচনার উপলক্ষ জানা গেছে। তখন তিনি মেদিনীপুরের সুজামুঠা পরগণার সেটেলমেণ্ট অফিসার। বয়স তেইশ। পত্নী সুরবালার বয়স এগারো। কাজলাদিঘির ধারে একটি বকুল গাছের প্রাঙ্গনে ছিল তাঁদের বাসা। সকালে দ্বিজেন্দ্রলাল কাজে বেরোতেন আর সারাদিন কিশোরী বধূ সুরবালা বকুলতলায় দিনযাপন করতেন। একদিন সারা সকাল ধরে বহু প্রযত্নে অবচয়িত বকুল ফুলের মালা গেঁথে সুরবালা অপেক্ষাতুর ছিলেন। কর্মস্থল থেকে ফেরা মাত্রই কিশোরী বধূ তাঁকে মালাটি পরিয়ে দেন। প্রাপ্তির এই অপ্রত্যাশিত আকস্মিকতা ও মাধুর্য দ্বিজেন্দ্রলালের মনে সাড়া তোলে। তিনি তৎক্ষণাৎ লিখে ফেলেন :

আমি সারা সকালটি বসে বসে
এই সাধের মালাটি গেঁথেছি।

পত্নী বিয়োগের আগে দ্বিজেন্দ্রলাল ছিলেন পুরোদস্তব একজন আমুদে লোক। নানা উপলক্ষ গড়ে নিয়ে তিনি নাচ গান আনন্দ উচ্ছ্বাসে মত্ত হতে পারতেন ; তাঁব মধ্যে এতটাই প্রাণশক্তি ছিল। তাঁর বড় শ্যালকের পত্নী স্মৃতিচারণ করে বলেছেন :

> কখনো হঠাৎ নাচের সাধ হল। আমরা সব দোর বন্ধ করে দিলাম। আমার তিন চারটি ননদ, গিরিশদা ও দ্বিজদার ঘোমটা পরে নৃত্য। সে চোখে না দেখলে বিশ্বাস হয় না।

এখানে ধরা রয়েছে আনন্দময় কৌতুকপরায়ণ দ্বিজেন্দ্রলালের বিগ্রহ, যিনি শ্বশুরগৃহে ভায়রাভাই ও শ্যালিকাদের নিয়ে সগুণ্টন নৃত্য করতেন। এমন স্বতোচ্ছল মানুষটি একেবারে বদলে যান স্ত্রী বিয়োগে। দিলীপকুমার ধরে রেখেছেন সেই উদাসী দ্বিজেন্দ্রলালের বর্ণনা এইভাবে,

> কবি শেষ বয়সে সাহেবিয়ানা ছেড়ে একেবারে বৈষ্ণব বনে গিয়েছিলেন। সে ফিটফাট ধোপদুরস্ত বেশভূষা ছিল না। খালি গায়েই বারান্দায় বেড়াতেন গুন্ গুন্ করে গান বাঁধতে বাঁধতে।...এমনি সময়ে হয়ত বা খালি পায়েই, চলে গেলেন সটাং বড় মামিমার কাছে : বৌ একটা কী চমৎকার গানই বেঁধেছি—শেখো শেখো।

দ্বিজেন্দ্রলালের সংগীত জীবন শেষ পর্বে হয়ে ওঠে নিতান্ত আত্মমুখী ও সম্বৃত। গানের থিমে এসে যায় প্রেম-হাসি-নাটক-নিসর্গ সব পেরিয়ে এক গভীর বৈরাগ্যের

আত্মসমর্পণ। অহেতুক ভক্তির লীলা। প্রথম যৌবনের তার্কিক নাস্তিক কেতাদুরস্ত বিলেত ফেরত ডি. এল. রায় শেষ বয়সে হয়ে পড়েন পরম বৈষ্ণব উদাসীন। যিনি প্রথম যৌবনে তাঁর 'Lyrics of Ind' কাব্যে বিজ্ঞানের জয় ঘোষণা করে লিখেছিলেন :

We, armed with love, in justice armoured
Defy the hell-fire, plague and dearth
While Science triumphs, Beauty blazes
We all can make a heaven on earth.

তিনি শেষ বয়সে লিখলেন :

পরিহরি ভবসুখ-দুঃখ যখন মা আমি শায়িত অন্তিম শয়নে,
বরিষ শ্রবণে তব জল কলরব বরিষ সুপ্তি মম নয়নে।
বরিষ শান্তি মম শঙ্কিত প্রাণে, বরিষ অমৃত মম অঙ্গে
মা ভাগীরথী, জাহ্নবি, সুরধুনি, কলকল্লোলিনী গঙ্গে।
পতিতোদ্ধারিণি গঙ্গে!

খুবই বিস্ময়কর নয় কি এই পরিক্রমা? নিসর্গ ধ্যান থেকে স্বদেশ গরিমা, হাসির গানের বিদ্রূপ থেকে আনত মধুর প্রেমসংগীত, নাট্যোচ্ছল তরল গীতিময়তা থেকে গভীর ভক্তিতে এমন অবগাহন? দ্বিজেন্দ্রলালের গান প্রগাঢ় ভাবে আত্মজৈবনিক। তাঁর সমগ্র জীবনের পটে এই গান কী গভীর দ্যোতনা আনে, যখন শুনি :

সুখের কথা বোলো না আর, বুঝেছি সুখ কেবল ফাঁকি,
দুঃখে আছি, আছি ভাল, দুঃখেই আমি ভাল থাকি।

এ-গান শুনতে শুনতে হয়ত সকরুণ নির্বেদে আমাদের মনে পড়ে তাঁর আকস্মিকভাবে ধ্বস্ত দাম্পত্যের কথা। সে বেদনা গাঢ়তর হয় এই উচ্চারণে :

শুধু দুদিনেরই খেলা ॥
ঘুম না ভাঙিতে আঁখি না মেলিতে
দেখিতে দেখিতে ফুরায় বেলা ॥

পত্নী-প্রণয়হীন ক্ষোভ জর্জর তাঁর অভিমানী মনই কি একথা লেখেনি যে :

আমি অপর কাহার জীবন যাপন
করি যেন এসে বসুধায়—
আমি বেঁচে আছি—নাহি জানি কি কারণ
—জীবন শুধুই জীবনধারণ ;

অথচ এমনটি তো হবার কথা ছিল না। তাঁর ইচ্ছা ছিল 'আলোর মতন হাসির মতন কুসুম গন্ধ রাশির মতন, হাওয়ার মতন নেশার মতন ঢেউয়ের মতন' ভেসে যাওয়ার। ইচ্ছা ছিল মলয় বাতাসে ভেসে গিয়ে কুসুমের মধু পান করায়। এমন কি এতদূর যে,

বাষ্পের সনে আকাশে উঠিব
বৃষ্টির সনে ধরায় লুটিব,
সিন্ধুর সনে সাগরে ছুটিব
ঝঞ্ঝার সনে গাহিব গান।

কিন্তু প্রতারক জীবনের সুখ-স্বপ্ন ক্ষণিকের জন্য এসে সরে যায়। 'যেন কোন্ মায়াসরসী, ছুঁতে না ছুঁতে শুকালো'। এই রিক্ত নিঃস্বজীবনে মৃত্যুই হয়ে দাঁড়ায় একমাত্র সান্ত্বনা ও স্বস্তি। তাই যে-রাতে নীল আকাশের অসীম ছেয়ে চন্দ্রকিরণ পরিপ্লাবিত, সেই মদির রাতে তাঁর মনে হয় :

বুক এগিয়ে আসে মরণ মায়ের মত ভালবেসে
আজকে যদি মরতে না পাই তবে আমার মরণ ভাল।

শেষ আকুতিতে তাঁর পরম প্রার্থনা বড় অন্তর্ভেদী, কেননা অসহায়ভাবে তাঁকে বলতে শুনি :

আজি বড়ই শ্রান্ত আমি ও মা কোলে তুলে না
যেখানে ঐ অসীম শাদায় মিশেছে আজ অসীম কালো॥

গানে যেমন তাঁর ব্যক্তিগত বেদনার ছাপ লেগেছে তেমনই আনন্দ প্রেম প্রণয় স্মৃতির আভাসও কম নেই। আর্যগাথা দ্বিতীয় খণ্ডে তাঁর মধুর দাম্পত্য জীবনের আলেখ্য অনেক গানের ফ্রেমে বাঁধা পড়েছে। যেমন :

( ছিল ) বসি সে কুসুম কাননে।
( আর ) অমল অরুণ উজল আভা ভাসিতেছিল সে-আননে।
( ছিল ) এলায়ে সে কেশরাশি ( ছায়াসম হে )
( ছিল ) ললাটে দিব্য আলোক শান্তি অতুল গরিমা ভাসি'।
( তার ) কপোলে সরম নয়নে প্রণয় অধরে মধুর হাসি।

এখানে কী অভ্রান্তভাবে সুরবালা দেবীর ভাবকান্তি ধরা পড়েনি? আবার সেই ছায়াচ্ছন্ন সুখী যৌবনের তৃপ্ত দিনযাপনে হঠাৎ নিষ্কপট দ্বিজেন্দ্রলালের কি মনে পড়ে যায় বিদেশিনীর প্রতি তাঁর প্রণয়ের স্মৃতি? সেই টানেই বোধহয় লেখেন :

আজি তোমার কাছে ভাসিয়া যায় অন্তর আমার
আজি সহসা নয়নে কেন ঝরিল এ বারিধার ?
স্মৃতি জোয়ার দুকূল ছেয়ে
দশ বরষ উজান বেয়ে
আজি চলেছে প্রাণ তোমার কাছে মানে না বাধা আর।
আজি আমার কাছে বর্তমান ভেঙে ও ভেসে যায়
আজি আমার কাছে অতীত হয় নূতন পুনরায়।

দশ বরষের উজান ঠেলে বর্তমানের সবকিছু ভেঙে ও ভাসিয়ে এই যে অতীত প্রণয়ের রোমাঞ্চ স্মরণ, তার আবেগ ও বেদনা এত সৎ ও জীবনতপ্ত যে গানের অন্তরালে গোটা মানুষটাকেই দেখা যায়। বর্তমানের প্রাপ্তি যাকে অতীত-ভিখারি না করে পারে না। অথচ বর্তমান দাম্পত্য প্রণয়ের বন্ধনটুকুও কম আকর্ষণীয় বা উপভোগ্য নয়। তাই আরেক গানে তিনি সে কথাও মানেন যে :

তুমি বাঁধিয়ে কি দিয়ে রেখেছ হৃদি এ, পারি না যেতে ছাড়ায়ে !
এ কি বিচিত্র নিগূঢ় নিগড় মধুর—প্রিয়বাঞ্ছিত কারা এ ?

এক দিক থেকে তাই মনে হয়, দ্বিজেন্দ্রলালের গান তাঁর সবচেয়ে অকপট আত্মবিবৃতি। রবীন্দ্রনাথ ছোটখাট ঘটনাকে উপলক্ষ করে গান শুরু করতেন, অচিরে তা নির্বিশেষ গানে রূপ নিত সাময়িকতাকে অতিক্রম করে। দ্বিজেন্দ্রলালের গানের উৎস যাই হোক তার বর্ণনে ও আবেগে শেষ পর্যন্ত তাতে লেগে থাকে জীবনের কবোষ্ণ সংরাগ। স্বপ্ন দিয়ে তৈরি, স্মৃতি দিয়ে ঘেরা তাঁর গান।

## ২

দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর জীবিতকালে নিজের গানগুলিকে নানা বিষয় বিন্যাসে সাজিয়ে যাননি, যেমন করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ বা অতুলপ্রসাদ। তাঁর গীত সংকলন প্রকাশ পায় ১৯১৫ সালে, মৃত্যুর দু'বছর পরে, মোটামুটি দুশো তিরিশখানি গানের সমষ্টি নিয়ে। এর বাইরে থেকে যায় আর্যগাথার গান ও হাসির গান। অবশ্য তাঁর কোনো গীতি সংকলন অবিমিশ্র নয়। 'গান' বইটিতে আর্যগাথার গান আছে। তাঁর অনেক গান স্বতন্ত্র স্বভাবে যেমন সংকলিত আছে, তেমনই তাদের পাওয়া যাবে বিভিন্ন নাটকে। তার কারণ, নাটকের প্রয়োজনে অনেক তাৎক্ষণিক গান যেমন তিনি লিখেছিলেন তেমনই তাঁর অনেক পুরনো গান নতুন করে জুড়ে দিয়েছেন নাটকে—অনেক সময় ঘষে মেজে, কখনও কখনও সরাসরি। এখন

দ্বিজেন্দ্রলালের যত গান আমরা পাই তা বিষয় বিন্যস্ত নয়। তবু সাধারণভাবে প্রেম নিসর্গ স্বদেশ বিচিত্র ও হাসির গান এইভাবে গানগুলিকে সাজিয়ে নেওয়া যায়। এর মধ্যে তাঁর স্বদেশবিষয়ক গান ও হাসির গান সবচেয়ে জনপ্রিয় হয়েছিল। হাসির গানের রূপায়ণ তিনি নিজে নিপুণ দক্ষতায় করতেন। কিন্তু বিলিতি গানের নানা স্কেলে ফেলে তাঁর হাসির গানে যে সব 'হা হা হা' হাসির ধ্বনির দুরূহ সুরের পরীক্ষা আছে তা আজ আর গাইবে কে? গলার সেই বিদেশী পরিমার্জনা কার আছে? একথা সকরুণ সত্য যে, দিলীপকুমারের প্রয়াণের পর দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গান হয়ে গেছে এক বিখ্যাত কিংবদন্তী। গায়নের মধ্যে দিয়ে তার প্রাণপ্রতিষ্ঠা আজ অসম্ভব। দ্বিজেন্দ্রগীতির অন্তত পঁচাত্তর শতাংশ সুর অবলুপ্ত। আর স্বদেশী গানের ক্ষেত্রে সুরবিকৃতি খুবই ঘটেছে।

তাঁর অন্যান্য গানের মধ্যে যতগুলি দিলীপকুমার স্বরলিপিবদ্ধ করেছেন ততগুলি হয়ত কিছুটা রক্ষা পাবে কিন্তু বাকি অজস্র সংখ্যক গান এই মুহূর্তে অভিভাবকত্বের অভাবে অসহায়। দ্বিজেন্দ্রলাল সম্পর্কে আমাদের অচেতনতা কতদূর সকরুণ তার একটা নমুনা এখানে দেওয়া যেতে পারে। শেষ জীবনে তাঁর লেখা একটি ভক্তিসংগীত হল 'চরণ ধরে আছি পড়ে একবার চেয়ে দেখিস্ না মা'। এ গান খুব বিখ্যাত। দিলীপকুমার গানটি রেকর্ডে গেয়েছন এবং প্রত্যেক দ্বিজেন্দ্রগীতি সংকলনে গানটি পাওয়া যায়। সুরও অনেকেই জানেন। তবু 'আকাশবাণী' তাঁদের প্রভাতী সংগীতাঞ্জলি অনুষ্ঠানে ঐ গানটি প্রচার করেন জনৈক অঞ্জলি সুর নামক গায়িকার কণ্ঠে এবং ভিন্ন সুরে। তার চেয়েও আশ্চর্য, এই গানটিই একটি রেকর্ড কোম্পানী বার করেছেন জনৈক হীরালাল সরখেলের কণ্ঠে। এ গানের রেকর্ড-লেবেলে সুরকারের নাম অন্য একজনের এবং গানের রচয়িতা বিষয়ে লেখা আছে 'অজ্ঞাত'। দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর একটি গানে এই দেশে জন্মে এই দেশেই মরণের ইচ্ছা ব্যক্ত করেছিলেন। কিন্তু তখন কি তিনি জানতেন যে এই দেশের মানুষই তাঁকে, তাঁর সৃষ্টিকে ধ্বংস করবে এইভাবে? এইসব দেখেই মনে হয় দ্বিজেন্দ্রলালের গান আমাদের দেশে সব চেয়ে হেলাফেলার সামগ্রী। নিঃসঙ্গ দুয়েকজন অনুরাগী বা অনুরাগিণী নিষ্ঠার সঙ্গে তাঁর গান গেয়ে চলেছেন সভা সমিতি, আকাশবাণী, দূরদর্শন ও রেকর্ডে। তাঁর নামে নেই কোনো প্রতিষ্ঠান বা আকাদেমি। তাঁর গানের নেই কোনো নির্ভরযোগ্য সংকলন। তাঁর বেশিরভাগ গানের সুর সংরক্ষিত হয়নি।

এই সুর সংরক্ষণ না-হওয়ার অপরাধ খুব গুরুতর, কেননা দ্বিজেন্দ্রলাল মূলত

সুরকার বা কম্পোজার। তাঁর গান খুব নিরপেক্ষ ভাবে অনুধাবন করলে বোঝা যায় বাণীরচনায় তাঁর প্রতিভা ছিল মধ্যম রকমের কিন্তু সুরসৃজনে তাঁর কারুকৃতি ছিল প্রথম শ্রেণীর। কম্পোজার হিসাবে দ্বিজেন্দ্রলালের মহিমা বুঝতে গেলে একটু ইতিহাসের দিকে চাইতে হবে। রবীন্দ্রনাথ আর দ্বিজেন্দ্রলালের আগে বাংলা গান স্বনির্ভর ছিল না। কোনো বিশিষ্ট হিন্দুস্থানী গানের স্ট্রাকচারের ওপর বাংলা বাণী বসিয়ে আগেকার বাংলা গান বাঁধা হত। কথা ও সুরের অন্যোন্য সম্পর্কে গান গড়ে উঠতো না। রবীন্দ্রনাথ আর দ্বিজেন্দ্রলাল সর্ব প্রথম গানকে কম্পোজ করলেন তার একক স্বাতন্ত্র্যে। সে-স্বাতন্ত্র্য এমনই যে রাগরাগিণীর আভাস থাকলেও তার প্রাধান্য থাকতো না। হয়ে উঠতো এক নতুন সৃজন। দ্বিজেন্দ্রলালের স্বদেশী গানে তাঁর কম্পোজার-রূপ সবচেয়ে ফুটেছে। 'বঙ্গ আমার জননী আমার' আলাহিয়া বেলাবল ঠাটে বাঁধা, 'ধনধান্য পুষ্প ভরা'-র ভিত্তি কেদারা। কিন্তু গান শোনার সময় সেকথা কি একবারও মনে পড়ে? তা কি আমাদের নিয়ে যায় না এক গূঢ় নির্মাণের আকাশে?

এ ব্যাপারটা নিধুবাবু বা লালচাঁদের যুগে হত না। তাঁদের গান শুনলেই বোঝা যায় একটা নির্দিষ্ট সুরের ঠাটে গানের কথা বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। দুটোয় মিলে একটা তৃতীয় সৃষ্টি হয়নি এবং সেইজন্য সেই দুর্বলতা কাটাতে রাখতে হয়েছে বিপুল অপ্রয়োজনীয় তানবাজি।

দিলীপকুমার তাঁর 'উদাসী দ্বিজেন্দ্রলাল' বইয়ে স্মরণ করেছেন একটি ঘটনা। দ্বিজেন্দ্রলাল একদিন লালচাঁদের 'এহো রাজা যাতি হায়' গানটি গ্রামোফোনে শুনে এতদূর মুগ্ধ হন যে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করেছিলেন সেই বৈদেহী গায়ককে। কিন্তু আরেকদিন লালচাঁদের 'অনুগত জনে কেন এত কর প্রবঞ্চনা' গানে উৎকট তান সা নি ধা পাস্ মা পাস্ গা সাস্ গা রে সা শুনে হো হো করে হাসতে থাকেন আর বলেন, 'না হেসে কী করি বল্ দেখি? বাংলা গানে যে ভাব বলে একটা জিনিস আছে রে। তাকে সার্গম-বাজি করে টুঁটি টিপে ধরলে কি সে বাঁচতে পারে কখনো?'

গানের ভাবকে বাঁচানো বা তাকে সঠিকভাবে জাগানো ব্যাপারটিই দ্বিজেন্দ্রলালের সবচেয়ে বড় সিদ্ধি। 'ওই মহাসিন্ধুর ওপার হতে কী সংগীত ভেসে আসে' কিংবা 'মলয় আসিয়া কয়ে গেছে কানে' কিংবা 'আমরা এমনই এসে ভেসে যাই' গান ভাল করে শুনলে তাঁর কম্পোজার হিসাবে সফলতা বোঝা যায়। গানের ভাবানুযায়ী সুরের বিন্যাস এ-সব গানে আছে। প্রয়োজনমতো এ তিনটি

গানে যথাক্রমে পাওয়া যায় বৈরাগ্য বিধুরতা, প্রেমের আর্তি ও হাল্‌কা চাল। তবে সব জায়গাতেই যে তিনি সফল হয়েছেন তেমন নয়। কোথাও কোথাও সুরের আবর্তে শব্দগুলি ভাল করে মেলেনি। যেমন 'সুখের কথা বোলো না আর' গানের শঙ্করা রাগিণীতে চমৎকার জমে-ওঠা মেজাজে হঠাৎ রসাভাস হয় যখন 'দু-দণ্ডের হাসি হেসে মৌখিক ভদ্রতা রাখি' এমন একটা স্টেটমেণ্ট এসে যায়। তবে এমন স্খলনের সংখ্যা খুবই কম।

দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর পিতার কাছে হিন্দুস্থানী গান শুনলেও তার টানে ভেসে যাননি অনুকরণসর্বস্বতায়। তাঁর মনে ছিল যে, 'বাবাই প্রথম আমাকে গানের দুটি দীক্ষা দেন। এক, হিন্দুস্থানী সুর শেখার—দুই, সে-সুরে বাংলা গান বাঁধার।' এই গান বাঁধার কৈশোরের প্রয়াস আর্যগাথার প্রথম খণ্ডে ধরা আছে তাঁর বারো থেকে সতেরো বছর বয়সের সৃজনীতে। কিন্তু বিলাতে গিয়ে সেখানকার গান শিখে তাঁর ধ্যানধারণা এতটাই বদলে যায় যে এদেশে ফিরে তিনি বিলিতি গানের সুরে বাংলা গান গাইতে থাকেন তর্জমা করে। যেমন Some folks অবলম্বনে 'কেউ কেউ করে হায়', Rule Britannia থেকে 'যখন নীলিমা জলধি হৃদয়ে', Won't you buy my pretty flowers নিয়ে 'কেউ কিনবি না মোর ফুলগুলিরে' এইসব গান। এসব অনুবাদ তিনি করেছিলেন মূল গানের ছন্দ ও সুর বজায় রেখে। ফলে গাইতে গেলে শব্দের উচ্চারণ এমন দ্রুত করতে হত যে অনেক সময় হাসির তোড় আসত। যেমন

কেউকেউকরে হায়
কেউকেউকরে কেউকেউকরে
কেউকেউ মরতে চায়।

এ তো আর বাংলা গানের সুরবিহারধর্মী ধীর লয়ের গান নয়। এর মধ্যে রয়ে গেছে বিলিতি সুরের তড়িঘড়ি movement, যা স্বরধ্বনিকে দ্রুত টেনে নিয়ে যায়। কিন্তু দ্রুত উচ্চারণে 'কেউকেউকরে' বললেই হাসি আসবে। অচিরে তাই তিনি গান রচনার এই তর্জমা-পদ্ধতি ত্যাগ করলেন এবং এই দ্রুত সুরের ঢংটা লাগিয়ে দিলেন হাসির গানে। ইতিমধ্যে চাকরি সূত্রে তাঁকে যেতে হল মুঙ্গের-ভাগলপুর। সেইখানে সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের টপ্‌ খেয়ালের বিস্তারধর্মী লাবণ্যে গানের একটা আলাদা ভুবন পেয়ে গেলেন। গানের আঙ্গিক নিয়ে আর তাঁর চিন্তা রইল না। সাধারণভাবে দুই তুকের খেয়াল অঙ্গের গানে সুরের অন্তর্মুখী বিস্তার আর টপ্পার কারুকাজ মিশিয়ে

তাঁর নতুন গানগুলি উৎসারিত হতে থাকল। এইসব গানের অন্তঃশরীরে রয়ে গেছে রাগের ভিত্তি, কিন্তু কখনও কীর্তন, কখনও বিলিতি সুরের মোচড় ও ওঠানামা গানগুলিকে অভিনবত্বে ভরিয়ে দিয়েছে। বেহাগ, খাম্বাজ, ঝিঁঝিট, বাগেশ্রী, বাহার, ভৈরবী ও নটমল্লার তাঁর প্রিয় রাগরাগিণী। গানের বিন্যাসে বিলিতি সুরের সংযোগ তিনি সতর্ক ও সচেতনভাবেই করেছেন। যদিও তার জন্য সেকালে তাঁর প্রচুর সমালোচনা হয়েছে। অক্ষয়কুমার সরকার সেকালে টাউন হলের ভাষণে অভিযোগ করেছিলেন :

> য়ুরোপের সঙ্গীতে মীড় মূর্চ্ছনা নাই, এমন নয় ; আছে, অল্প আছে ;—সেই সঙ্গীত প্রধানতঃ খাড়া সুরে গড়া। ভারতবর্ষ মীড় মূর্চ্ছনার দেশ। বাঙ্গালা আবার ভারতের ভারত—বাঙ্গালীর কীর্তনের সুর কেবল মীড় মূর্চ্ছনায় পরিপূর্ণ।…আমার বর্তমান দুঃখ—নবযুবকদলের মধ্যে ইংরাজি সুরে সঙ্গীত চর্চা দেখিয়া।…যে সুরের কথা আমি বলিতেছিলাম, সেটি প্রধানতঃ দ্বিজেন্দ্রলাল রায় কর্তৃকই নব্যসমাজে প্রচারিত হইয়াছে।…আমার কথা দ্বিজেন্দ্রলাল প্রকৃত ও প্রগাঢ় স্বদেশ-প্রেমিক হইলে, তিনি খাড়া সুর বাঙ্গালায় চালাইতে চেষ্টা করিতেন না।

একথার প্রতিবাদ করেন প্রমথ চৌধুরী। তাঁর বক্তব্য :

> দ্বিজেন্দ্রলাল অবশ্য একটি নতুন ঢঙের সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু তাতে করে হিন্দুসঙ্গীতের ধর্ম নষ্ট হয়নি—কেননা ওস্তাদি ঢং ভারতবর্ষীয় সঙ্গীতের একমাত্র ঢং নয়।…দ্বিজেন্দ্রলালের সুরের বিশেষত্ব এবং নূতনত্ব এই যে, সে সুরের ভিতর অতি সহজে একটি বিলেতি চাল এসে পড়েছে।…আর্টের সৃষ্টির পদ্ধতি হচ্ছে Organic। দ্বিজেন্দ্রলালের হিন্দু সঙ্গীতের ন্যায় ইউরোপীয় সঙ্গীতেও পরিচয় ছিল। তাঁর অন্তরে এই দুয়ের অলক্ষিত মিলনের ফলে তাঁর সুরের সৃষ্টি। দ্বিজেন্দ্রলাল যে নূতন ঢঙের নবসুরের সৃষ্টি করেছেন, সে সুর তাঁর মগ্ন-চৈতন্যে, দেশী ও বিলাতি সুরের নিগূঢ় মিলনে সৃষ্টি হয়েছে।

প্রমথ চৌধুরীর মত সমর্থন করে রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গটি আরও প্রাঞ্জল করলেন এই বলে যে,

> 'দ্বিজেন্দ্রলালের গানের সুরের মধ্যে ইংরেজি সুরের স্পর্শ লেগেছে বলে কেউ কেউ তাকে 'হিন্দুসঙ্গীত' থেকে বহিষ্কৃত করতে চান।

যদি দ্বিজেন্দ্রলাল হিন্দুসঙ্গীতে বিদেশী সোনার কাঠি ছুঁইয়ে থাকেন তবে সরস্বতী নিশ্চয়ই তাঁকে আশীর্বাদ করবেন।...হিন্দু-সঙ্গীতের কোনো ভয় নেই—বিদেশের সংস্রবে সে আপনাকে বড় করেই পাবে।

দ্বিজেন্দ্রলালের গানে বিলিতি সুরের সংযোগ নিয়ে এত যে অভিযোগ আর সমর্থন তার কারণ তার জনপ্রিয়তা। তিনি সচেতন ছিলেন দেশী ও বিদেশী সংগীতের স্বভাব-পার্থক্য বিষয়ে। বিলিতি গানের গায়ন-অভিজ্ঞতা তাঁর গান রচনায় খুব সহায়তা করেছিল তাতে সন্দেহ নেই। সেইজন্যেই তাঁর গানে একটা দৃঢ় পৌরুষ, উচ্চারণের একটা ওজস্বিতা এবং সুরের উচ্চাবচ স্বভাব খুব চোখে পড়ে। গানভেদে তার প্রয়োগ নানা ধরনের। যেমন 'আমরা এমনই এসে ভেসে যাই' গানের অন্তরায় আছে বিলিতি সুরের আরোহণ-অবরোহণের অনবদ্য লীলা চাপল্য। 'ধনধান্য পুষ্পভরা' গানের কোরাসে 'সে যে আমার জন্মভূমি' অংশ তিনবার তিন স্বরে গাওয়ার কায়দাটাই বিদেশী। 'মলয় আসিয়া কয়ে গেছে কানে' গানটিতে শেষ অংশে সুরের যে ক্রমিক নাটকীয় আরোহণ তা খাঁটি বিদেশী এফেক্ট অথচ তা ধরা শক্ত। অন্যদিকে 'মেবার পাহাড়' গানে 'সধবা অথবা বিধবা তোমার রহিবে উচ্চশির' এই গায়নে 'শির' শব্দটির স্বরস্থান যখন এক লাফে চলে যায় মুদারার গা থেকে তারার গা-তে তখন ফোটে বিদেশী সুরের উল্লম্ফন ধর্ম—যা আমাদের গানে খুব নতুন। কোরাস ব্যাপারটাও তো আমাদের গানে দ্বিজেন্দ্রলালের সৃষ্টি। কিংবা ভূপালীতে বাঁধা 'ধাও ধাও সমরক্ষেত্রে' এই মার্চিং সঙ আর তার তীব্র তালের স্পন্দ একান্তই দ্বিজেন্দ্রীয় উপহার বাংলা গানে। নাটকের গানে, যাকে বলে ইনসিডেণ্টাল সঙ, তাঁব সৃজনপ্রতিভার অনন্য উদ্‌ভাবন। 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকে অন্ধভিক্ষুকের কণ্ঠে 'ঘন-তমসাবৃত অম্বরধরণী' গানটি আগাগোড়া ধরে রেখেছে বিলিতি গানের সুরবিন্যাসের উত্থানপতন। উত্তেজনা, উদ্বেগ, আর্ত অনুসন্ধান আর সমাপ্তির মূর্ছা গানটির স্বরলিপিতে বাঁধা আছে স্তরে স্তরে। ভাষা বাদ দিয়ে কোনো তারযন্ত্রে ( বিশেষত বেহালায় ) গানটি বাজালে সুরের বুনন চমৎকার বোঝা যায়। এই দিক থেকে তাঁর প্রতিভা বাংলা গানে আজ পর্যন্ত একক ও অনুসরণহীন।

এই অনুসরণহীনতা দ্বিজেন্দ্রলালের আরেক অভিশাপ। তাঁর গান বাঙালী একসময়ে খুবই ভালবেসেছে কিন্তু তার অন্তরপ্রকৃতি অনুধাবন করতে পারেনি। তাঁর গানের যে-পৌরুষ আর ওজস্বিতা তা কি আমরা নিতে পেরেছি? বিদেশী সুরমিশ্রণের যে-ইঙ্গিত আর কৃৎকৌশল দ্বিজেন্দ্রগীতিতে অনুস্যূত হয়ে আছে,

পরবর্তীকালের কজন কম্পোজার তাকে বুঝতে পেরেছেন? পারেননি, তার একটা বড় কারণ দ্বিজেন্দ্রলাল সম্পর্কে অপপ্রচার এবং তাঁর গানের অপ্রচার।

লক্ষ করলে দেখা যাবে নানামুখী জীবন তাঁর গানকে সঠিক বিবর্তনের পথে এগোতে দেয়নি। তাঁর সবচেয়ে সম্ভাবনাপূর্ণ হাসির গান তার সমৃদ্ধ যুগে হঠাৎ সাবলীলতা হারাল। আকস্মিক পত্নীবিয়োগে তিনি ত্যাগ করলেন হাসির গানের অধিরাজত্ব। এ কি কম পরিতাপের বিষয়? যাঁর লেখনী থেকে বেরিয়েছিল অকিঞ্চিৎকর প্রয়াসে এমন অসামান্য ভাষণ যে—

নাঃ! এ জীবনটা কিছু নাঃ!
শুধু একটা 'ইঃ', আর একটা 'উঃ' আর একটা 'আঃ'!

তাঁর কাছে বাংলা গান পেত কতখানি মুক্তি তা ভাবলে পরিতাপ হয় তাঁর অকাল মৃত্যুর জন্য। আর যখন মনে হয়, রবীন্দ্রসংগীতের সত্যিকারের বিকাশ ঘটেছিল পঞ্চাশ বছর বয়সের পরে এবং দ্বিজেন্দ্রলালের জীবন মাত্র চল্লিশ বছরে মেনে নিয়েছিল দারুণ বৈক্লব্য তখন নৈরাশ্য জাগে গভীর। মন্দ আয়ুর অভিশাপ অবশ্য রজনীকান্তের (১৮৬৫-১৯১০) এবং অতুলপ্রসাদের জীবনেও (১৮৭১-১৯৩৪) ছিল, কিন্তু তাঁদের গান রচনার সামর্থ্য তো দ্বিজেন্দ্রলালের মতো বহুধাবিস্তারী ও নিরীক্ষাউৎসুক ছিল না। তার চেয়েও শোচনার বিষয় দ্বিজেন্দ্রলাল ও তাঁর গান সম্পর্কে আজকের গরিষ্ঠসংখ্যক সংস্কৃতিসেবী বাঙালীর অজ্ঞতা। দ্বিজেন্দ্রলালের গান আমাদের দেশে কোনো ট্রাডিশন সৃষ্টি করতে পারেনি বরং তৈরি করেছে এক মহৎ ট্রাজেডি। পবিবর্তিত দেশকালে তাঁর স্বদেশী গানের আজ কীই বা মূল্য আছে? পঁচাত্তর শতাংশ হাসির গানের সুর ও গায়ন গেছে হারিয়ে। তাঁর অন্যান্য আত্মমুখী লিরিক গান সুরভ্রষ্টতা ও স্বৈর সুরপ্রয়োগের অন্তর্ঘাতে বিপন্ন। একথা পরিতাপের যে দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গানে প্রলুব্ধ ও অনুসারী হন রজনীকান্ত শুধু ভাব ও ভাষার দিক দিয়ে। হাসির গানের সুরের কম্পোজিশন তাঁর পক্ষে ছিল অপ্রাপণীয় ও অসাধ্য প্রয়াস। আর তাঁর স্বদেশী গান প্রভাবিত করলো কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তকে। যিনি 'বঙ্গ আমার জননী আমার'-এর মতো ওজস্বী গানকে তরলীকৃত করে ফেললেন তাঁর 'আমরা' নামক ইতিহাসাশ্রিত পদ্যে।

৩

এতক্ষণকার আলোচনায় কেবল নিজেদের দোষারোপ করা হলো। যেন দ্বিজেন্দ্রগীতি সম্পর্কে অনাদর আর অনীহা আমাদেরই শীতলতার দায়ে। কিন্তু

দ্বিজেন্দ্রলালই বা কেন আদায় করে নিতে পারলেন না তাঁর প্রাপ্য সম্ভ্রম, কেন তিনি স্খলিত হলেন তাঁর বিপুল জনাদরের নির্ভরযোগ্য আসন থেকে? সে কি শুধুই তাঁর অকালমৃত্যুর কারণে, কেবল রবীন্দ্রবিরোধিতাজাত ভুল-বোঝাবুঝিতে? আমরা তো দেখি ১৯১৩ সালে যখন দ্বিজেন্দ্রলাল প্রয়াত হন তখন তাঁর স্বদেশী গান আর নাটকের গান জনপ্রিয়তার তুঙ্গে। এমন কি রবীন্দ্রসংগীতও ছিল না সেই জনপ্রিয়তার ধারে কাছে। রবীন্দ্রনাথ তখনও পাননি নোবেল প্রাইজ তথা বিশ্বকবির শিরোপা। তাঁর কবিত্ব আর সংগীতপ্রতিভা সে সময়ে এক বিতর্কিত বিষয়। যদিও রবীন্দ্রপ্রতিভার অমোঘতা সকলেই বুঝতে শুরু করেছেন তবু স্বীকৃতির ঔদার্য অনেকেই দেখাননি। লোকেন পালিত, প্রিয়নাথ সেন ও প্রমথ চৌধুরীর মতো কয়েকজনের বাইরে বাংলার সারস্বত সমাজের একটা বিরাট অংশ যে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে দ্বিধান্বিত ছিলেন ইতিহাস সেকথা বলে। দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর উগ্র নীতিবাদ আর অকপট সরলতা থেকে রবীন্দ্রনাথের দিকে যে অসূয়ার তীর ছুঁড়েছিলেন তাতে অনেকের পরোক্ষ সায় ছিল। যদিও কাদা লেগেছে শুধুই দ্বিজেন্দ্রলালের গায়ে।

কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর স্বল্পজীবনে যে-জনস্বীকৃতি পান তা মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে কেমন করে সরে যায়? রবীন্দ্রনাথের নোবেল প্রাপ্তি ও বিশ্বজয় সেই বছরেই ঘটে এবং সেই অভিযানে জনোচ্ছ্বাসের ভরকেন্দ্র টসে যায় কি অতিরিক্ত রবীন্দ্রভক্তির আকস্মিক উন্মাদনায়? প্রথম বিশ্বযুদ্ধের তীব্র ঝাপট তাঁর স্বদেশী নাটককে কি সাময়িকভাবে অবরুদ্ধ করে? নাকি তাঁর গানে বা নাটকে ছিল না চিরকালের সম্ভাবনা? শেষের অভিযোগ দ্বিজেন্দ্রলালের নাটক সম্পর্কে অবধারিত সত্য। তা সাময়িকতায় আচ্ছন্ন, উচ্ছ্বাসময়, সাংলাপবহুল ও অতিনাটকের লক্ষণাক্রান্ত। বঙ্গ রঙ্গমঞ্চ থেকে তার দ্রুত নিষ্ক্রমণের সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রগীতির অবসিত হবার একটা যোগ থাকা অসম্ভব নয়। কিন্তু সবচেয়ে বড় কারণ সম্ভবত দ্বিজেন্দ্রলালের অসাংগঠনিক বুদ্ধি ও নিজের গান সম্পর্কে ঔদাসীন্য। তাঁর গান কে গাইবে, কেমন করে হবে স্বরলিপিবদ্ধ, সেসব তিনি আদৌ ভাবেননি। শেষদিকের রিক্ত নিঃস্ব-জীবন তাঁকে এতটাই শিকড়বিহীন করে দিয়েছিল যে এমনকি নিজের সৃষ্টির প্রতি তাঁর সম্মানবোধ ছিল না তেমন। নইলে কি তাঁর গানের এমন পরিণাম হতে পারে? রঙ্গমঞ্চে নটীদের কণ্ঠে আর বাড়ির নিচের প্রকোষ্ঠে ইভনিং ক্লাবের সদস্যদের সম্মেলকমহড়ায় দ্বিজেন্দ্রলালের জীবিতকালেই তাঁর গান কোনোরকমে বেঁচে ছিল এমনই বিবরণ দেখা যাচ্ছে। তাঁর হাসির গান গাইবার উত্তরাধিকারী তিনি

কাউকে বানাতে পারেননি। কণ্ঠের সে-পর্যায়ের দক্ষতা ও ধারণশক্তি ইভনিং ক্লাবের কারুর ছিল না। তাছাড়া শেষবয়সে ঈশ্বরমনস্ক ঔদাস্যময় যে দ্বিজেন্দ্রলালের কথা আমরা তাঁর জীবনীগ্রন্থে পাই তার ধারে কাছে প্রেমসংগীত ও হাসির গান নেই। এমনকি হাসির গানে যখন তিনি প্রথম যৌবনে আসর জমাতেন তখনও কি সবাই বুঝতো তার গাঠনিক চারুত্ব ও বন্দেশের অভিনবতা ? এ ব্যাপারে তাঁর পুত্র একটি সারসত্য বলেছেন যে,

> তাঁর হাসির গানে সারা বাংলা সাড়া দিলেও, সাড়ে পনের আনা শ্রোতা তাঁর হাস্যপ্রতিভার রসে এমনি রসিয়ে উঠল যে, তাঁর হাসির গানের সুরের অভিনবত্ব প্রথম দিকে বিশেষ করে কারুর দৃষ্টি আকর্ষণ করেনি। সভায় সমিতিতে নানা মজলিসে তিনি গেলেই সবাই ধরত : "হাসির গান দ্বিজুবাবু, একটা হাসির গান"।...তাঁর দেহান্তের কয়েক বৎসর বাদে হাসির গানের স্বরলিপি প্রকাশিত হবার পরে তবে তাঁর হাসির গানের সুরের বহুবিচিত্র স্বকীয়তা সুররসিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল।

অর্থাৎ হাসির গানের মূল আবেদন ছিল অনেকের কাছে শুধু থিমেটিক। বিষয়ের অসঙ্গতি আর কাহিনীর চমক এতটাই অধিকার করেছিল শ্রোতাদের যে সুরের বিন্যাস ও নির্মিতির চারুত্ব কেউ বোঝেননি। বোঝেননি বলেই রজনীকান্ত থেকে নলিনীকান্ত সরকার পর্যন্ত বাংলা হাসির গানের ধারা বয়ে চলেছে শুধু ভাবের মজা আর উদ্ভট কল্পনারসে, গায়নের কৌশলে তথা সুরের আশ্চর্য বৈপরীত্যে নয়।।

দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গান তাঁর গীতিপ্রতিভার সবচেয়ে মৌলিক অংশ অথচ আজ তা যে একেবারে অন্তর্হিত হয়ে গেছে তার কারণ কি ? গানের সুরে কঠিন পরীক্ষা আছে বলেই কি ? প্রতিবেদনে দেখা যাচ্ছে এমন কি স্বয়ং দিলীপকুমার রায় তাঁর পিতার হাসির গান গেয়ে রবীন্দ্রনাথকে খুশী করতে পারেননি। ১৯২০ সালে বারাণসীতে দিলীপকুমার প্রবাসী বাঙালী সম্মেলনের অধিবেশনে 'নন্দলাল' গানটি গেয়ে আসর জমিয়ে দেন। কিন্তু গানের পর রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেন : 'দিলীপ, গাইলে বটে—হাততালিও পেলে। কিন্তু তোমার পিতৃদেবের মত হল না। তিনি যখন এ-গানটি গাইতেন লোকে হেসে মাটিতে লুটিয়ে পড়ত।' স্বভাবত প্রশ্ন ওঠে, গায়নের কোনো বিশেষ যাদুতে দ্বিজেন্দ্রলাল যেমন করে হাসির গান গাইতে পারতেন দিলীপের মতো প্রসিদ্ধ কণ্ঠবাদক তা পারেন না ? এখানেই কি আমরা সাধারণভাবে দ্বিজেন্দ্রলালের গানের একটা মূল

স্বভাব পেয়ে যাই ? মনে হয় না কি, তাঁর গান খুব Personal, খুব কূট রূপায়ণ-ধর্মী ? তার অন্তঃস্থ প্রাণরস আদায় করা তাই সুকঠিন। এসব গানের 'অর্‌মান্‌' আলাদা। হাসির গানের ক্ষেত্রে কথাটা অনেকটা ধরতে পেরেছিলেন পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, তাই বলেছিলেন :

> দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গানের কৌতুকের অন্তরালে স্তরে স্তরে করুণা, অনুকম্পা সমবেদনা সাজানো রহিয়াছে। শ্লেষ বিদ্রূপ যাঁহারা করিয়া থাকেন তাঁহারা অভিজ্ঞতা এবং পবিত্রতার উচ্চ আসনে বসিয়া অপরকে হীন জ্ঞানে শ্লেষ বিদ্রূপ করিয়া থাকেন।...কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলাল যাঁহাদের লইয়া সরল হাসি হাসিতেন স্বয়ং তাঁহাদের দলে মিলিয়া যাইতেন।

হাসির গানের পিছনে ছিল তাঁর ব্যক্তিগত বিশ্বাস আর যন্ত্রণা। সে-গান তাঁর অভিজ্ঞতার আত্মস্থ নির্মাণ। শ্রেষ্ঠ গায়কও তাতে প্রার্থিত আবেদন জাগাতে পারবেন না কোনোদিন।

এবারে এই সূত্রে একটা গুরুতর প্রশ্ন উঠবে। হাসির গান বা স্বদেশী গান যেমন দ্বিজেন্দ্রলাল বিবিক্ত আত্মস্থতা থেকে সৃষ্টি করেছিলেন তাঁর অন্যান্য গান কি তেমন আমগ্ন সৃষ্টি ? যদি তা-ই হবে তাহলে গান লেখার আনন্দ তাঁর উত্তর চল্লিশ জীবনের ক্লান্তিমোচন করতে পারে না কেন ? প্রসঙ্গত মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথের তেষট্টি বছর বয়সে লেখা পত্রাংশ : 'আজ-নাগাদ প্রায় পনেরো-ষোলো বছর ধরে খুব কষে গানই লিখছি !...আর-একটা কথা বলে রাখি : গান লিখলে যেমন আমার নিবিড় আনন্দ হয় এমন আর কিছুতে হয় না।' দ্বিজেন্দ্রলালের তুলনায় শোক দুঃখ বেদনা ও মর্মাঘাত কি রবীন্দ্রনাথের কিছু কম ছিল ? আসলে সে সকল উত্তীর্ণ হয়ে যাওয়ার যে-পৌরুষ তা ছিল রবীন্দ্রনাথের আয়ত্তে। দ্বিজেন্দ্রলালের গানের প্রকরণ ও সুরে যতটা পৌরুষ আর ওজস্বিতা দেখি তাঁর জীবন ছিল ততটাই উল্‌টো রকমের অর্থাৎ কোমল, স্পর্শকাতর ও আবেগাত্মক নির্বেদে ভরা। আমরা দেখি রবীন্দ্রনাথ তাঁর সৃষ্টিশীল জীবনে বার বার অতিক্রম করে যান সাংসারিকতার গ্লানি। উজ্জীবনের রসদ খুঁজে নেন সৃজনের আনন্দে। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে এইজন্যই তৈরি হয় এক আলাদা প্রেরণাভূমি, জীবনকে চালিত করে এক অলক্ষ আত্মশক্তি ও ঊর্ধ্বস্তরের চেতনা। তিনি চলে যান কবিতা থেকে গানে, নাটক থেকে নৃত্যনাট্যে, উপন্যাস থেকে ছবি-আঁকায়, কেবলই নতুন নতুন রূপের আহ্বানে। অশীতিবর্ষেও ক্লান্তি তাঁকে ছুঁতে পারে না, শোক হয় পরাস্ত। তাঁকে চালনা করে শিল্পপ্রত্যয়ের এক সুনির্ভর লক্ষ্য। এমন কি অতুলপ্রসাদও গানের মধ্যে

ঢেকে রাখেন তাঁর অন্তঃশীল সত্তা। 'ওগো দুঃখ সুখের সাথী সঙ্গী দিনরাতি সংগীত মোর' তাঁর এই উচ্চারণ একান্ত সত্য। গান তাঁর এতখানি নির্ভরযোগ্য শস্ত্র যে সত্যিই তিনি ঘোষণা করতে পারেন, 'হানো যদি খরবাণ, আমারও তো আছে গান'। দ্বিজেন্দ্রলালের গান তাঁর আত্মবিক্ষত জীবনের ভাষ্য কিন্তু আত্ম-বেদনার শুশ্রূষা নয়। নয় বলেই তাঁর লক্ষ্য সুরের দিকে। যেমন কাব্যে তেমনই গানে দ্বিজেন্দ্রলাল বস্তুগত কল্পনার কবি। তাঁর গানের বাণী প্রায়ই উচ্ছ্বসিত, ('এ কি' অব্যয়যুক্ত বিস্ময়ঘেরা গান যে তাঁর কত!) লঘু উদ্বেগে তরল এবং স্বভাবোক্তি অলংকারে আচ্ছন্ন। যথাক্রমে দেখা যাক এমন কয়েকটি বাণীর উদাহরণ :

১. একি নিখিল বিশ্বহাসি—
এ কি সুরভি, স্নিগ্ধশিশিরসিক্ত কুসুম রাশি রাশি—
এ কি শ্যাম হসিত নব বিকশিত ঘন কিশলয় পল্লব—
এ কি সরিৎরঙ্গ শত তরঙ্গ নৃত্যভঙ্গ নির্ঝর।

২. আমার সারাটি চিত্ত প্রণয়ে বিকশি,
ওগো তোমার বিরহে উঠিছে উচ্ছ্বসি।
কবে তুমি আসি অধর পরশি
মোর পানে চেয়ে হাসিবে?

৩. আমি চেয়ে থাকি দূর সান্ধ্য গগনে
ধীরে দিবা হয় অবসান।
আমি নিভৃতে নয়ন-নীরে
অভিসিক্ত করি নৈশ উপাধান॥

এসব গান কি আমাদের সকলের ভাষাকে বহন করছে? কোনো সমাবেশে বা ব্যক্তিগত অনুভূতি উন্মোচনের জন্য এ গান গেয়ে কি কোনো আত্মতুষ্টি হবে আমাদের? আমরা তো চাইব আরও নৈর্ব্যক্তিক অথচ আত্মগত গভীরতা এবং তা পেয়ে যাব অবিরলভাবে রবীন্দ্রনাথের গানে, এমন কি অতুলপ্রসাদে। দ্বিজেন্দ্রলালের সামর্থ্য যে এতটা সীমায়িত সে কথা ভাবার অবশ্য সংগত কারণ নেই। কেননা স্মৃতিতে অনুরণন তোলে তাঁর অনেক সুন্দর গান। যেমন—ঐ মহাসিন্ধুর ওপার হ'তে, যাও হে সুখ পাও যেখানে সেই ঠাঁই, সকল ব্যথার ব্যথী আমি হই, তোমারেই ভালবেসেছি তোমারেই ভালবাসিব, নীল আকাশের অসীম

ছেয়ে ছড়িয়ে গেছে চাঁদের আলো—এইসব রচনা। হয়ত আমাদের ছুঁয়ে যায় তাঁর সহজ কবিত্ব লাগা এমন সাবলীল পঙ্‌ক্তি যে,

এমন চাঁদের আলো মরি যদি সেই ভাল
সে মরণ স্বরগ সমান।

কিংবা,

বুক এগিয়ে আসে মরণ মায়ের মতন ভালবেসে
আজকে যদি মরতে না পাই
তবে আমার মরণ ভাল।

কিংবা,

তারা ফুলের উপর ঘুমিয়ে পড়ে ফুলের মধু খেয়ে।

সেথা পাখির ডাকে ঘুমিয়ে পড়ি পাখির ডাকে জেগে।

আমার এই দেশেতেই জন্ম যেন এই দেশেতেই মরি।

সহজ অনুভূতির নিরাভরণ উচ্চারণে এতখানি ঈর্ষাজনক ছিল যাঁর দক্ষতা তিনি কেন নিসর্গ রূপায়ণে গভীর বাণীর সন্ধান পেলেন না তা ভাবলে বিস্ময় লাগে বৈকি। সেখানে কোকিল বিটপী মলয় সজনী পাপিয়া শশধর নির্ঝর কুসুমমধু সরসী এত পৌনপুনিকভাবে ঘুরে ঘুরে আসে কেন? কেন তাঁকে প্রকৃতি বর্ণনায় এমন 'ক্লিশে' ব্যবহার করতে হয় যে,

যখন সঘন গগন গরজে
বরিষে করকাধারা
সভয়ে অবনী আবরে নয়ন
লুপ্ত চন্দ্রতারা।

অথবা বর্ষাকে দেখতে হয় এমন দারুণ শব্দ সন্নিপাতে যে,

ঘনঘোর মেঘ আই' ঘেরি গগন
বহে শীকরস্নিগ্ধচ্ছুসিত পবন।

এসবের একটাই উত্তর, প্রমথ চৌধুরীর ভাষায়, 'তাঁর কণ্ঠে আগে এসেছে সুর, তারপর সুরকে তিনি দিয়েছেন বাণীরূপ।' এই ইঙ্গিত মনে রাখলে বোঝা যাবে 'যখন সঘন গগন' এমন শিশুতোষ আনুপ্রাসিকতায় দ্বিজেন্দ্রলালের গ্রস্ত হওয়ার কারণ বিদেশী গানের স্বরের ক্রমিক আরোহণের একটা ডিজাইন, যা বাণী রচনার

আগে তাঁর মনকে অধিকার করে বসেছিল। আর 'ঘনঘোর মেঘ আই' গানের পূর্বসূত্র যে 'ঘনঘটা ঘেরি আই কারী কারী ঘনঘটা' এই তথ্য জানলে বোঝা সহজ হয় যে মূল গানের সুরবিন্যাস তাঁকে এতটাই ভাসিয়ে দিয়েছিল যে 'শীকরস্নিগ্ধচ্ছুসিত'র মতো রূঢ় উপলখণ্ড তাঁর কানে বেমানান লাগেনি।

কিন্তু গান তো একটা পরম্পরাগত শিল্প। যতদিন রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতির গানের গূঢ়তা আমরা শুনিনি ততদিন প্রকৃতির গতানুগতিক গানে আমাদের চলে যেত। বসন্ত বোঝাতে আমরা গাইতে পারতাম,

আইল ঋতুরাজ সজনি, জ্যোৎস্নাময় মধুর রজনী,<br>
বিপিনে কলতান মুরলী উঠিল মধুর বাজি।<br>
মৃদুমন্দসুগন্ধপবনশিহরিত তব কুঞ্জভবন<br>
কুহু কুহু কুহু ললিততান মুখরিত বনরাজি।

কিন্তু যখন জানতে পারি বসন্ত শুধুই ফোটা ফুলের মেলা নয়, তাব মধ্যে ধরা আছে গভীরতর বেদনার আভাসন তখন আর আমরা 'আইল ঋতুরাজ সজনি' কেন গাইব? যদি বা গাই তবে সিন্ধুরা একতালায় বাঁধা এক সংহত সুরের নিমিত্তির জন্য গাইব। কিন্তু সে কৌতূহল কজনের? ঠিক তেমনই দ্বিজেন্দ্রলালের বর্ষাসংগীত যখন ব্যক্ত করবে—

চমকে চপলা, চিত চমকে, সঘন-ঘন-গরজনে<br>
কাঁপে হিয়া সখি রে—

তখন কি এই গতানুগতিক বর্ণনা দেখে আমরা চণ্ডালিকার মতই বলে উঠব না, 'আমি দেখব না আমি দেখব না আমি শুনব?' ধ্যানের মধ্যে মনের মধ্যে আমরা বর্ষাকে শুনতে চাইব, রবীন্দ্রসংগীত সেই আস্বাদ দিয়েছে বলেই।

দ্বিজেন্দ্রলালের গান সম্পর্কে একতরফা দোষারোপ করতে গিয়ে আমরা যেন ভুলে না যাই যে তাঁর গান রচনার উপযোগী একটা স্বচ্ছ জীবন ক্রমিকভাবে গড়ে ওঠেনি। জীবিকার দায়, দাসত্ব, রাজস্ব বিভাগে ইংরাজপ্রভুর সঙ্গে মনান্তর এবং ঘন ঘন স্থানান্তরের গ্লানি একটি সুনিশ্চিত নির্মাণের লক্ষ্যে তাঁকে এগোতে দেয়নি। পুত্র দিলীপকে প্রায়ই বলতেন: 'ওরে কত কি যে আসে মাথায় লিখবার সময় পাইনে। যা খাটায় আমাকে'। এই যেমন একদিকের সত্য তেমনই সত্য তাঁর গানের প্রয়োগক্ষেত্রের শীর্ণতা। রবীন্দ্রনাথ সেই 'বাল্মীকি প্রতিভা'র সময় থেকে শেষ বয়সের শেষ জন্মদিন (যেবার তিনি শান্তিদেবের ইচ্ছায় লেখেন 'হে নূতন দেখা দিক') পর্যন্ত গান রচনা ও প্রয়োগের কী বিচিত্র ও বিপুল ক্ষেত্র

পেয়েছিলেন। উৎসব, অনুষ্ঠান, সমাবর্তন, হলকর্ষণ, শারদোৎসব, চা-চক্র, বৃক্ষরোপণ তাঁর গানের ধারা চলত নানা চাহিদার চক্রে। তার বাইরে ছিল গীতিনাট্য থেকে নৃত্যনাট্য পর্যন্ত মেলে-ধরা গানের বিপুল নিরীক্ষা এবং তা লেখার মানসিক অবকাশ। বিদেশ ভ্রমণের সঞ্জীবনী, বিশ্বখ্যাতির সফল আত্মপ্রত্যয়, শান্তিনিকেতনের কর্মবহুল বৈচিত্র্য সঞ্চারী জীবন, লোকসংগীতের সংযোগ, ঋতুচক্রের আবাহনী—এত সব মধুর আয়োজন তাঁর গানকে বিচিত্রতর করেছে। অবশ্য সব কিছু ছাপিয়ে ছিল তাঁর আত্মস্থ চারিত্র, অনুদ্বিগ্ন সংযত জীবনের অর্জিত শান্ততা।

দ্বিজেন্দ্রলাল এমন দাক্ষিণ্য পাননি, বা বলা যেতে পারে, গড়ে নিতে পারেননি। সবাই কি সব কাজ পারে? কিন্তু যা তিনি পারতেন, অর্থাৎ বিপুল বিচিত্র গান রচনা, সেখানে তাঁর চারপাশে আনুকূল্য খুব সুখকর ছিল না। তাঁর মজলিশী স্বভাব ও পানভোজনের চাঞ্চল্য বন্ধুবর্গের সমাহারে তাৎক্ষণিক বিনোদনে অপনোদিত হত। তার সঙ্গে মাত্রা রেখে হাসির গানের উচ্ছ্বাস বা দুটি-একটি প্রণয় সংগীতের মাধুর্য ভালই জমত। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। কোনো চরম সংগীতের গভীরতা কেউ তো তাঁর কাছে চায়নি। তাঁর প্রথম যৌবনের 'ইণ্ডিয়া ক্লাব', ও 'ডাকাত ক্লাব', পরবর্তীকালের 'পূর্ণিমা মিলন' এবং শেষ জীবনের 'ইভনিং ক্লাবে'র সদস্যরা তাঁর কাছ থেকে বড় কিছু আদায় করতে পারেনি। কারণ তাঁরা স্বভাবে ছিলেন প্রমোদপরায়ণ, স্বল্পে তুষ্ট, নাটুকে। দ্বিজেন্দ্রলালকে তাঁরা প্রেরিত করতে পারেনি কোনো বৃহৎ সৃজনে। দ্বিজেন্দ্রলাল মানুষটিও ছিলেন বন্ধুবৎসল, আবেগপ্রবণ ও অভিনয়প্রিয়। 'আমরা বিলাতফের্তা ক'ভাই আমরা সাহেব সেজেছি সবাই' গানটির নাটকীয়তা জমাতে তিনি নিজেও যে প্যাণ্ট কোট পরে মঞ্চে উঠতেন এই খবরটুকু তাঁর স্বভাবের স্পষ্ট দিকটাই দেখায়। দিলীপকুমার লিখেছেন:

> পরে এ-সাহেবিয়ানার হসনীয়তা উপলব্ধি করে কখনো কখনো প্যাণ্ট কোট প'রেই এ-গানটি গেয়ে তুমুল হাসির তুফান তুলতেন সদীর্ঘশ্বাসে হাহুতাশ করে।

এমন বহির্বৃত্তিসম্পন্ন মানুষটির জীবনে আসে এক গভীর অন্তর্মুখী প্রশান্তি তাঁর ষোলো বছরের সুমধুর দাম্পত্যজীবনে। তাঁর এই সময়ের রচনাগুলি ( বিশেষত প্রেমের গান ) তাই সবচেয়ে সংযত ও সম্বৃত।

কিন্তু আবেগবহুল এই মানুষটি খুব সহজে সাড়া দিতেন বাইরের সামান্যতম আহ্বানে। বন্ধুসংগম থেকে পত্রিকাপ্রকাশ, স্বদেশী গান রচনা থেকে সান্ধ্য আসরে

গানের মজলিশ, হাসির গানের মঞ্চ থেকে রঙ্গমঞ্চের উত্তেজনা, রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে কাগুজে বিতর্ক থেকে একেবারে 'আনন্দ বিদায়' রচনা ও অভিনয়ের কর্দমনিক্ষেপ পর্যন্ত তাঁকে সব ব্যাপারে খুব সহজে উদ্বেজিত করা যেত। তাঁর তথাকথিত শুভার্থীরা তাঁকে সেই কাজে সর্বদা ব্যস্ত রাখতে অনলস থাকতেন। এই কারণেই দ্বিজেন্দ্রলালের গান শেষ পর্যন্ত পৌছায় না তার লক্ষ্যের সম্পূর্ণতায়। অনেক স্থূল ও আপাততুচ্ছ প্রসঙ্গে তিনি জড়িয়ে পড়েন। তার মধ্যে তাঁর প্রতিভার সবচেয়ে অপচয় বোধহয় মঞ্চ সান্নিধ্যে ঘটে। বিপুল জনপ্রিয়তা তাঁকে টানে ধ্বংসের দিকে। গানের নৈর্ব্যক্তিক গভীরতা টলে যায় নানা চরিত্রের মুখে ব্যক্তিগত গান জোগাতে বা সিচুয়েশান সৃষ্টির সামান্য উপলক্ষের মর্যাদা রাখতে।

একেক সময় মনে হয় সুরবালা দেবীর আকস্মিক মৃত্যুর অন্তর্গূঢ় আঘাত হয়ত তাঁর মধ্যে আনতে পারত প্রত্যাশিত অন্তর্মুখিতা এবং তার তাপে তিনি সৃষ্টি করতে পারতেন অনন্ত নির্বেদের কিছু আন্তরিক গান। কিন্তু সে সম্ভাবনা অপনোদিত হয়ে যায় 'আলেখ্য' কাব্য রচনার বস্তুমুখিতায়। সাময়িক আঘাতের অন্তর্ঘাত কবি সামলে নেন মাদকে, নাটকে আর স্বদেশী গান রচনার উন্মাদনায়। কিন্তু ভেতরে ভেতরে তৈরি হচ্ছিল একটা বৈপরীত্য, নিজেকে ভাঙার ইচ্ছা। নিজেকে গড়ে নিচ্ছিলেন কোনো বড় কাজের জন্য। তারই পূর্বাভাস হল সরকারি কর্ম থেকে অকাল অবসর গ্রহণ। তারই অন্যতর লক্ষণ 'ভারতবর্ষ' পত্রিকা প্রকাশের উদ্যোগ। অজ্ঞেয়বাদী মানুষটির মধ্যেও চলছিল দোলাচল। তার্কিক অন্তরকে অধিকার করছিল খুব ধীরে ধীরে এক সুনিশ্চিত ভক্তিবাদ। এই সময়, তাঁর জীবনসায়াহ্নে, গানের মধ্যে আসতে থাকে এক সমাহিত আত্মসর্জনের ঔদাস্য। যিনি একদা গানে ভেবেছিলেন 'এ জগতে আমি বড়ই একা' তিনি এবার বললেন—

না না, তবু সেই দুখ জাগিয়া থাকুক আমরণ মম স্মরণে ;
আমি, লভেছি যদি এ বিরস জীবন, লভিব সরস মরণে।

মৃত্যুকে তাঁর সরস মনে হতে লাগল এবার। বুক এগিয়ে সেই মরণ মায়ের মতো ভালবেসে তাঁকে কোলে নিতে আসছে বলে তাঁর জাগল বিশ্বাস আরেকটি গানে। মনে হল, নীল আকাশ যখন ভরে গেছে চাঁদের আলোয় তখন ঘরের ভিতর প্রদীপ জালার উদ্যম বৃথাই। কিন্তু সেই কথা কি সত্য ?

সত্য হোক আর না হোক, দ্বিজেন্দ্রলালের শেষ জীবনের গানগুলি কেবলই গভীর হয়ে উঠছিল জীবনস্পর্শিতার গৌরবে। পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গার বন্দনা গান,

কিংবা মহাশক্তির 'চরণ ধরে আছি পড়ে' এই উচ্চারণে, অথবা 'ও কে গান গেয়ে গেয়ে চলে যায়' গৌরাঙ্গের এই শরণমন্ত্রে তাঁর গান ক্রমশ আত্মচেতনার অতল টানে প্রকরণ আর সুরের চমক ভেঙে সংবদ্ধ হচ্ছিল ভাবের গহনতায়, বিশ্বাসের বিশ্বে। তাঁর শেষ বয়সের দুখানি গানে ফুটেছে একই শ্রান্তি আর একই আত্মনিবেদনের আর্তি :

সাঙ্গ আমার ধূলাখেলা সাঙ্গ আমার বেচকেনা
এখানে বড় শ্রান্ত আমি, ও মা! কোলে তুলে নে না

সাঙ্গ হল ধূলাখেলা হয়ে এল সন্ধ্যাবেলা
ঘুমিয়ে পড়ি এখন আমি মা তোমার ঐ বুকের মাঝে।

এ-গানের আন্তরিক উচ্চারণে সুর কখনও বাণীকে ছাপিয়ে যায় না বরং কানে বাজে কথা ও সুরের একটি সুষম সংগতি। মনে হয়, দ্বিজেন্দ্রলাল শেষ পর্যন্ত গানের মধ্যে নিঃসংশয়ে বুঝি খুঁজে পেয়েছিলেন তাঁর আত্মস্থ জগৎ। কিন্তু ঠিক সেইসময় মাত্র পঞ্চাশবছর বয়সে মৃত্যু তাঁকে ছিনিয়ে নিল।

# ‘তুমি নির্মল কর মঙ্গল করে’

## রজনীকান্তের গান

রজনীকান্ত জন্মেছিলেন ১৮৬৫ সালে। তার মানে রবীন্দ্রনাথের চার বছরের অনুজ তিনি, দ্বিজেন্দ্রলালের চেয়ে দুবছরের। কিন্তু তিনি স্বল্পজীবী। মৃত্যু ঘটে মাত্র পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে ১৯১০ সালে। রবীন্দ্রপ্রতিভার তীব্র উদ্ভাসন ঘটেনি তখনও, পাননি বিশ্বস্বীকৃতি, রবিরাহুর দল তখনও তাঁর প্রতিবাদী। রঙ্গমঞ্চে চলছে দ্বিজেন্দ্রলালের জনপ্রিয় নাটক ও নাট্য-সংগীতের তুমুল সম্প্রচার। অতুলপ্রসাদ তখন লক্ষ্ণৌ শহরে লচা-ঠুংরির ধাঁচে বাংলা গান বাঁধছেন। সে-সময়ে মেডিকেল কলেজের একটি কটেজে দুশ্চিকিৎস্য কর্কটরোগে মূক গায়ক রজনীকান্ত নীরবে বিদায় নেন। তবে বিদায়কালেও তাঁর বিশ্ববিধানের ওপর কোনো অভিমান ছিল না। তখনও গান লিখছেন ভক্তির, আত্মসমর্পণের। ঈশ্বরকে বলছেন ‘দয়াল’। কর্কটরোগেব গলক্ষতে অস্ত্রোপচারে কথা বন্ধ হয়ে গেছে, তবু অসহ্য যন্ত্রণা সয়ে রোজনামচায় লিখছেন :

> যাঁর দয়ায় এ পর্যন্ত বেঁচে আছি, তাঁবই দযায় কষ্ট পাচ্ছি। নিচ্ছেন. আগুনে দগ্ধ করে পাপের খাদ উডিয়ে দিয়ে নিচ্ছেন,...আমাকে এই আগুনের মধ্যে ফেলে না দিলে খাঁটি হব কেমন করে?

একেবারে সন তারিখ মেলানো এখন আর সম্ভব নয়, তবে মোটামুটি একই সময়ে হাসপাতালে বসে লিখছেন ‘দয়াল আমার’ গানে :

> আগুন জ্বেলে, মন পুড়িয়ে
> দেয় গো পাপের খাদ উড়িয়ে
> ঝেড়ে ময়লা-মাটি, করে খাঁটি
> স্থান দেয় অভয়-শ্রীচরণে।

রোজনামচা আর গানের এমন মিল রজনীকান্তের আত্মজীবনের দিকে ফেরায় আমাদের। তাঁর গান তাঁর আত্মজীবনেরই অংশ। নিজে আইনজীবী ছিলেন বলেই নিজের মর্মান্তিক রোগযন্ত্রণার মধ্যে দেখলেন বিচারকর্তার দৈবী বিচার, তাই লিখলেন :

> আমি যে বিচার দেখছি—Splendid ; এমন আর হয় না। Sub-judge, মুন্সেফের সাধ্য নেই এমন বিচার করে। আমার সম্বন্ধে যে বিচার হচ্ছে, আমার কথাটি বলবার জো-টি রাখেনি যে, Punishment is untimely or too severe ; এ বড়ো জবর Penal code, অভ্রান্ত—নির্দোষ।

রজনীকান্তের গানে ঈশ্বরের এই এক আশ্চর্য প্রতিমা ঘুরে ঘুরে আসে। মর্ত্যপাপের বিচারকর্তার প্রতিমা। গীতিকার যেতে চান সেইখানটায়, 'যেখানে সে দয়াল আমার বসে আছে সিংহাসনে'। ঈশ্বরের এই বিচারক মূর্তি এবং ভক্ত-গীতিকারের পাপী বিগ্রহ বাংলা গানে একটু নতুন। এমন নয় যে কর্কটরোগে বাক্য-হারা হবার পরে তাঁর মনে জেগেছে এই পাপচেতনা। বস্তুত সেই উৎকট রোগ তাঁর শরীরকে আশ্রয় করবার অন্তত পাঁচ বছর আগেই এমন গান জেগে উঠেছে যে,

> জ্ঞান-মুকুট পরি', ন্যায়-দণ্ড করে ধরি',
> বিচার-আসনে যবে বসিবে, হে বিশ্বপিত ;
> আজনম পাপ-লিপ্ত, লয়ে এ তাপিত চিত,
> দূরে রব দাঁড়াইয়া, লজ্জিত কম্পিত ভীত ;

দণ্ডধারী এই ঈশ্বরের দেওয়া ব্যাধি ও বেদনাকে তিনি অবশ্য শেষ পর্যন্ত মেনে নিয়েছিলেন পরম আস্তিকতায় ও দুর্লভ বিশ্বাসে। এমন কি আত্মসন্তুষ্টিকেও মনে করেছিলেন পাপ, তাই ব্যাধিপ্রহৃত মানুষটির মনে হয়েছিল—

> ভাবিতাম, 'আমি লিখি বুঝি বেশ,
> আমার সঙ্গীত ভালবাসে দেশ',
> তাই, বুঝিয়া দয়াল ব্যাধি দিল মোরে,
> বেদনা দিল প্রচুর।

'সকল রকমে কাঙাল' মানুষটি আসলে তো অন্তরসম্পদে ছিলেন পরিপূর্ণ। রজনীকান্তের জীবিতকালে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন বিতর্কিত ও নিন্দিত লেখক, দ্বিজেন্দ্রলাল ছিলেন রবীন্দ্রানুরাগীদের ঘৃণা ও সমালোচনার পাত্র, অতুলপ্রসাদ তাঁর সমাজ-বহির্ভূত পরিণয়ের কারণে ছিলেন উপেক্ষিত ও পরবাসী। একমাত্র রজনীকান্ত ছিলেন অনিন্দিত এবং জনপ্রিয় সারস্বত কর্মী। নিজেও লিখে গেছেন : 'আমাকে দেশসুদ্ধ লোকে কেমন করে যে ভালোবাসলে তা বলতে পারি না। আমার মলিন প্রতিভাটুকুর কত যে আদর করলে।…এমন নিরবচ্ছিন্ন নিন্দাবর্জিত যশ বাংলার কোন্ কবি পেয়েছে ?'

বস্তুত এই উক্তিতেই গাঁথা আছে রজনীকান্তের সৃজনধর্মের মূল ট্র্যাজেডি। তাঁর জীবন বা জীবনযাপনের ধরন, তাঁর রচনাভঙ্গি বা বক্তব্য কোনোদিন কোনো বিতর্ক বা বিরক্তি জাগায়নি কারও মনে। জীবিতকালেই যে-লেখক থাকেন স্বীকৃত ও শ্রদ্ধেয়, ভবিষ্যৎকাল তাঁর আর কোনো পুনর্বিবেচনা করে না। তাছাড়াও তাঁর ক্ষেত্রে স্বল্পজীবনের শোচনীয়তা আর ব্যাধিবিড়ম্বিত অস্তিত্ব তৈরি করে এক কারুণ্যভরা মিথ। তিনি হয়ে ওঠেন এক শ্রদ্ধেয় স্মৃতি। বিচার-বিতর্কে, দ্বন্দ্বে-দোলাচলে উত্তরপুরুষ আর তাঁকে অবলম্বন করে না। কান্তগীতি যে আমাদের দেশে তেমন করে ছড়িয়ে পড়েনি এইটাই তার বড় কারণ।

কিন্তু এটাও ঠিক, রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল ও অতুলপ্রসাদের গানের ধারায় এমন গভীরভাবে হয়ে যায় আমাদের অবগাহন যে, রজনীকান্তের গান তেমন করে আর টানে না। হয়ত ঐ তিন গীতিকাবের আলাদা গীতব্যক্তিত্ব ও ভাববিচিত্র্য আচ্ছন্ন রাখে আমাদের। রবীন্দ্রসংগীত, দ্বিজেন্দ্রগীতি ও অতুলপ্রসাদের গান যেমন বাণী ও রূপে এক একটা নিজস্ব ধরন গড়ে তোলে শ্রোতাদের শ্রুতিতে, কান্তগীতি তেমন একক ঔজ্জ্বল্যে উদ্ভাসিত হয় না। এমনও মনে হতে পারে, রবীন্দ্রনাথের গানে যত বৈচিত্র্য ও আত্মতা, কিংবা দ্বিজেন্দ্রলালের গানে যেমন নাট্যধর্ম ও বিদেশী সুরের সমীকরণ তেমন কই কান্তগীতিতে? অন্তত একথা তো মনে হবেই যে, অতুলপ্রসাদের গানে তাঁর আত্মবেদনা ও আর্তি যেমন গভীরভাবে নাড়া দেয় আমাদের, রজনীকান্ত তো তার একাংশও ফোটান না তাঁর গানে। তাঁর গানে বরং আত্মবেদনা ঢেকে যায় আত্মদীনতায়, ব্যাধিজর্জরতাকে ভাবেন দৈবী আশীর্বাদ, দুঃখ ও সন্তাপকে ভাবেন পাপজ। এ সবের কারণ হলো তিনি যত বড় শিল্পী তার চেয়ে বড় ভক্ত। সেই ভক্তিতে আবার দীনতা বড় প্রকট। যেমন :

তুমি অন্তহীন, বিরাট, এ নিখিল-ব্যাপী অচ্যুত-অক্ষর।
আমি ধূলি-কণিকা, ক্ষুদ্র, দীন, নগণ্য, তুচ্ছ বিনশ্বর।
তুমি পরম সুন্দর, বিশ্বভূষণ, পুণ্য-বিভব-অলঙ্কৃত।
আমি অধম কুৎসিত, দুঃখপীড়িত, নিত্য-পাপ-কলঙ্কিত।

রবীন্দ্রনাথও অবশ্য তাঁর গানে প্রতিদিন জীবনস্বামীর সম্মুখে করজোড়ে দাঁড়ানোর বিনতি ঘোষণা করেন অথবা তাঁর চরণধুলার তলে মাথা নত করতে চান, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এমন উচ্চারণও থাকে যে, 'আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর তোমার প্রেম হত যে মিছে'। রজনীকান্ত যে-দীনতার সাধনা করেন তা কতটা সত্য আর

কতটা আত্মপ্রবঞ্চনা বলা কঠিন, তবে রোগশয্যায় বসে ব্যাধির তাড়নায় কাতরতা প্রকাশ না করে গানই তিনি লিখেছেন। চিকিৎসক ও বন্ধুদের প্রশ্নের উত্তরে লিখে জানিয়েছেন, 'যন্ত্রণা যখন খুব বেশি বাড়ে, তখন এই রচনা ছাড়া আমার শান্তির আর দ্বিতীয় উপায় থাকে না।' সৃজনের বেদনা তাঁকে ভুলিয়ে রাখতো দেহের বেদনা, তাঁর গান ছিল এতটাই আত্ম-শুশ্রূষাকারী। কিন্তু সেই সঙ্গে এই কথাটিও মনে রাখা দরকার যে রজনীকান্তের কাছে সৃজন মানে ছিল শরণ। তাই ডাক্তার হেমেন্দ্রনাথ বক্সী তাঁর চোখে জল দেখে যখন ব্যাকুল হয়ে প্রশ্ন করেন, 'আপনার কি বড়ো কষ্ট হচ্ছে? কাঁদছেন কেন? ইনজেকশন দেব কি?' উত্তরে রজনীকান্ত লিখে জানান,

আমি কাঁদি যার তরে
 সে যে মোর অন্তরের হিয়া
মরমের সবটুকু
 জীবনের সবটুকু দিয়া।
তুমি ভাবিতেছ বুঝি
 মিথ্যা বেদনার তরে কাঁদি?
ছি ছি বন্ধু, ছি ছি সখা!
 আমাকে কোরো না অপরাধী।

এমন মানুষও কিন্তু শেষশয্যায় দেখতে চেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথকে, তাঁকে লিখেছিলেন, 'আমাকে একটু পায়ের ধুলো দিয়ে যান মহাপুরুষ'। হাসপাতালে রবীন্দ্রনাথকে শুনিয়েছিলেন তাঁর গান। নিজে তখন ব্যাধিতে রুদ্ধকণ্ঠ, তাই, গান গেয়েছিলেন তাঁর পুত্রকন্যা এবং সঙ্গে হারমোনিয়াম বাজিয়েছিলেন তিনি। স্বভাব-সংযত রবীন্দ্রনাথ রজনীকান্তের সেই ঐশী বিশ্বাস ও জীবনপ্রীতি দেখে, বাড়ি ফিরে গিয়ে, পরে যে অসামান্য চিঠি লেখেন মুমূর্ষু গীতিকারকে তাতে 'মানবাত্মার একটি জ্যোতির্ময় প্রকাশ' শুধু নয়, সেই সঙ্গে 'আত্মার সত্যপ্রতিষ্ঠা'ও দেখা যায়। তিনি লিখেছিলেন এছাড়াও :

> সছিদ্র বাঁশির ভিতর হইতে পরিপূর্ণ সংগীতের আবির্ভাব যেরূপ, আপনার রোগক্ষত-বেদনাপূর্ণ শরীরের অন্তরাল হইতে অপরাজিত আনন্দের প্রকাশও সেইরূপ আশ্চর্য!

১৩১৭ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে রবীন্দ্রনাথ দেখে আসেন রজনীকান্তকে এবং তার পরবর্তী ২৮শে ভাদ্র দেহাবসান ঘটে সেই ঈশ্বর-সমর্পিত মানুষটির। কিন্তু মাঝখানের

দিনগুলিতে গান থামেনি। লিখে গেছেন কাগজ-কলমের সমন্বয়ে, সুর দিয়েছেন হারমোনিয়ামে, গান গাইয়েছেন শিষ্য দেবেন চক্রবর্তীকে দিয়ে।

আর কী সেই সব গান! জীবনসম্পৃক্ত, গাঢ়, বিবিক্ত। বিশ্বাসী উচ্চারণের পাশে মাঝে মাঝে তাতে ঝলসে ওঠে কৌতুকও বুঝিবা। যেমন একটা গানে মৃত্যু বিষয়ে বলে ওঠেন

সে ব'স্‌ল কিনা ব'স্‌ল তোমার শিয়রে—
তুমি মাঝে মাঝে মাথা তুলে
সেই খবরটা নিয়ো রে।
( ও সে ব'স্‌ল কিনা )

মৃত্যু-ভাবনার ছোঁওয়া তাঁর গানের ভুবনে অবশ্য আগেই লেগেছিল। আধুনিক অর্থে কোনো 'অ্যালিয়েনেশন' ছিল না তাঁর, তবু সুস্থ-সবল মানুষটি কতকাল আগেই লিখেছিলেন :

কবে তৃষিত এ-মরু ছাড়িয়া যাইব
তোমারি রসাল নন্দনে।
কবে তাপিত এ-চিত করিব শীতল
তোমাবি করুণা-চন্দনে!

কোনো জাগতিক তাপ ছিল কি তাঁর? কোনো ব্যর্থতা বা স্ববিরোধ? খুব খুঁজেও তেমন কিছু জানা যায় না। স্বভাবে রজনীকান্ত ছিলেন শান্ত ও সমর্পিত। এই গান রচনার যে বিবরণ পাই তা এই রকম :

> জানিস এটা একটা বাজে কাগজের পাতায় লিখে টেবিলের ওপরেই ফেলে রেখেছিলাম—কখন এসে তোর বৌঠান লেখা দেখেছেন—আমি চেম্বারের কাজ সেরে এসেছি—নাইতে যাব—ভাদুড়ী তামাক নিয়ে এল—কোথায় ছিলেন তোর বৌঠান—সেই লেখাটুকু নিয়ে এসে আমাকে বললেন, 'একি লিখেছ তুমি—আমার যে পড়েই কান্না আসছে। কেন এমন করে লিখলে?' আমি বললাম—'আরে কেন লিখেছি তার কি কোন জবাব আছে? যা কলমে আসে তাই লিখি।' 'আচ্ছা বল যে এ গান তুমি গাইবে না।' আমি বললাম, 'না গাইব না।' তবে তোকে বলে রাখি—যখন আমি চলে যাব তখন সবাই মিলে এই গানটি গাইতে গাইতে আমাকে মহাযাত্রা করিয়ে দিবি—ভুলিস্‌নে।

জীবিতকালেই এমন মরণোত্তর আকাঙ্ক্ষা এক আঁচড়ে এঁকে দেয় সত্যিকারের রজনীকান্তকে। আত্মপ্রিয়তা ছিল তাঁর সুগভীর। হয়ত সেই জন্যেই হাসপাতালে শুরু করেছিলেন আত্মজীবনীর খসড়া।

হয়তো সেই আত্মজীবনী শেষ হবে কি না এ-সংশয় ছিল তাঁর, তাই মৃত্যু-শয্যায় নলিনীরঞ্জন পণ্ডিতকে বলেছিলেন তাঁর জীবন-চরিত লিখতে। 'রোগশয্যা-শায়ী রজনীকান্ত তাঁহার জীবন-চরিত লিখিবার জন্য আমাকে অনুরোধ করেন'—জানিয়েছেন নালিনীরঞ্জন। সে কথা রেখেছেনও তিনি। কিন্তু সম্ভবত রজনীকান্তের অন্তর্জীবন স্পষ্ট হয়েছে তাঁর গানেই।

## ২

'আমার জীবন ক্ষুদ্র, বৈচিত্র্যহীন, নীরস' এই বলে রজনীকান্ত তাঁর আত্ম-জীবনীর খসড়া শুরু করেছিলেন। মনে করিয়ে দিয়েছিলেন, 'এই অকিঞ্চিৎকর জীবনে এমন কোনও ঘটনাই ঘটে নাই, যাহার সন বা তারিখ না পাইলে, পাঠকগণের মনে কোনো অভাববোধের সঞ্চার হইতে পারে। এ জীবনে কোনো পানিপথের যুদ্ধ বা চৈতন্যদেবের গৃহত্যাগের মতো বিশিষ্ট ঘটনার সমাবেশ হয় নাই।'

কিন্তু শিল্পীর জীবন গঠনে এমন সব অন্তঃস্রোত থাকে, বহিরঙ্গ ও প্রসারিত দেশকালে এমন সব নিগূঢ় সংযোগে গড়ে ওঠে সৃজনাবেগ যে বাইরের চোখ-ধাঁধানো ঘটনা থেকে তার দিশা মেলা কঠিন হয়।

১৮৬৫ সালের ২৬শে জুলাই পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জ মহকুমার ভাঙাবাড়ি গ্রামে জন্মেছিলেন রজনীকান্ত সেন। এই ভাঙাবাড়ি আগে ছিল নলবন আর পানের বরজে কীর্ণ। ময়মনসিংহ জেলার সহদেবপুর গ্রাম থেকে বৈদ্যবংশের দুই সহোদর রাজারাম ও রাজেন্দ্ররাম আসেন ভাঙাবাড়িতে। গ্রাম্য বিলটির সংস্কার ঘটে। গ্রামখানি ক্রমে বর্ধিষ্ণু হয়ে ওঠে। ব্রাহ্মণ কায়স্থরা বসতি করতে থাকেন, গড়ে ওঠে চতুষ্পাঠী ও বঙ্গবিদ্যালয়। সহদেবপুর থেকে আসা সেন পরিবারে বিবাহ করেন জনৈক যোগিরাম সেন। তাঁরই পুত্র গোলোকনাথ সেন রজনীকান্তের পিতামহ। তাঁর জন্মের আগেই পিতৃবিয়োগ ঘটে। তার ফলে গোলোকনাথ লালিত হন মামার বাড়িতে। মামার দানরূপে তিনি পান একটি বাড়ি ও সামান্য জমি। গোলোকনাথ ছিলেন হতদরিদ্র। তাঁর দুই সন্তান গোবিন্দনাথ ও গুরুপ্রসাদ। দুই ভাই রাজশাহীতে থেকে খুব কষ্টে বিদ্যার্জন করেন। ক্রমে

বড়ভাই গোবিন্দনাথ হন প্রথমে মুহুরি, পরে সফল উকিল। ছোটভাই গুরুপ্রসাদ দাদার আনুকূল্যে পারশি ও সংস্কৃত শেখেন। ব্যুৎপত্তি ঘটে ইংরাজি ভাষাতেও। পরে ওকালতি পাস করে মুনসেফ হন এবং শেষ পর্যন্ত সাবজজ হয়ে অবসর নেন। রজনীকান্ত তাঁর তৃতীয় সন্তান।

ভাঙাবাড়ির সেন বংশ গোবিন্দনাথ ও গুরুপ্রসাদের যৌথপ্রয়াসে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। পৈতৃক পর্ণকুটির ভেঙে গড়ে ওঠে প্রাসাদ ও ঠাকুরদালান। শুরু হয় দোল-দুর্গোৎসব। কিন্তু পুরো যৌথ পরিবারটির সুখের দিন ধ্বস্ত হয়ে যায় মৃত্যুর অভিপাশে। দুই ভাইয়ের অজস্র সন্তানবিয়োগ ঘটে। রজনীকান্তের অগ্রজ ও অগ্রজা মারা যান, পরে অনুজ জানকীকান্ত মারা যান জলাতঙ্ক রোগে। আশ্চর্য যে রজনীকান্তের জ্যেঠতুতো দুই দাদা বরদাগোবিন্দ ও কালীকুমার যৌবনকালেই মারা যান মাত্র চব্বিশ ঘণ্টার ব্যবধানে। বরদাগোবিন্দের কিশোর-পুত্র মারা যায় কৈশোরে। এই সময় পরিবারে আর্থিক বিপর্যয়ও দেখা দেয়, কেন না রাজশাহীর কুঠিতে গচ্ছিত পরিবারের অর্থভাণ্ডার নষ্ট হয় কুঠি দেউলিয়া হয়ে পড়ায়।

রজনীকান্তের শৈশব থেকে যৌবন এই উন্নয়ন ও অবনয়নের দোলাচলে ঘেরা। তার সঙ্গে চলে মৃত্যুর প্রহার। এখানে আমাদের প্রতিতুলনায় মনে পড়ে, রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সমৃদ্ধ ও সম্পন্ন ঠাকুরবাড়ির সন্তান, দ্বিজেন্দ্রলালের পিতা ছিলেন কৃষ্ণনগরের রাজার দেওয়ান, অতুলপ্রসাদের পিতা ছিলেন ঢাকার বিখ্যাত চিকিৎসক। এ সব উদাহরণের পাশে রজনীকান্তের ললাটলিপি ছিল ভিন্নতর। উনিশ শতকের অনুন্নত এক গ্রাম্য পরিবেশে তাঁর লালন ঘটে আকস্মিক ভাগ্য বিপর্যস্ত ও মৃত্যুসন্তপ্ত পরিবারে। মেধাবী ও তৎপর রজনীকান্ত ১৮৮২ সালে বোয়ালিয়া থেকে এনট্রান্স পাস করে রাজশাহী কলেজে ভর্তি হন। ১৮৮৩ সালে হিরন্ময়ী দেবীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। ১৮৮৩ সালে তিনি এফ. এ. পাস করেন। পরের বছর স্বল্পদিনের ব্যবধানে প্রথমে পিতা ও পরে জেঠা মারা যান। তখন বিরাট যৌথ পরিবারের ভার পড়লো জেঠতুতো দাদা উমাশঙ্করের উপর। তাঁরই আনুকূল্যে রজনীকান্ত ১৮৮৯ সালে বি. এ. এবং ১৮৯১ সালে আইন পরীক্ষায় পাস করে রাজশাহীতে ওকালতি শুরু করেন। এর কিছুকাল আগে তাঁর সাতাশ বছর বয়সে পাবনার সিরাজগঞ্জ থেকে প্রকাশিত 'আশালতা' পত্রিকায় রজনীকান্তের প্রথম মুদ্রিত রচনার হদিশ মেলে। তাঁর সারস্বত সাধনার আত্মপ্রকাশে এতটাই দেরি হয়েছিল।

রজনীকান্তের জীবনে আত্মজনের মৃত্যুতে যে ধারাবাহিক বিস্তার আমরা দেখি

তার সম্প্রসারণে উল্লেখযোগ্য ১৮৯৭ সালে তাঁর জেঠতুতো দাদা উমাশঙ্কর গলক্ষত জনিত কর্কটরোগে মারা যান। অচিরে প্রথমে রজনীকান্তের তৃতীয় পুত্র ভূপেন্দ্রনাথ এবং প্রথমা কন্যা শতদলবাসিনী বিদায় নেন। উভয়ক্ষেত্রেই তিনি গেয়ে ওঠেন :

তোমারি দেওয়া প্রাণে তোমারি দেওয়া দুখ,
তোমারি দেওয়া বুকে তোমারি অনুভব।
তোমারি দু-নয়নে তোমারি শোকবারি,
তোমারি ব্যাকুলতা তোমারি হা-হা-রব।

এই ভক্তি-বিনম্র শুদ্ধশ্রী শান্ত আস্তিক্যবাদ রজনীকান্ত পেলেন কোথা থেকে ? মূলত নগরজীবনের বাইরে গ্রামে ও মফঃস্বলের পুরনো মূল্যবোধে তাঁর জীবন গড়ে উঠেছিল তাই সময়ের অসূয়া বা সমকালীনদের নিন্দা-ঈর্ষা তাঁকে সইতে হয়নি। ভাঙাবাড়ি গ্রামে তিনি ছিলেন স্বভাবনেতা। কৈশোর থেকেই তাঁর আবৃত্তিকুশলতা, স্মরণশক্তি, সংগীত-পটুতা, অভিনয়-শক্তি, সমাজহিতৈষা ও জিমনাস্টিকস্-দক্ষতা তাঁকে জনপ্রিয় বিগ্রহে পরিণত করেছিল। যৌথ পরিবারে দেখেছিলেন জেঠার প্রতি পিতার সর্বৈব আনুগত্য, জীবনে পেয়েছিলেন গৃহকর্মনিপুণা সেবাময়ী বিনতা পত্নী, পেয়েছিলেন অগ্রজদের স্নেহময় ভালবাসা—এ সবই তাঁর অন্তর্জীবনকে শান্তভাবে গড়ে তোলে। সেই অর্জন থেকে তিনি লেখেন :

কে রে হৃদয়ে জাগে শান্ত শীতল রাগে
মোহতিমির নাশে প্রেমমলয়া বয়।

রজনীকান্তের গানের মূলসুর এই শান্ত শীতলতা। মৃত্যুর রুদ্রতা তাঁকে বিচলিত করতে পারেনি, কেননা তাকে তিনি মোহতিমিরনাশন রূপে দেখেছেন। ঈশ্বরকে তিনি দেখতে পান প্রসারিত জনসমাজে, পরিবারের বেষ্টনীতে। তাই লিখেছিলেন :

সাধুর চিতে তুমি আনন্দ রূপে রাজ
ভীতি-রূপে জাগ পাতকীর প্রাণে ;
প্রেম-রূপে জাগ সতীর হিয়ামাঝে
স্নেহ-রূপে জাগ জননী নয়ানে !

এ-গান শুনতে শুনতে অবশ্য মনে পড়তে পারে দ্বিজেন্দ্রলালের সেই গান :

সতীর পবিত্র প্রণয়-মধুমা
শিশুর হাসিটি জননীর চুমা
সাধুর ভকতি প্রতিভা শকতি
এ যে তোমারই মাধুরী তোমারই মহিমা !

উল্লেখযোগ্য যে, রজনীকান্তের গানে দ্বিজেন্দ্রগীতির প্রভাব নানাভাবে পড়েছে। তিনি যখন রাজশাহীতে ওকালতি করতেন তখন ১৮৯৪-৯৫ নাগাদ দ্বিজেন্দ্রলাল সেখানে যান আবগারি বিভাগের পরিদর্শক হিসাবে। তাঁর হাসির গানের মজলিশ রজনীকান্তকে এতটাই মজিয়ে দেয় যে সেই থেকে তিনি বহু হাসির গান লেখেন। তার ফলে তাঁর একমুখী সংগীতের ধারায় এসে মিশে যায় কিছুটা সমাজ-চেতনা ও হাস্যরস। এতে তাঁর গান প্রসারিত হয় আত্মবৃত্ত থেকে ব্যাপকতর অন্বেষণে। রজনীকান্ত সম্পর্কে যাঁরা আলোচনা করেছেন তাঁরা তাঁর হাসির গানেই শুধু দ্বিজেন্দ্রপ্রভাবের প্রত্যক্ষতা দেখেছেন। খোঁজ করলে দেখা যাবে তাঁর শান্ত রসাস্পদ গানেও দ্বিজেন্দ্রপ্রভাব অবিরল। আরেকটি কথা বিচার্য, দুজনেরই গান রচনা ও গায়ক-জীবনের ভিত্তিতে ছিল দাম্পত্যপ্রণয়ের আনন্দ ও শান্তি। দুজনেই কর্মস্থলে বসবাসকালে সবচেয়ে বেশি গান লিখেছেন এবং গান গেয়ে জনপ্রিয় হয়েছেন। দ্বিজুবাবুর গান গাওয়ার স্মৃতি সেকালের অনেক লোকই লিখে গেছেন। জানা যায় 'রজনীকান্তের গান গাহিবাও অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল। ক্রমাগত পাঁচ-ছয় ঘণ্টা এক সঙ্গে গান গাহিয়াও কখনো তিনি ক্লান্তি বোধ কবিতেন না। তন্ময় হইয়া যখন তিনি স্বরচিত গান গাহিতেন তখন তিনি আহার-নিদ্রা, জগৎ-সংসার সবই ভুলিয়া যাইতেন, বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইতেন।' পরবর্তী কালে দেখা যায় তাঁর কণ্ঠের অতিব্যবহার কর্কট রোগের কারণ হয়ে ওঠে।

এইখানে আরেকটি কথা মনে রাখতে হবে। স্বরচিত গান গাওয়াতেই তাঁর আনন্দ ছিল বেশি। 'তাই তিনি কিশোর বয়স হইতে নিজে গান বাঁধিবার চেষ্টা করিতেন। প্রতিমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া ভাববিভোর বালক স্বরচিত ভক্তি-রসাত্মক গান গাহিতেছেন—সে এক অপূর্ব দৃশ্য।' এই তাৎক্ষণিক ও ঔপলক্ষিক গান রচনার কৌশল তিনি সম্ভবত পেয়েছিলেন পিতা গুরুপ্রসাদের সূত্রে। সেন পরিবার ছিল শাক্ত কিন্তু গুরুপ্রসাদ ছিলেন কীর্তনে আসক্ত। 'পদচিন্তামালা' নামে কৃষ্ণভজনের সম্পূট প্রকাশ করে অগ্রজকে উপহার দিলে গোবিন্দনাথ বলেন, 'বই ভালো হয়েছে, কিন্তু এতে মায়ের নাম কই?' অচিরে গুরুপ্রসাদ লিখে ফেলেন শক্তিগীতিসম্ভার 'অভয়া বিহার'। এখানে মনে আসে যে, আগমনী ও বিজয়ার গান নিয়ে রজনীকান্তের ভক্তিসঙ্গীতগুচ্ছ 'আনন্দময়ী' প্রকাশ পায় ১৯১০ সালে, তাঁর মৃত্যুর পরে। একই বছরে বেরোয় তাঁর তত্ত্বসঙ্গীতের সংকলন 'অভয়া'।

গান লেখার ব্যাপারে তাঁর স্বভাবদক্ষতা ছিল। রজনীকান্তের কন্যা শান্তি দেবী তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন, স্কুলের বাৎসরিক উৎসবে বা কোনো উপহার প্রদান-

সম্বন্ধে শিক্ষকরাও রজনীকান্তকে দিয়ে গান লিখিয়ে গাওয়াতেন। কলকাতার ছাত্রজীবনে তাঁর ঘনিষ্ঠতা হয় সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে। তাঁর সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত এবং গান শোনার ও গাওয়ার কথাও শান্তি দেবী লিখেছেন।

রজনীকান্তের জীবনের পশ্চাদ্‌ভূমিতে ছিল শোকের ব্যাপক অভিজ্ঞতা কিন্তু বাস্তবের ব্যাঘাত ছিল অসফল আইনব্যবসায়। 'ওকালতীতে ঐকান্তিক অনুরাগ না থাকায় তিনি সংসারে প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারেন নাই। এমন কি, পিতা ও জ্যেষ্ঠতাতের পরিত্যক্ত যৎকিঞ্চিৎ বিশৃঙ্খলাপূর্ণ জমিদারির বন্দোবস্ত করিতে মহলে গিয়াও তিনি গানবাজনায় সময় কাটাইয়া ফিরিয়া আসিতেন।...মক্কেলরা তাঁহার দ্বারা সময় মত কাজ পাইত না'—লিখেছেন নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত। রজনীকান্ত লিখে গেছেন, 'আমি আইনব্যবসায়ী, কিন্তু আমি ব্যবসায় করিতে পারি নাই। কোন্ দুর্লঙ্ঘ্য অদৃষ্ট আমাকে ঐ ব্যবসায়েব সহিত বাঁধিয়া দিয়াছিল কিন্তু আমার চিত্ত উহাতে প্রবেশ লাভ করিতে পারে নাই।' এই সূত্রে মনে পড়ে অতুলপ্রসাদ সফল হয়েছিলেন এই আইন ব্যবসায়েই। দ্বিজেন্দ্রলালের ক্ষেত্রে অবশ্য গানরচনার বাধা ছিল তাঁর সরকারী কর্মের দাস্য।

যাই হোক, আইনব্যবসায়ের ব্যর্থতা ঢাকতে তিনি মনোযোগ দিয়েছিলেন গান গাওয়ায় ও গান রচনায়। 'প্রত্যেক পারিবারিক বৈঠকে ও সাধারণ সম্মিলনে রজনীবাবুকে গান রচনা করিতে ও গাহিতে হইত।' গান রচনার তাঁর তাৎক্ষণিক ক্ষিপ্রতা বিষয়ে কিছু তথ্য মেলে। নলিনীরঞ্জনের সাক্ষ্যে জানা যায়, 'কখনো ভাবিয়া লিখিতে তাঁহাকে দেখি নাই।' আরেকটি বিবরণ আছে জলধর সেনের জবানীতে :

> এক রবিবারে রাজশাহীর লাইব্রেরিতে কিসের জন্য যেন একটা সভা হইবার কথা ছিল। রজনী বেলা প্রায় তিনটার সময় অক্ষয়ের বাসায় আসিল। অক্ষয় বলিল, 'রজনীভায়া, খালি হাতে সভায় যাইবে? একটা গান বাঁধিয়া লও না।' রজনী যে গান বাঁধিতে পারিত, তাহা আমি জানিতাম না; আমি জানিতাম, সে গান গাহিতেই পারে। আমি বলিলাম, 'এক ঘণ্টা পরে সভা হইবে, এখন কি গান বাঁধিবার সময় আছে?' অক্ষয় বলিল, 'রজনী একটু বসিলেই গান বাঁধিতে পারে।' রজনী অক্ষয়কে বড় ভক্তি করিত। সে তখন টেবিলের নিকট একখানি চেয়ার টানিয়া লইয়া অল্পক্ষণের জন্য চুপ

করিয়া বসিয়া থাকিল। তাহার পরেই কাগজ টানিয়া লইয়া একটা গান লিখিয়া ফেলিল। আমি তো অবাক। গানটা চাহিয়া লইয়া পড়িয়া দেখি, অতি সুন্দর রচনা হইয়াছে। গানটি এখন সর্বজন পরিচিত—

তব চরণ নিম্নে উৎসবময়ী শ্যাম-ধরণী সরসা ;
ঊর্ধ্বে চাহ অগণিত-মণি-রঞ্জিত নভো-নীলাঞ্চলা,
সৌম্য-মধুর-দিব্যাঙ্গনা শান্ত-কুশল-দরশা।

এই বিবরণে উল্লিখিত অক্ষয় হলেন ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, যিনি ছিলেন রজনীকান্তের অকৃত্রিম হিতার্থী এবং তাঁর প্রথম গীতসংকলন 'বাণী' (১৯০২) প্রকাশনার ব্যাপারে অগ্রণী। বস্তুত রজনীকান্তের গান যখন বিদ্বৎ'-সমাজে এমন কি রবীন্দ্রনাথের অনুমোদন পেয়েছিল তখনও তাঁর গীত সংকলন প্রকাশে সংকোচ যায়নি। তার কারণ সুরেশচন্দ্র সমাজপতির সমালোচনার ভয়। সে সময় একদিন অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় জলধর সেনের আমন্ত্রণে জলধরেরই বাড়িতে সমাজপতিকে এনে কোনো পূর্ব পরিচয় না জানিয়ে রজনীকান্তকে গান গাওয়াতে বসিয়ে দেন। তারপর অক্ষয়কুমারের বর্ণনা অনুযায়ী: 'প্রাতঃকাল কাটিয়া গেল, মধ্যাহ্ন অতীত হইতে চলিল, সকলে মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় সংগীত সুধাপানে আহারের কথাও ভুলিয়া গেলেন। কাহাকেও কিছু করিতে হইল না; সমাজপতি নিজেই গানগুলি পুস্তকাকারে ছাপাইয়া দিবার কথা পাড়িলেন।'

এইভাবেই রজনীকান্ত ছড়িয়ে পড়েন রাজশাহীর পরিধি ছাড়িয়ে কলকাতায়। গ্রাম্য পরিবেশে গড়ে-ওঠা এক মধ্যবিত্ত মানুষ তাঁর গান রচনার আন্তরিকতায় স্থান পেয়ে গেলেন কলকাতার উচ্চসমাজে। সেখানে তখন চলছে ব্রাহ্মসমাজের শান্ত রসাস্পদ পূজার গান, রঙ্গমঞ্চ ঘিরে প্রচুর থিয়েটারের গান আর ওস্তাদী কালোয়াতী তানবাজির গান। আশ্চর্য যে, রজনীকান্ত রবীন্দ্রসংগীতের দ্বারা তেমন প্রভাবিত হননি। তার একটা কারণ সে-সময়ে রবীন্দ্র-বিদ্বেষের একটা বড় আন্দোলন চলছে কলকাতায়। তাছাড়া রবীন্দ্রসংগীত তখন কলকাতার চেয়ে শান্তিনিকেতনেই বেশি প্রচলিত ছিল। রজনীকান্ত তাঁর গীত সংকলন 'বাণী' প্রকাশ করেন ১৯০২ সালে, 'কল্যাণী' প্রকাশ করেন ১৯০৫ সালে, ১৯১০ সালে বেরোয় রবীন্দ্রনাথের 'কণিকা'-র আদর্শে লেখা নীতিকবিতা 'অমৃত'। আশ্চর্য নয় কি যে বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ গীতিকারের গান রজনীকান্তের দূরায়ত্ত রইলো অথচ তিনি তাঁর নীতিকবিতার নকল করলেন? অবশ্য গভীরতর অনুসন্ধানে দেখা

যায় রজনীকান্ত দুখানি গান লিখেছেন রবীন্দ্রনাথের দুখানি বিখ্যাত পূজার গানের সুরে।

| রবীন্দ্রনাথের মূল গান | রজনীকান্তের গান |
|---|---|
| ১ তোমারি রাগিণী জীবনকুঞ্জে/রচনা ১৯০০ | ভীতিসঙ্কুল এ ভবে |
| ২ দাঁড়াও আমার আঁখির আগে/রচনা ১৯০৪ | শুনাও তোমার অমৃত বাণী |

এক্ষেত্রে তিনি কেবল সুরটুকুই অনুকরণ করেছেন, রবীন্দ্রসংগীতের ভাবরস, তার বিন্যাসের ভঙ্গি তাঁকে প্রভাবিত করেনি। খোঁজ নিলে দেখা যাবে অপরের বিখ্যাত গানের সুরে বাণী বিন্যাস করে গান রচনা ছিল রজনীকান্তের একরকম নেশা। এখানে সেই রকম গানের একটি তালিকা প্রণয়ন করে দেওয়া গেল সকলের অবগতির জন্য।

| মূল গান | রজনীকান্তের গানের প্রথম পংক্তি |
|---|---|
| স্মরগরল খণ্ডনং | অজি শিথিল সব ইন্দ্রিয় |
| মাতঃ শৈলসুতা | ভারি সুনাম করেছ |
| রে গঙ্গামাই প্রাতে দরশন দে | রে তাঁতি ভাই একটা কথা |
| মধুর সে মুখখানি | পাদপূরণ |
| তোর নাম রেখেছি হরবোলা | ডাক দেখি তোর বৈজ্ঞানিকে |
| ঝাঁকে ঝাঁকে লাখে লাখে ডাকে | কন্যাদায়ে বিব্রত হয়েছ |
| হেলে দুলে নেচে চল গোষ্ঠবিহারী | কতভাবে বিরাজিছ বিশ্ব মাঝারে |
| পাখি ঐ তো গাহিলি গাছে | ওমা এই যে নিয়েছ |
| তুমি গতি তুমি সার | বেলা যে ফুরায়ে যায় |
| সোনার কমল ভাসালে জলে | যদি পার হতে তোর |
| বাঁশের দোলাতে উঠে | যে পথে মরা ছেলে |
| নিপট কপট তুঁহু শ্যাম | সাঁঝে এ কি হরষ |
| | তিমিনাশিনী মা আমার |
| সব দয়াল দয়াল বলে | এমন সোনার বাংলা |
| ভেবে মরি কী সম্বন্ধ | দুটো একটা নয় রে |
| | জ্ঞানশ্রেষ্ঠ জ্ঞানসেব্য |
| কুঞ্জে কুঞ্জে পুঞ্জে পুঞ্জে | ঐ অভ্রভেদী ধবল শৃঙ্গে |
| | তখন ব্যাখ্যা করল নারদ |
| গিরি গৌরী আমার এসেছিল | সেথা সর্বসত্তা বিদ্যমান |
| ঐ ভৈরবে বাজিছে বিকট ভয়াবহ | মধুমঙ্গল গোধূলি |
| উঠ গো ভারতলক্ষ্মী | আকুল কাতর কণ্ঠে |

এই তালিকার সঙ্গে যুক্ত হবে রবীন্দ্রনাথের গান দুটি। এছাড়া উল্লেখ করা

দরকার যে, দ্বিজেন্দ্রলালের 'আমরা বিলাত-ফেরতা ক' ভাই' গানের সুরে রজনীকান্ত অন্তত দশখানি হাসির গান লিখেছেন। এই তালিকায় মূল গানগুলির দিকে নজর করলে দেখা যাবে, রজনীকান্তের বেছে-নেওয়া সুরের বেশির ভাগ গান তৎকালীন যাত্রা ও থিয়েটারের অথবা জনপ্রিয় লৌকিক গান বা দেহতত্ত্ব। অন্তত একটি করে ক্ষেত্রে দাশরথি রায়, হিন্দী ভজন ও বাংলা আগমনী গানের অনুসরণের উদাহরণ রয়েছে। শেষ গানটি অতুলপ্রসাদের সুরে। সেই সুর অতুলপ্রসাদ পেয়েছিলেন ভূমধ্যসাগরে গণ্ডোলা চালকদের কণ্ঠে, ১৮৯২ সালে, বিলাত যাবার পথে। এই একমাত্র পরোক্ষ সূত্রে কান্তগীতিতে প্রবেশ করেছে বিদেশী সুর। তার বাইরে তাঁর সর্বমোট আনুমানিক আড়াইশো গানে কোনো বিদেশী সংরাগ নেই। থাকবেই বা কী করে? তিনি তো রবীন্দ্রনাথ -দ্বিজেন্দ্রলাল-অতুলপ্রসাদের মতো বিদেশে যাবার বা বিদেশী গান শেখার সুযোগ পাননি।

৩

রজনীকান্তের অতি বড় অনুরাগীও স্বীকার করবেন যে কান্তগীতির ভাব ও রূপের বৈচিত্র্য খুব কম। এই দুর্বলতা পরিস্ফুট হয়ে ওঠে রবীন্দ্রনাথ-দ্বিজেন্দ্রলালের গানের সঙ্গে প্রতিতুলনা করলে। একদিক থেকে অবশ্য এই তুলনা যুক্তিহীন, কেননা রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলাল গানের যত প্রয়োগক্ষেত্র পেয়েছিলেন, বিশেষত নাট্যগানে, রজনীকান্ত তা পাননি। তাঁদের দুজনের গানে মূল শক্তি রাগমিশ্রণে ও দেশী-বিদেশী সুরের সমন্বয়ে। তাছাড়া দুজনেরই কবিমন গান রচনায় আনুকূল্য করেছে সেই জন্য ভক্তি ও স্বদেশচেতনার গান ছাড়াও প্রেম ও নিসর্গের গান তাঁদের আত্মপ্রকাশে একটা বড় ভূমিকা নিয়েছে। দুজনেরই ভারতীয় মার্গ-সংগীত ও পাশ্চাত্য গানে ভালোমত দখল ছিল। তাই রবীন্দ্রনাথের গানের ভিতে রয়েছে ধ্রুপদের সংহত কাঠামো, দ্বিজেন্দ্রলালের গানে বিস্তারধর্মী টপ্‌খেয়াল। রজনীকান্তের অনুজ অতুলপ্রসাদ এবং নজরুলেরও ছিল সাংগীতিক বনিয়াদ ও বৈচিত্র্যধর্মী গান রচনার প্রবণতা। রজনীকান্তের শৈশব থেকে নীতিবশ্যতার জীবন ভক্তিভাবনার অতিরেক এবং বৈচিত্র্যহীন জীবিকা-বিড়ম্বিত দিনযাপন তেমন করে অভিজ্ঞতাকে প্রসারিত করতে দেয়নি। বাল্যবিবাহের সুনিশ্চিত মসৃণতা অভিজ্ঞতা এবং যৌথ পরিবারের অবগুণ্ঠিত শাসন-সংযমে প্রেম-অপ্রেমের কোনো দ্বন্দ্বজটিল অভিজ্ঞতা তাঁর জীবনে আসেনি। নিসর্গের মধ্যে শুধুই তিনি খুঁজে পেয়েছেন

জগদীশ্বরের শৃঙ্খলার পরম্পরা ও প্রবল শক্তিরূপ। বৈজ্ঞানিক জিজ্ঞাসার বেশ কিছু নমুনা তাঁর গানে আছে। তবে তাঁর শেষ কথা হলো :

কান্ত বলে আছে জেনো, 'কেন'-র 'কেন', তস্য 'কেন'
যাও নিখিল 'কেন'-র মূল কারণে
সে রেখেছে কালের খাতায় লিখে।

এই নিখিল 'কেন'-র মূল কারণ তো ঈশ্বর। কাজেই রজনীকান্তের সব উদ্বেলতা সব জিজ্ঞাসার অবসান ঘটে ঐশী পাদপীঠে।

গানের এই ভাববৈচিত্র্যের অভাব হয়ত তিনি ঢাকতে পারতেন সুবিন্যাসের চাতুর্যে, তালের বিভাজনে, সুরমিশ্রণের দক্ষতায়। কিন্তু গীতরূপায়ণে তিনি সুরের চটকের চেয়ে প্রাধান্য দিয়েছেন বাচনের আন্তরিকতার প্রতি ; সেই জন্য একটি রাগাশ্রিত সুরকে সরলভাবে বিন্যাস করেছেন! স্বরের তীব্র সচকিত ওঠা-পড়া রাগমিশ্রণের সাহসী নিরীক্ষা, তাল ও লয়ের অপ্রত্যাশিত মোচড় তাঁর গানে নেই। স্পষ্টত কীর্তনগানের রূপবন্ধ, বিশেষত আখরবহুল মনোহরশাহী, তাঁর প্রিয় ছিল। আর বিপুলভাবে ব্যবহার করেছেন বাউলধারা। গানের শেষে ভনিতা ('কান্ত বলে') তাঁর লোকায়ত প্রবণতাকেই চিহ্নিত করে। আঙ্গিকের এই সীমাবদ্ধতা এবং সাংগীতিক অভিজ্ঞতার ও প্রয়োগের শীর্ণতা তাঁর গানকে আবেদনের দিক থেকে দুর্বল করে রেখেছে। তাঁর গানের মূল আবেদন তাই ভাবের ও আত্মস্থ উচ্চারণের। বিশেষত তিনি নিজে অত্যন্ত সুকণ্ঠ এবং ভাবগ্রাহী গায়ক ছিলেন বলে রজনীকান্তের গানের দুর্বলতা ও সুরের সদৃশতা তাঁর জীবিতকালে ধরা পড়েনি। এখন কৃত্রিমভাবে অদীক্ষিত কণ্ঠে কেউ কান্তগীতি গাইলেই বোঝা যায় তার মূল দুর্বলতা।

এমন কেন হলো তার অনুসন্ধানে রজনীকান্তের জীবনের দিকেই চোখ ফেরাতে হয়। তাতে জানা যায়, রবীন্দ্রনাথের মতো তাঁর বাড়িতে ছিল না সংগীত পরিবেশ। ছিলেন না বিষ্ণু বা যদুভট্ট, শ্রীকণ্ঠ সিংহ বা জ্যোতিদাদা। দ্বিজেন্দ্রলালের পিতা কার্তিকেয়চন্দ্র রায়ের মতো গুণী কালোয়াত ছিলেন না তাঁর পিতা ; অথবা কোনো সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের মতো দক্ষ কণ্ঠবাদকের কাছে তাঁর গানের পরিমার্জনা ঘটেনি। পক্ষান্তরে, অতুলপ্রসাদের মতো ঢাকার সম্ভ্রান্ত সংগীত পরিবেশ পাননি শৈশবে, যৌবনে পাননি উত্তর ভারতীয় ঠুংরি বা লউনি-কাজরী-সাওয়ন-হোরীর সংসর্গ। কান্তকবির জীবনীকার নলিনীরঞ্জন জানিয়েছেন, শৈশবে ভাঙাবাড়িতে হতো কীর্তন আর কথকতার আসর। পিতা গাইতেন ভক্তিসংগীত। রাজশাহীর ধর্মসভার

বাৎসরিক অধিবেশনে প্রসিদ্ধ গায়ক রাজনারায়ণের চণ্ডীযাত্রা ও কীর্তন গান হতো। তবে 'বাল্যকাল হইতেই তিনি গান শুনিতে বড় ভালোবাসিতেন, একাগ্রচিত্তে গানের সুর ও ভাষা আয়ত্ত করিতে চেষ্টা করিতেন।' এছাড়াও তাঁর আর একটি প্রবণতার কথা জানা যায়।

> কাহারো সুমধুর সংগীত শ্রবণ করিলে তিনি আত্মহারা হইতেন এবং ঘরে ফিরিয়া সকলকেই সেই গান গাহিয়া শুনাইতেন। গানের যে অংশ তাঁহার স্মরণ হইত না, সেই অংশ তিনি স্বয়ং রচনা করিয়া জোড়া দিয়া লইতেন।...সংগীত চর্চার প্রারম্ভে তিনি একটি ফ্লুট বাঁশি ক্রয় করেন এবং উহারই সাহায্যে সংগীতাভ্যাস করিতে থাকেন।

কোনো নামকরা ওস্তাদ বা বয়স্ক সংগীতকারের সঙ্গ পাননি রজনীকান্ত। তাঁর বয়স যখন চোদ্দ বছর তখন ভাঙাবাড়ির তারকেশ্বর চক্রবর্তীর সঙ্গে হৃদ্যতা হয়। দুজনে একসঙ্গে সংস্কৃত ও বাংলা কবিতা রচনার অভ্যাস করতেন। তারকেশ্বর কবিওয়ালাদের মতো মুখে মুখে অনর্গল ছড়া ও পাঁচালি বানাতেন। তাঁর বয়স তখন আঠারো। দুজনে বন্ধুত্ব হয় প্রগাঢ়। তার মানে রজনীকান্তের সাহিত্যসহচর ছিলেন তাঁর চেয়ে মাত্র চার বছরের বড়। তারকেশ্বরের কাছে ছড়া-পাঁচালির পর্ব কাটিয়ে ক্রমে তিনি গানের দীক্ষাও নেন। এ সম্পর্কে তারকেশ্বর স্মৃতিচারণ করে লিখেছেন :

> তখন সে অল্প অল্প ছোট সুরে গান করিতে পারিত, ঐ গান আমার নিকট বড়ই মিষ্ট লাগিত। আমিও তখন সংগীত বিষয়ে কোনও শিক্ষালাভ করি নাই, শুনিয়া শুনিয়া যাহা শিখিতাম তাহাই গাহিতাম। বৎসরের মধ্যে যে নূতন সুর বা গান শিখিতাম, রজনীর সঙ্গে দেখা হইবামাত্র তাহা তাহাকে শুনাইতাম, সেও তাহা শিখিত। পরে যখন একটু সংগীত শিখিতে লাগিলাম, তখনও বড় বড় তাল, যথা—চৌতাল, সুরফাঁক প্রভৃতি, একবার করিয়া তাহাকে দেখাইয়া দিতাম, তাহাতেই সে তাহা আয়ত্ত করিত এবং ঐ সকল তালের মধ্যে আমাকে সে এমন কূট প্রশ্ন করিত যে আমার অল্পবিদ্যায় কিছু কুলাইত না।

এই বিবরণ থেকে বোঝা গেল, যাকে বলে সংগীতবিদ্যার ক্রিয়াত্মক শিক্ষা ও তালিম, তা সঠিকভাবে এবং যোগ্য ব্যক্তির কাছে রজনীকান্ত পাননি। গানের এক স্বাভাবিক সংস্কার ছিল তাঁর, ছিল যে-কোনো গান তুলে নেবার স্বভাবপটুত্ব, সুর-তাল বিষয়ে ছিল শ্রুতিবাহিত মোটামুটি ধারণা। এই সব নিয়েই গড়ে উঠেছে তাঁর

গানের সীমায়িত বিশ্ব। তাই তাতে নিরীক্ষা কম, সাহস কম, স্বৈরতা একেবারেই নেই। সেই জন্যই তাঁর হাসির গানে ভাবনা ও কল্পনার মজা আছে কিন্তু তাতে সুরের কোনো আলাদা নির্মাণ নেই, যেমন আছে দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গানে। সেখানে স্বরস্থানের নানা চকিত ওঠাপড়া আছে, আছে আকস্মিক দ্রুত চলনের মজা কিংবা রাগরাগিণীর সুরে মীড়ের ব্যবহারে হাসির প্রয়োজনে নাকী কান্না, আর সেই সঙ্গে বিদেশী স্বরসংস্থানে নানা স্কেলে হা-হা-হা হাসি। তাঁর গানের বারো আনা মজা সুরে ও গায়নে।

রজনীকান্তের জীবনবৃত্তান্ত অনুসরণ করলে দেখা যায় তিনি মুখ্যত কবি কিন্তু তাঁর প্রসিদ্ধি ঘটেছে গীতকাররূপে। উনিশ শতকের এক ধরনের নীতিবাদী কবিতা ও ভক্তিরসের পদ্য তাঁকে অনুপ্রেরিত করেছিল। সেই জন্য তিনি এমন সব বস্তুবিষয়ে গান লিখে গেছেন যা নীতিরসের তত অনুকূল নয় এবং বিরোধী। যেমন :

১. এই দেহটার ভিতর বাহির ছাই
এতে ভাল জিনিস একটি নাই।
( এটা তো ) অস্থি, চর্ম, মাংস, মজ্জা, মেদ,
মূত্র, বিষ্ঠা, পিত্ত, শ্লেষ্মা, দুর্গন্ধময় ক্লেদ।

২. অসীম রহস্যময়! হে অগম্য! হে নির্বেদ!
শাস্ত্রযুক্তি করিবে কি তোমার রহস্যভেদ?
শ্রুতি, স্মৃতি, বেদমন্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা, ন্যায়তন্ত্র।
বিজ্ঞান পারেনি, প্রভু, করিতে সংশয়োচ্ছেদ।

৩. তুই ঘুরে বেড়াস্ পরিধিতে—
সে যে বসে আছে কেন্দ্রটিতে;
সাধনা-ব্যাসের রেখায় পা দিলিনে মোহের ঘোরে।

এই কি গানের ভাষা? এসব কি গানের প্রসঙ্গ হতে পারে? রজনীকান্তের মধ্যে কোথায় যেন বাস করতেন এক অমার্জিত আত্মতুষ্ট গ্রাম্য মানুষ; উনিশ শতকের নগরায়ণ, উন্নত সাহিত্যের সংযোগ, রূপবন্ধ বিষয়ে উৎসাহ কিছুই যাঁকে ছোঁয়নি। অথচ অনায়াস ক্ষিপ্রতায় তিনি গানের বাণী লিখতেন এবং তাতে বসিয়ে দিতেন রূপায়ণধর্মী এক সুরের কাঠামো। সব সময়ে সেই সুর যে গানের বাণীর সঙ্গে অত্যাজ্য সম্পর্কে জড়িত তা মনে হয় না। যেমন দেখা যায়, মিশ্র খাম্বাজে বসানো তাঁর প্রসিদ্ধ গান 'কেন বঞ্চিত হব চরণে' বাণী ও সুরে চমৎকার সুষমাময়।

অথচ পরবর্তীকালে এই সুরেই 'কোন শিক্ষকের বিদায় উপলক্ষে' লেখেন 'তুমি সত্য কি যাবে চলিয়া'। নিজের দৃষ্টি সম্পর্কে কতখানি অসাড় হলে এমন অন্তর্ঘাত করা যায় জানি না। এমন তথ্য থেকে এই কথা নিষ্পন্ন হয় যে গানের বাণী তথা বক্তব্য ছিল তাঁর পক্ষে আত্ম মনোযোগের বিষয়, সুর ছিল গৌণ। সর্বক্ষেত্রেই তাই আগে তিনি গানের কবিতা লিখে পরে সুর দিতেন।

সেইজন্য রবীন্দ্রসংগীত, দ্বিজেন্দ্রগীতি বা অতুলপ্রসাদের গানের মতো কান্তগীতি আজ আমাদের কাছে কোনো আলাদা সুরবিন্যাসের চারিত্র্য নিয়ে দাঁড়ায় না। হিসেব করলে দেখা যাবে তাঁর প্রসিদ্ধ ও জনপ্রিয় গানগুলির মূল আবেদন থিমেটিক। এই রকম তাঁর এক অতিপ্রসিদ্ধ গানের নির্মাণের প্রতিবেদন এখানে পেশ করা যায় প্রসঙ্গক্রমে। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় তাঁর লেখা 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়' গানটি সারা দেশের চিত্তক্ষেত্রকে মথিত করে দিয়েছিল। সেই গান প্রসঙ্গে জলধর সেনের স্মৃতিচারণ এই রকম :

> তখন স্বদেশীর বড় ধুম। একদিন মধ্যাহ্নে একটার সময় আমি 'বসুমতী' আপিসে বসিয়া আছি, এমন সময় রজনী এবং…শ্রীমান অক্ষয়কুমার সরকার আপিসে আসিয়া উপস্থিত। রজনী সেই দিনই দার্জিলিং মেলে বেলা এগারোটার সময় কলিকাতায় পৌছিয়া অক্ষয়কুমারের মেসে উঠিয়াছিল। মেসের ছেলেরা তখন তাহাকে চাপিয়া ধরিয়াছে, একটা গান বাঁধিয়া দিতে হইবে। গানের নামে রজনী পাগল হইয়া যাইত। তখনই গান লিখিতে বসিয়াছে। গানের মুখ ও একটা অন্তরা লিখিয়াই সে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে। সকলেই গানের জন্য উৎসুক ; সে বলিল— 'এই তো গান হইয়াছে, চল জলদার ওখানে যাই। একদিকে গান কম্পোজ হউক, আর একদিকে লেখা হউক।' অক্ষয়কুমার আমাকে গানের কথা বলিলে—রজনী গানটি বাহির করিল। আমি বলিলাম 'আর কই রজনী?' সে বলিল, 'এইটুকু কম্পোজ করিতে দাও, ইহারই মধ্যে বাকিটুকু হইয়া যাবে।' সত্য সত্যই কম্পোজ আরম্ভ করিতে করিতেই গান শেষ হইয়া গেল। আমরা দুইজনে তখন সুর দিলাম। গান ছাপা আরম্ভ হইল ; রজনী ও অক্ষয় ৩০।৪০ খানা গানের কাগজ লইয়া চলিয়া গেল।
>
> সন্ধ্যার সময়…বসিয়া আছি, এমন সময় দূরে গানের শব্দ শুনিতে পাইলাম। গানের দল ক্রমে নিকটবর্তী হইল। তখন আমরা শুনিলাম,

ছেলেরা গাহিতেছে, 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নেরে ভাই।' গান শুনিয়া সকলে ধন্য ধন্য করিয়াছিল ; তাহার পর ঘাটে মাঠে পথে নৌকায় দেশ-বিদেশে কতজনের মুখে শুনিয়াছি।

বিস্তারিত বিবরণ থেকে দেখা যাচ্ছে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময়কার সবচেয়ে জনপ্রিয় গানটি লেখা হয়েছে কতটাই তাড়াতাড়ি। রজনীকান্তের বেশির ভাগ গানের অন্তঃপ্রকৃতিতে এই ত্বরার চিহ্ন যতটা আছে, পরিমার্জন ও আধুনিকতার লক্ষণ ততটা নেই। এত বিখ্যাত এক গানের কবিতা দ্রুত-প্রস্তে লেখার পর সুর সংযোজনের তথ্যটুকু বেশ মজার। জলধর সেন ও রজনীকান্ত এ-গানের যুগ্ম সুরকার। সেই সুরে অবশ্য কোনো চটক বা উন্নত পরিকল্পনার আভাস নেই। নিতান্ত সহজ তালের সরল গান। সকলের গাইবার উপযোগী। সেই কারণে গানটি একসময়ে যেমন মাঠে ঘাটে পথে নৌকায় গাওয়া হয়েছিল এখন আর তা হয় না। তাৎক্ষণিকতার সব রকম স্বভাবধর্মে ভরা এই গান।

একেক সময় তাই মনে হয় রজনীকান্তের সবচেয়ে বড় প্রতিপক্ষ ছিল তাঁর সমকালীন জনপ্রিয়তা। তিনি তাঁর নিজের গান এত চমৎকারভাবে গাইতেন যায় কলে শ্রোতারা একেবারে আপ্লুত হয়ে পড়তেন। তাঁর গানের সবচেয়ে সমঝদার ছিলেন কাশিমবাজারের মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, দিঘাপতিয়ার কুমার শরৎকুমার রায়, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, জলধর সেন, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় এবং আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। রজনীকান্তের ব্যক্তিচরিত্রের সারল্য ও প্রমোদ-পরায়ণতা, তাঁর অনর্গল গায়ন-সামর্থ্য ও ভক্তিভাব এইসব পুরাতন ভাবনার মানুষগুলির মনকে তাঁর প্রতি অনুকম্পায়ী ও প্রশ্রয়শীল করে তুলেছিল। ফলে তাঁরা কেউই কান্তগীতির সঠিক মূল্যনির্ধারণ বা বিচারের নিরপেক্ষতা দেখাতে পারেননি। তাঁদের সংগীতবোধ সম্পর্কেও প্রশ্ন উঠতে পারে। এমনতর শ্রোতাদের সাহচর্যে ও উৎসাহে রজনীকান্ত এতটাই আত্মতুষ্ট হয়ে পড়েছিলেন যে তাঁর মধ্যে কোনো শিল্পীজনোচিত অতৃপ্তি কখনও দেখা দেয়নি। তাঁর স্বতঃস্ফূর্ত সাফল্য এত সহজে অর্জিত হয়েছে যে গানের ভাবগত ব্যাপ্তি ও বৈচিত্র্যের সাধনা তাঁর অনর্জিত রয়ে গেল। জীবনে প্রেম বা নিসর্গের গান প্রায় লেখেননি তিনি। নাটক ভালোবাসতেন, নিজে অভিনয়ও করেছেন একসময়ে, অথচ কখনও নাট্যসংগীত লেখেননি বা কোনো নাট্যকর্মী তাঁকে দিয়ে তা লেখাননি। তাঁকে বিরোধে-বিতর্কে উজ্জীবিত করেননি কেউ, উদ্বুদ্ধ করেননি নতুন ধরনের রচনায়। কখনও নিন্দিত হননি তিনি। সবাই ভালোবাসতেন তাঁকে। মাতৃভক্ত, পত্নীপরায়ণ,

সন্তানবৎসল, বান্ধবপ্রিয় ভক্তিমান ও বিনত এই গীতকার জীবনে শোক ও জীবিকার বৈপরীত্য ছাড়া কোনো মর্মবেদনা পাননি। তাঁর নিজের যেমন কোনো স্ববিরোধ ছিল না, তেমনই ছিল না সাহিত্যিক প্রতিপক্ষ বা সমাজের অন্তর্ঘাত। এই সবই তো শিল্পীকে এগিয়ে দেয়, জেদী করে, আত্মপ্রকাশের একাগ্রতা বাড়িয়ে দেয়। রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, অতুলপ্রসাদ, নজরুল—বাংলা গানের সব সফল সংগীতকারের জীবনে এমন অভিজ্ঞতা হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ তো সারাজীবন বিরোধ-বিদ্বেষ-বিতর্কে জড়িয়ে ছিলেন, দ্বিজেন্দ্রলালকেও হতে হয়েছিল একঘরে। অতুলপ্রসাদের জীবন প্রেমে-অপ্রেমে কেবলই মথিত হয়েছে, নজরুল ছিলেন অজস্র বিতর্ক ও উত্তেজনার ভরকেন্দ্র। এই সব উত্তেজিত জায়মান অস্তিত্বের পাশে রজনীকান্তের জীবন ছিল কেমন? অনেকটা তাঁর গানে যেমন আছে:

> নিত্য নিয়তি বলে, বায়ু ধায়, মেঘ চলে,
> শ্যাম বিটপিদলে, সুরসাল ফল ফুলে,
> পাখী গাহে, ফুল ফোটে, তটিনী বহিয়া যায়;
> দ্বিধাহীন অনুভূতি হৃদয়ে রহিয়া যায়;

তিনি বিশিষ্টভাবে এই দ্বিধাহীন অনুভূতির বাণীকার। রোগশয্যায় তাঁর মনে হয়েছিল তিনি খুব ভালো লেখেন, তাঁর গান সকলে ভালোবাসে তাই বুঝি দয়াল তাঁকে দিয়েছেন ব্যাধি ও বেদনা। বস্তুত ব্যাধি ও মৃত্যু তাঁর পক্ষে হয়েছে শোভন ও সংগত। তিনি জীবিত থাকলে দেখতেন বিশ্বযুদ্ধজনিত বিপুল ক্ষয় ও মূল্যবোধের বিপর্যয়, যাতে তাঁর গানের মূলকথা আস্তিক্য ও ভক্তিবাদ টলে যেত। তাঁকে দেখতে হতো রবীন্দ্রসংগীতের আশ্চর্য ভুবন এবং নজরুল গীতির অসামান্য জনপ্রিয়তার পাশে তাঁর গানের সীমাবদ্ধতা ও মন্দগতি। ইতিহাস বিধাতার কৌতুক তাঁকে সইতে হয়নি।

রজনীকান্তের স্পষ্টত ঘটনাহীন জীবন এবং পঁয়তাল্লিশ বছরের সামান্য আয়ু তাঁকে খুব বড় সৃষ্টির সুযোগ দেয়নি। তাঁর জীবন পরিবেশ ছিল বাঁধাধরা, পাননি কলাবৎ গুণীর সাহচর্য। মানুষটি ছিলেন আত্মভোলা, স্বল্পে তুষ্ট, গান-পাগল মনের। মধ্যে সাংগঠনিক বিন্যাস ছিল না, তাই ভবিষ্যতে তাঁর গান কে গাইবে এ-ভাবনা করেননি। পুত্রকন্যারা কেবল জানতেন তাঁর গানের ধরন ও গাইবার কৌশল। আর জানতেন কটা সাহেব নামে এক ব্যক্তি। তাঁর পরিচয় দিয়ে শান্তি দেবী লিখেছেন: 'ইনি খ্রীষ্ট ধর্মাবলম্বী, সেইজন্য নামের পিছনে সাহেব জুড়ে দেওয়া

হয়েছিল। ভালোনাম কেউ জানতো না। গায়ের রং চিকন আবলুস্ কাঠের মতো। ঋজু চেহারা। ইনি রজনীকান্তের গানের ছিলেন কোষাধ্যক্ষ। রজনীকান্তের প্রায় সব গানই নিজের তহবিলে জমা রাখতেন। রজনীকান্তও তাঁর উপর নির্ভরশীল ছিলেন। পরবর্তীকালে সেই গান কটা সাহেবের মাধ্যমেই দেশবাসী পেয়েছিল। দেশবাসী যখন পেয়েছিল তখন রজনীকান্ত কণ্ঠহারা।' এই তথ্য থেকে বোঝা যায়, শান্তিদেবীর সন্তান রজীকান্তের দৌহিত্র দিলীপকুমার রায় কোথা থেকে অর্জন করেছেন তাঁর নির্ভবযোগ্য কান্তগীতি পরিবেশনের দক্ষতা ও আন্তরিকতা।

রজকীকান্ত তাঁর রোজনামচায় নিজের সৃষ্টি সম্পর্কে লিখে গেছেন: 'আমার একটা চেষ্টা ছিল যে, Poetry আর গানে সব class of reader-দের মনস্তুষ্টি করব। এইজন্য average reader-দের জন্য serio-comic করেছিলাম; একটু higher circle-এর জন্য serious করেছিলাম; আর-এক বিশুদ্ধ আমোদর জন্য comic করেছিলাম।' এই মন্তব্য পড়লে তাঁকে যতটা সচেতন আর্টিস্ট মনে হয় তা অবশ্য তিনি ছিলেন না। তা যদি তিনি হতেন তবে গানের বাণীতে ঘটতো বহুল পরিমার্জনা। প্রকৃতপক্ষে তাঁর গান উত্তর পুরুষের কাছে কিছুটা বিভ্রান্তি জাগায়। তার গানের প্রকৃতভাষা কোনটি বা কীরকম তা আবিষ্কার করা কঠিন। এখানে তিনটি নমুনা সাজিয়ে দিচ্ছি।

১ যা ছিল না, হয় না তা আর, যা আছে তাই আছে
এই পাঁচ ভেঙে দশ রকম হচ্ছে, মিশছে পাঁচে।

২ অতল-উচ্চ-চল ঊর্মি-মালশত-শুভ্র ফেনযুত রঙ্গ অধীর;
ভীতি বিবর্ধন তাণ্ডব নর্তন ভীমরোলে করি শ্রবণ বধির।

৩ আমার সাধন বিহঙ্গ শুয়ে বিলাস-আলস্য-নীড়ে
সন্দেহ-পেচক শুধু অন্ধকারে ঘুরে ফিরে;
প্রবেশি' তস্কর-রিপু শান্তিময়-মর্ম-গেহে
লুটে মরকত-প্রেম অমূল্য হীরক-স্নেহে
লুটে দয়া-মুক্তা সদ্বিবেক-মানি।

সাবলীল অথবা কৃত্রিম এর মধ্যে কোনটি তাঁর আত্মভাষা? মনে হয় শেষ পর্যন্ত সমাসবদ্ধ ও রূপকপ্রবণ বাণী আর ভাবের আড়ষ্টতা কেটে গিয়ে তিনি খুঁজে পেতেন নিজের উচ্চারণ। কিন্তু ১৯০৯ সালের মে মাসে কণ্ঠের প্রদাহ নিয়ে রজনীকান্ত রংপুরে গিয়ে পরপর দুই সায়ংকালে সন্ধ্যা থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত একটানা গান গেয়ে 'রংপুরের বহু লোককে এক মুহূর্তে আপন করে ফেলেন' কিন্তু অর্জন

করেন কর্কট রোগ। একবছর মর্মান্তিক যন্ত্রণার শেষে ১৯১০ সালের সেপ্টেম্বরে তাঁর প্রয়াণ ঘটে। অবিরাম গান গেয়ে যাবার আনন্দ-পরিণামে তাঁর কণ্ঠকেই গানহীন করে দেয়। গান ছিল তাঁর উজ্জীবন তাই তৃষিত মরু ছেড়ে রসাল নন্দনে তাঁর যে যাত্রাপথ, তা ভরা ছিল শোকযাত্রীদের গানে গানে। কোনো বাঙালী গীতকার এমন গীতময় আন্তরিক প্রত্যুপহার পাননি।

# 'কে হে তুমি সুন্দর'

## অতুলপ্রসাদের গান

প্রতীচ্যের সুরকার বা সংগীতকারদের জীবনবৃত্তান্ত যাঁরা লেখেন তাঁদের একটা বাঁধা কৌশল থাকে। যাঁর জীবন তাঁদের উপজীব্য তাঁর সম্পর্কে দুটি বিশ্লেষণ তাঁরা ব্যবহার করেন—eventful এবং eventless। বাংলাগানের দুই প্রণিধান-যোগ্য গীতিকার রবীন্দ্রনাথ ও অতুলপ্রসাদ সম্পর্কে ঠিক ঐ বিপরীতধর্মী বিশেষণ দুটি খাপ খেয়ে যায়। তবু কথা থাকে। ঘটনাবহুল জীবনে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ মানুষটি থেকে যান অকম্প্র ও ঋজু। আর সামান্য একটি দুটি ঘটনার চাপে তার অন্তঃস্রোতের টানে অতুলপ্রসাদের জীবন কেবলই নুয়ে পড়ে, চায় কতই আশ্রয়। দুজনের অন্তঃস্বভাবের এতখানি বিপ্রতীপতা তাঁদের গান রচনার গভীরেও নিশ্চয়ই ছাপ রাখে। রবীন্দ্রনাথের গান রচনার নেপথ্যে যেসব ঘটনা অনেক ক্ষেত্রে আমরা জানতে পারি তাতে দেখা যায়, তুচ্ছ কোনো উপলক্ষ থেকে তাঁর গান উৎসারিত হলেও অন্তরা থেকে সে গান হয়ে যায় অবিশেষ। এমন একটা উদাহরণ দেখা যাক। তাঁর দৌহিত্রীর শৈশবে আধো-আধো অস্পষ্ট বুলি শুনে নাকি রবীন্দ্রনাথ লেখেন :

> অনেক কথা যাও যে বলে কোন কথা না বলি।
> তোমার ভাষা বোঝার আশা দিয়েছি জলাঞ্জলি।

গানের পরবর্তী উচ্চারণ উদ্দিষ্টকে ছাড়িয়ে এরপরে গীতিকারের গভীর প্রাণের মধ্যেকার মানুষটাকে ভেদ করতে চায়, আবিষ্কার করে ফেলে অন্য মনের কুয়াশাও এমনকি। উৎস থেকে গভীরতায় এই ক্রমপ্রসারণ, মুছে ফেলা সামান্য উপলক্ষের অঙ্গচিহ্ন—রবীন্দ্রনাথের গানে এমনটাই হতে দেখি বারে বারে। হয়তো এই মানস-ক্রিয়ায় পুরো মানুষটাই স্পষ্টতর হন। তাঁর জীবনের একটা সূত্র মেলে। বুঝতে পারি, ব্যক্তিগত দুঃখ শোক সাফল্য আনন্দ বেদনার কোনো ক্ষণিক উচ্ছ্বাস তাঁর জীবনের শমতাকে ব্যাহত করতে পারে না। এর সঙ্গে প্রতিতুলনায় অতুলপ্রসাদ অনেকখানি নিরাশ্রয়। তাঁর ব্যস্তজীবিকা, গানের নিরন্তর মজলিস, লক্ষ্ণৌ শহরের বহুবিধ জনহিতকর সংগঠন, বুধমণ্ডলীর সঙ্গ কিছুই তাঁকে শান্ত করতে পারে না।

শিল্প তাঁকে সান্ত্বনা দিতে পারে না। গান তাঁর ভিতরকার মানুষটাকে দেয় না উজ্জীবন। দেবতা-প্রকৃতি-মানব কেউ লাঘব করতে পারে না তাঁর প্রাণের তাপ। 'কথা সুরের-মিলিত কারুণ্য কেবল লক্ষ্য করে যায় কোনো নিষ্ঠুরকে, পাগলকে আহত উদাসী কোনো একাকী মানুষকে।' হয়ত এই একাকীত্ব তিনি মোচন করতে পারতেন রবীন্দ্রনাথের মতো বহুতর শিল্পমাধ্যমে নিজেকে মেলে ধরে নিরীক্ষায় ও পুনর্লিখনে কিংবা বিশ্বকে নীড়বর্তী করতে পারতেন সংহ , কর্ম-উন্মাদনায়। কিন্তু সে সামর্থ্য অতুলপ্রসাদের ছিল না। একাকীত্বের দায়ভার ঘোচাতে দ্বিজেন্দ্রলালের মতো তিনি আসক্ত হতে পারতেন মাদকে ও নাট্যমঞ্চে। কিন্তু বহির্বৃত্তিতে তাঁর সায় ছিল না। গানে গানে ঘুচে যেতে পারতো তাঁর আত্মদাহ। মোক্ষণ হতে পারতো নিগূঢ় আত্মতার। সৃষ্টির সেই অতিপ্রজতাও ছিল না তাঁর। একজন গীতিকার তেষট্টি বছরের জীবনে মাত্র দুশো সাতখানি গান লিখলেন কেবল? জীবনের সম্বৃতিই কি তাঁর সৃষ্টিকে করল শীর্ণ?

অতুলপ্রসাদ (১৮৭১—১৯৩৪) জন্মেছিলেন উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে। রবীন্দ্রনাথের দশ বছরের অনুজ তিনি, দ্বিজেন্দ্রলালের চেয়ে আট বছরের। তাঁর চেতনা-উন্মেষের কাল, তাঁর যৌবন, বাংলা সাহিত্যের পক্ষে উজ্জীবনের, প্রসারণের সময়। নবীন বাংলা উপন্যাস, নবীন গীতিকবিতা, প্রথম ছোটগল্প, সাধারণ রঙ্গমঞ্চের সূচনাকে ঘিরে নাটকের জোয়ার—সবকিছু ঐ সময়ের। রবীন্দ্রনাথ. দ্বিজেন্দ্রলাল তো সেই সৃষ্টিবিচিত্রতার তোলপাড়ে মথিত হয়ে রচনা করেছেন কত কিছু। গান-কবিতা-নাটক ও সমালোচনা লিখেছেন দ্বিজেন্দ্রলাল। তাঁর জীবনের আরেক প্রান্ত ছুঁয়ে গেছে প্রহসন ও হাসির গানকে। রবীন্দ্রনাথের বিচিত্র সৃষ্টির আকীর্ণ জগৎ বাদ দিলেও এসে পড়ে অতুলপ্রসাদের চেয়ে ছ বছরের অগ্রজ রজনীকান্তের কথা। তিনি অন্তত পাঁচশো গান ও অনেক নীতিকবিতা লিখেছেন মাত্র পঁয়তাল্লিশ বছরের জীবনবৃত্তে। তাঁরও সমাজমানসতার একটা দিক ছুঁয়ে গিয়েছিল হাসির গানের বর্ণরঙিন দিগন্ত। এই সবকিছুর সঙ্গে মিলিয়ে অতুলপ্রসাদ বিষয়ে কোন্ সিদ্ধান্ত করবো আমরা? তাঁর যুগ তাঁর সময় কেন তাঁকে প্ররোচিত করেনি বিচিত্র রূপবন্ধনের টানে? কেন তিনি লিখলেন না নাটক বা উপন্যাস, প্রহসন বা কবিতা? দীর্ঘ ব্যথিত জীবনের কণ্টক কি তেমনভাবে তাঁকে বিদ্ধ করেনি যার ফলে সৃষ্টির অপরিমেয় ক্ষরণে তিনি সিক্ত হলেন না? পঁয়ষট্টি বছরের জীবন আর দুশো সাতখানা গান—অসম এই সংখ্যাতত্ত্ব আমাদের টেনে আনে এক

জটিল জীবনের স্রোতাবর্তে। প্রশ্ন ওঠে তাই, গান কি তাঁর আত্মবিম্ব না আত্ম-প্রতারণা? এইখানে মনে আসবে তাঁর এক ঘোষণা :

ওগো দুঃখ সুখের সাথি, সঙ্গী দিনরাতি সংগীত মোর।

এখানে কোন্ সংগীতের কথা বলেছেন তিনি? নিজের লেখা গান না অন্যের? মানুষটি তো ছিলেন মজলিশি। নিজে যতটা গাইতেন তার চেয়ে শুনতে ভালো-বাসতেন বেশি। ১৯০২ থেকে ১৯৩৪ তাঁর জীবনের শেষ বত্রিশ বছর কেটেছে লক্ষ্ণৌ শহরের উত্তর ভারতীয় গানের সাথ্‌সঙ্গতে। লচা ঠুংরির দুই বিখ্যাত ওস্তাদ, বিন্দাদীন আর কালকার সঙ্গে ছিল তাঁর ঘনিষ্ঠতা। দিলীপকুমার রায়ের গান শুনেছেন মনপ্রাণ ভরিয়ে। তাঁর বাংলোয় প্রায়ই গানবাজনা শোনাতে আসতেন নবাব আলী সাহেব, আহমদ খলিফ খাঁ, ছোটে মুন্নে খাঁ, বরকৎ আলী খাঁ, আবিদ হোসেন। মাঝে মাঝে আসতেন আবদুল করিম। ভাতখণ্ডে ও শ্রীকৃষ্ণ রতন ঝংকার। একটি প্রতিবেদনে পাই এমন বিবরণ যে,

> ছোট মুন্নে খাঁ, ওয়াজিদ আলি শা-র দরবারের শেষ গায়ক এসে জুটেছিলেন অতুলপ্রসাদের বৈঠকখানায়। তামিল হুসেন লক্ষ্ণৌয়ের শেষ বিখ্যাত সানাইয়া কৈশরবাগে থাকতেন। রোজ ভোরবেলা টোড়ী আর ভৈঁরোরাগ বাজাতেন। অতুলপ্রসাদ সেই সুর শুনতে শুনতে ঘুম থেকে উঠতেন। ইউসুফের সেতারের মিঠে হাত, তাকে রাখলেন। বরকতের ছড়ির টান ভালো—নিয়ে এসো তাকে।

ধূর্জটিপ্রসাদ অতুলপ্রসাদের গান শোনার দুটি বর্ণনা দিয়েছেন :

> দুটি নিখিল ভারত সংগীত সম্মেলনে অতুলপ্রসাদ উপস্থিত ছিলেন; দিনে রাতে একবারও আদালতমুখো হননি। এই তিনদিনে তাঁর হাজার দুইতিন্ টাকা ক্ষতি হল। আমি সত্যই তাঁকে দেখেছি তাঁর বাড়িতে যে কোনো গান শোনার জন্য মক্কেলদের কাছ থেকে দৌড়ে পালাতেন।··· রবীন্দ্রনাথের সমঝদারী ছিল সাচ্চা। তিনি চোখ বুঁজে একেবারে মত্ত হয়ে যেতেন। অতুলপ্রসাদ হতেন উন্মত্ত।

এই উন্মত্ততার বিবরণ :

> গান শুনে মুগ্ধ হলে অতুলপ্রসাদের মুখ থেকে নানারকম উর্দু জবানের খই ফুটতে থাকে। শেষে বেসামাল হয়ে পড়েন। শিল্পীর দশ গজ দূরে থেকে তিনি শুরু করতেন, পাঁচ মিনিটের মধ্যে আরম্ভ হত তাঁর 'ওয়া ওয়া' (বাহবা বাহবা), আরো পাঁচ মিনিটের মধ্যে আরো ঘেঁষে

আসতেন, শিল্পীর সঙ্গে টেনে আনতেন গুটানো সতরঞ্চিটিকে আর তার সঙ্গে আমাকেও, যদিও বার বার সাবধান করতেন তাঁর এই ধরনের পাগলামির বিরুদ্ধে, বলতেন এমন কাণ্ড কখনো না করি।

এই বর্ণনা মনে রেখে অতুলপ্রসাদের গানের একটি অংশ শোনা যেতে পারে। সেই গানে বলেন :

বিধি আর তো তোমারে নাহি ডরি।
হানো যদি খর বাণ, আমারও তো আছে গান···।

এই গান তাঁর শস্ত্র, তাঁর ভাগ্যহত জীবনের অবলম্বন। দিলীপকুমার রায়কে একবার বলেছিলেন তিনি, 'গান আর হাসিই আমার জীবন'। সত্যিই যদি তাই হত তবে তো গানের সংখ্যা অনেক বাডত অতুলপ্রসাদের। আসলে কিন্তু তা হয়নি। তবে কি এই উক্তি তাঁর বানানো? লক্ষ্য করলে দেখা যাবে গানের উপর তাঁর যতটা নির্ভরতা ছিল তার বেশি বা সমান সমান ছিল ঈশ্বরের প্রতি। একটা গানে বলেছেন :

আছে তোর গানের তরী
আছে তোর প্রেমের হরি

আর এ তো সত্যিই যে সমর্পণের পক্ষে গানের চেয়ে দেবতা অধিকতর নির্ভরযোগ্য। প্রকৃতপক্ষে অতুলপ্রসাদের সমস্যা গান নিয়ে যতটা তার চেয়ে গানের স্বরূপ নিয়ে।

কি গান গাইতেন তিনি, কেমন গান? দুঃখের না সুখের কিংবা সমস্যাটা এই যে, দুঃখে বিজড়িত জীবন থেকে কেমন করে তুলে আনবেন হরষ গান? সমস্যার একদিকে এই গান :

হৃদে জাগে শুধু বিষাদ রাগিণী
কেমনে গাহিব হরষ গান?
আমায় বোলো না, বোলো না গাহিতে গান।

আরেক দিকে স্ববিরোধ এইখানে যে, আনন্দে, উল্লাসে, প্রেমে তাঁর প্রতিদিনের জীবন জায়মান হয়ে ওঠে না। তাই যখন,

সবাই কহে, নূতন সুরে গাও
নূতন প্রেমের নতুন গান শোনাও;
আমি যে গো করতে নারি আর মনের সাথে গানের ছলনা।

এইবার বোধহয় তাঁর সৃজন-উৎসের মূল সংকটে পৌছাতে পারলাম আমরা।

যেমন-তেমন গানের সংখ্যাবৃদ্ধি তাঁর কাম্য ছিল না। ব্যক্তিজীবনের গাঢ়তার তাপে ভরতে চেয়েছেন তাঁর গানকে। বলতে চেয়েছেন জীবনের সঙ্গে হয়তো মনের ছলনা চলতেও পারে, দাম্পত্যের মধ্যেও রাখা যায় এক ছদ্মশোভনতা, কিন্তু গানের সঙ্গে মনের ছলনা চলে না। তাহলে কি ধরে নিতে পারি যে, অতুলপ্রসাদের বেশীর ভাগ গান আত্মজীবনস্পন্দী ?

সেইজন্যেই বোধহয় তার সংখ্যা এত কম। অনিবার্যভাবে আমাদের মনে রাখা জরুরি, রবীন্দ্রনাথের দ্বিসহস্রাধিক গানের অর্ধেক রচিত হয়েছে নানা উৎসব অনুষ্ঠানকে ঘিরে। ছোটখাটো বিচিত্র উপলক্ষে ও অনুষঙ্গে, নাট্যপ্রসঙ্গে ও স্বাদেশিক প্রয়োজনে। দ্বিজেন্দ্রলালের পাঁচশো গানের মধ্যে আড়াইশো তাঁর নাটকসম্পৃক্ত আর অন্তত একশো গান হাসির। এছাড়া নিঃসন্দিগ্ধভাবে রবীন্দ্রনাথের গানে আছে আত্ম-আবরণ উন্মোচনের ব্যাকুলতা তেমনি আত্মসংবরণেরও মহিমা। দ্বিজেন্দ্রলাল ছিলেন মূলত বস্তুগত কল্পনার কবি। গান তাই তাঁর যতটা আত্মভাবের উচ্ছ্বাস তার চেয়ে বেশী বর্ণনাবহুল ও বিনোদন কামী। এই দুই গীতিকারের উদাহরণ সামনে রেখে অতুলপ্রসাদের গানের স্বরূপ ও গান রচনার তথ্য সাজালে দেখা যাবে বস্তুগত চাহিদা ও বাইরের ব্যবহারিক উপলক্ষে তাঁর গান বেশী উৎসারিত হয়নি। তাঁর গানের অব্যবহিত উপলক্ষ তাঁরই জীবন-ঘটনা বা অন্তর্জীবন। গানের ভিতর দিয়ে তাঁর বাষ্পাকুল জীবনকে অনেকটাই দেখা যায়। গানের সুর ও বাণী দেখায় সেই জীবনকে। যা 'বাহিরে চঞ্চল' অথচ 'অন্তরে অতল'। অতুলপ্রসাদের গান সম্পর্কে সব কিছু বুঝতে গেলে সরাসরি তাঁর জীবন-বৃত্তান্তের দিকে নজর রাখাই সঙ্গত। অবশ্য তাঁর জীবনবিবরণ যে খুব বিস্তারিত-ভাবে পাওয়া যায় তা নয়। তবে সম্প্রতি 'সাহিত্যসাধক চরিতমালা' পর্যায়ে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ থেকে রাজ্যেশ্বর মিত্রের লেখা তাঁর একটি জীবনী বেরিয়েছে। বিনয়েন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের লেখা 'অতুলপ্রসাদ' বইটিতে আছে ১৯২১ থেকে ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত অর্থাৎ তাঁর জীবন সায়াহ্নের শেষ তের বছরের তথ্য। মানসী মুখোপাধ্যায়ের লেখা 'অতুলপ্রসাদ' বইটি দুর্বল রচনা তবে তথ্যসমৃদ্ধ। এ ছাড়া পাই দিলীপকুমার রায়, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও সাহানা দেবীর কিছু স্মৃতিচারণ। এই সব তথ্য ও স্মৃতিকথা মিলিয়ে অতুলপ্রসাদের একটি জীবনপরিচয় আঁকতে চাই, সেই প্রয়াসে আমার দৃষ্টি থাকবে একমুখী। আমি তথ্য সাজাব মানুষটাকে বুঝতে যতটা তার চেয়ে বেশী তাঁর গানকে বুঝতে। দেখতে চাইব গানে গানে তিনি কতটা উদ্ঘাটন করতে চেয়েছেন নিজেকে, কোন্ ঘটনা সূচনা

করেছে কোন্ গানের। বুঝতে চাইব তাঁর গানের রূপবন্ধ নির্বাচনের পেছনে তাঁর জীবন অভিজ্ঞতা কতটা। গানের বাণী, শব্দবিন্যাস, প্রতিমা ও সুরসন্নিবেশে কতটুকু ব্যক্তিজীবনের চিহ্ন আছে।

## ২

পূর্ববঙ্গের ফরিদপুর জেলার মাদারীপুর পরগনার অন্তর্বর্তী দক্ষিণ বিক্রমপুরের মগর গ্রামে থাকতেন এক দরিদ্র বৈদ্য পরিবার। সেই পরিবারের কৃষ্ণচন্দ্র সেন ছিলেন কবিরাজ। তাঁর পাঁচ সন্তান। ছেলে তিনজন—দুর্গাপ্রসাদ, গুরুপ্রসাদ ও রামপ্রসাদ, দুই মেয়ে—উমাতারা, ভবসুন্দরী। দুর্গাপ্রসাদ মারা যান শৈশবে। গুরুপ্রসাদ শিক্ষার পাঠ নেন ভগ্নী ভবসুন্দরীর শ্বশুরালয়ে, রামপ্রসাদ আরেক ভগ্নী উমাতারার শ্বশুরালয়ে। এই রামপ্রসাদই অতুলপ্রসাদের পিতা। তাঁর জীবনের দিকেই এবার আমরা মনোযোগী হব।

রামপ্রসাদের জন্মসাল ১৮৪৩। পণ্ডিতসা গ্রামে দিদির আশ্রয়ে বিদ্যালয়ের শিক্ষা সাঙ্গ করে তিনি কিছুকাল জপ্‌সা গ্রামে শিক্ষকতা করেন। কিন্তু তাঁর মনে ছিল উচ্চাকাঙ্ক্ষা। তাই প্রারম্ভ যৌবনে একাই চলে আসেন নবজাগরণের পীঠস্থান কলকাতার উচ্চবর্গের পরিমণ্ডলে। কলকাতায় তখন নতুন একদল বঙ্গ-সন্তান নব উদ্‌ভাবিত ব্রাহ্মধর্মের সূত্রে সমাজ ও সাহিত্যে পালাবদলের অঙ্গীকার নিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে প্রধানতম ব্যক্তিত্ব মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের স্নেহ ও অনুগ্রহ পান রামপ্রসাদ। তাঁরই আর্থিক আনুকূল্যে ডাক্তারী পড়েন। ঢাকায় এসে সরকারী চিকিৎসকের চাকরি নেন। সম্ভবত কেশবচন্দ্র সেনের কাছে নববিধান মতে তিনি দীক্ষা নেন। এই ব্রাহ্মধর্ম নেওয়ার ফলে তখনকার রক্ষণশীল-দের নিয়মে তিনি ব্রাত্য হয়ে পড়লেন নিজ সমাজে, কিন্তু মূলত দরিদ্র এই গ্রামীণ যুবকের সামনে প্রসারিত হল এক সম্পন্ন সচ্ছল উচ্চবর্গের নতুন সমাজ। উনিশ শতকের দ্বিতীয় অর্ধে পূর্ববাংলার এক উচ্চাশাসম্পন্ন দরিদ্র যুবকের এই একক আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রাম তাঁর মধ্যে নিশ্চয়ই এনেছিল অনেকটা প্রত্যয় ও সাহস। ব্রাহ্মধর্ম এনেছিল মনের উদারতা। ফলে অচিরে চাকরি ছেড়ে তিনি ঢাকায় এক চিকিৎসালয় বানিয়ে স্বাধীন জীবিকা নিলেন, তাতে সফলতা এল। তিনি ঢাকায় ব্রাহ্মসমাজের উচ্চবর্গে গৃহীত হলেন। তখনকার বিখ্যাত ধনাঢ্য ব্রাহ্ম সাধু কালীনারায়ণ গুপ্তর কন্যা হেমন্তশশীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হল। তাঁদের চার সন্তানের মধ্যে অতুলপ্রসাদই বড়। বাকি তিনজন মেয়ে—হিরণ, কিরণ ও প্রভা।

১৮৭১ সালের ২৫ অক্টোবর ( রাজ্যেশ্বর মিত্রের মতে ১৮৭২ সালের ২৫ অক্টোবর ) অতুলপ্রসাদের জন্ম। ১৮৮৪ সালে তাঁর পিতৃবিয়োগ ঘটে। তখন তাঁর বয়স বার-তের, তাঁর মা হেমন্তশশীর বয়স সাঁইত্রিশ। তাঁর মার বয়স বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ অতুলপ্রসাদের পিতার একটি ঔদার্যপূর্ণ মন্তব্য—'আমার অবর্তমানে তুমি পুনরায় বিবাহ করো'। এই মন্তব্য হেমন্তশশীর পরবর্তীজীবনে খুব দ্যোতক হয়ে উঠবে।

পিতার মৃত্যু অতুলপ্রসাদকে পুনর্বাসিত করল তাঁর মাতামহ পরিবারে মা-বোন সমেত। তাঁর পিতৃভূমি তাঁকে আহ্বান করেনি কেন না সেখানকার দরিদ্র হিন্দু পরিবারে ও গ্রামীণ সমাজে এই ব্রাহ্মসন্তান ছিলেন অনাকাঙ্ক্ষিত। মাতামহ কালীনারায়ণের কাছেই বলতে গেলে অতুলপ্রসাদের গানের দীক্ষা। এর আগে যদিও তিনি প্রায়ই পিতার সঙ্গে যেতেন সমাজমন্দিরে এবং গানে সঙ্গত করতেন মৃদঙ্গ কিন্তু কালীনারায়ণ ছিলেন প্রকৃতই গীতিকার ও গায়ক, কাজেই তাঁর সঙ্গ অতুলপ্রসাদকে গানে উদ্বোধিত করে। বাড়ির গানের পরিবেশ, নগরকীর্তনে অংশগ্রহণ, মাসী সুবালার গীতিচর্চার প্রভাব এবং মামাতো বোনেদের গীতময় সান্নিধ্য তাঁর ভিতরের সংগীত-পুরুষকে ফুটিয়ে তুলেছিল খুব ধীরে। মামারা ছিলেন উচ্চশিক্ষিত, উদার, সুপ্রতিষ্ঠিত ও ধনী। তাঁদের নাম স্যার কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত, প্যারী গুপ্ত, বিনয় গুপ্ত ও গঙ্গাগোবিন্দ গুপ্ত। এই উচ্চবিত্ত সমাজ ও উচ্চশিক্ষিত মানুষদের উদার ধর্মবোধ ও অবাধ মেলামেশা কিন্তু ভিতরে ভিতরে প্রস্তুত করছিল এক ভাবী বিপর্যয়ের সোপান। অসবর্ণ ও নির্বিচার নানা ব্রাহ্মবিবাহ তখন মাঝে মাঝে চঞ্চল করে দিচ্ছিল স্বাভাবিক জীবনের ভিত্তি। স্পর্শকাতর অতুলপ্রসাদকে তখনও তা তেমন করে ছোঁয়নি। ১৮৯০ সালে একটু বেশি বয়সেই তিনি ঢাকা থেকে এনট্রান্স পাস করেন এবং সেই বছরেই ঘটে যায় তাঁর জীবনের সবচেয়ে বেদনাবাহী ঘটনা। তাঁর মা পুনর্বিবাহ করেন কলকাতার দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের জ্যেঠা দুর্গামোহন দাশকে। এই ঘটনা তখনকার ব্রাহ্ম সমাজকেও আলোড়িত করে এবং অতুলপ্রসাদকে একেবারে ভেঙে দেয়, কেননা আজীবন তিনি মাকেই সবচেয়ে ভালোবেসে গেছেন। এই অসামান্য মাতৃভক্তি যেমন তাঁর কাছে বিবাহ ঘটনাটিকে বহুগুণিত করে তেমনি বাকি জীবনের ভরকেন্দ্র টলিয়ে দেয়। অতুলপ্রসাদের গানে কেন অমন নিঃসঙ্গতা, কেন অত বেদনা, তার সন্ধান তাঁর জীবনঘটনাতেই মেলে।

জননীর সকরুণ আহ্বান এবং সৎ পিতার উদার আতিথ্য উপেক্ষা করেন

অতুলপ্রসাদ। বোনেদের মার কাছে রেখে নিজে আশ্রয় নেন মেজমামা প্যারী গুপ্তের কাছে। মামা তাঁকে ভর্তি করে দেন প্রেসিডেন্সি কলেজে। মা-র সঙ্গে তাঁর স্পর্শকাতর মনের যে গোপন সংঘর্ষ চলছিল এবং বিক্ষত হচ্ছিল নিঃসঙ্গ হৃদয়, অনেকটা তার থেকে বাঁচাতেই যেন ধনবান মাতুলরা তাঁকে বিলাত পাঠান ব্যারিস্টারি পড়তে। সেখানে তাঁর সহাধ্যায়ী ও ঘনিষ্ঠ ছিলেন ভবিষ্যৎ ভারতের নবযুগ নির্মাতাদের অনেক। যেমন চিত্তরঞ্জন দাশ, অরবিন্দ ঘোষ, মনমোহন ঘোষ, সরোজিনী নাইডু। এখানেই তাঁর জাতীয় চেতনার দীক্ষা ঘটল যা ভবিষ্যতে জন্ম দেবে অনেক স্বদেশী সংগীতের। কিন্তু আশ্চর্য যে, বিলাতপ্রবাসে বিখ্যাত গায়িকা ম্যাডাম প্যাটের গান শুনে মুগ্ধ হলেও বিলিতি সুর তাঁকে টানেনি। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলাল সেখানে বিলিতি গান শিখেছিলেন অর্থ ব্যয় করে। ভবিষ্যতে সেই চর্চা তাঁর গানে আনে দেশী-বিদেশী সুর মিশ্রণের সাহস আর জাগিয়ে দেয় হাসির গানের অভিনবত্ব। অতুলপ্রসাদ যে সেই গানে ও সুরে গ্রস্ত হলেন না তার কারণ তাঁর গান রচনার তেমন কিছু পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিল না। বরং তাঁর নজর ছিল জীবনকে জীবিকামুখী শক্ত ভিতে দাঁড় করানোর দিকে। বোনেদের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবনা ছিল প্রবলতর। ইতিমধ্যে আরেকটি ঘটনা তাঁর নিঃসঙ্গ অন্তর্জীবনকে আলোড়িত করে দেয়। বড়মামা কে. জি. গুপ্ত বিশেষ কাজে সপরিবারে বিলাত যান। মামাতো বোন হেমকুসুমের সান্নিধ্য অতুলপ্রসাদের আহত হৃদয়ে শান্তি দেয়। নিজেদের অজান্তে কখন কোন মনের টানে তাঁরা দুজন দুজনকে মনোনীত করে ফেলেন। ব্রাহ্মসমাজের অতিস্বাধীনতা ও উদারতা সব সময়ে ভালো হয়নি সকলের পক্ষে। নিরপেক্ষ বিচারে দেখা যায়। অতুলপ্রসাদের জীবনবিকাশে অস্বাভাবিক ঘটনাপুঞ্জ বার বার ঘনিয়ে উঠেছে। দুর্বলচিত্ত মানুষটি সহজেই সায় দিয়েছেন তাৎক্ষণিকতায়। অভিজাত বাড়ির সচ্ছল পরিবেশে লালিত হেমকুসুমও ছিলেন জেদী ও একরোখা। কাজেই অসম স্বভাবের দুটি তরুণ তরুণী যে হৃদয়-সম্পর্কে আবদ্ধ হন তাতে বিবেচনার চেয়ে বড় হয়ে উঠেছিল ক্ষণিক উচ্ছ্বাস ও স্বেচ্ছাচারী মনোভাব। বিবাহের অনুমতি অভিভাবকদের কাছ থেকে হেমকুসুমই আদায় করেন ভবিষ্যতে।

১৮৯৫ সালে অতুলপ্রসাদ বিলাত থেকে কলকাতা ফেরেন। স্যার সত্যেন্দ্র-প্রসন্ন সিংহের সহকারী হয়ে যোগ দেন আইন ব্যবসায়ে। কলকাতার উচ্চবর্গের সমাজ ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল এই বিলাত-প্রত্যাগত যুবককে কাছে টেনে নেয়। 'খামখেয়ালী সভা'য় তিনি কনিষ্ঠ সভাসদ হন—রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়,

অবনীন্দ্রনাথ, চিত্তরঞ্জন দাশ, বলেন্দ্রনাথ, লোকেন পালিত, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, রাধিকামোহন গোঁসাই, নাটোরের রাজা জগদীন্দ্র রায়ের মতো অভিজাতদের সংসর্গে। 'আমার কয়েকটি রবীন্দ্রস্মৃতি' রচনায় ('উত্তরা', মাঘ ১৩৮৮) অতুলপ্রসাদ 'খামখেয়ালী সভা'র এক চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন এইভাবে :

> এ খামখেয়ালীর মজলিসকে মশগুল রাখিতেন পরম হাস্যরসিক দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। তিনি আমাদিগকে হাসির বন্যায় ভাসাইতেন তাঁহার হাসির গান গাহিয়া। আমরা সকলে তাঁর হাসির গানের কোরাসে যোগ দিতাম, রবীন্দ্রনাথ ছিলেন কোরাসের নেতা। সকলের মুখে হাসি, কণ্ঠে গান, হাসির উচ্চরোলে সভাস্থল কম্পান্বিত হইত। দ্বিজেন্দ্রলাল গাহিতেন—"হোতে পাত্তেম আমি একজন মস্ত বড় বীর", আর রবীন্দ্রনাথ মাথা নাড়িয়া কোরাস ধরিতেন—"তা বটেইতো, তা বটেইতো"। দ্বিজেন্দ্র গাহিতেন—"নন্দলাল একদা করিল ভীষণ পণ" রবীন্দ্র গাহিতেন—"বাহা রে নন্দ বাহা রে নন্দলাল"।

অতুলপ্রসাদের এই রচনা পড়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে ১৯৩২ সালের ২৮ মার্চ এক চিঠিতে লেখেন :

> তুমি যে ব্যাপারে বর্ণনা করেছ সেটা প্রাক্‌-খামখেয়ালী যুগের। তখন আমি আমার স্বজন বন্ধু মহলে দ্বিজেন্দ্রলালের খ্যাতির ভূমিকা রচনা করে বেড়াচ্ছিলুম।…তুমি সেদিনকার ইতিহাসের দুই অধ্যায়কে এক অধ্যায়ে মিলিয়েছ।

এ ক্ষেত্রে অবশ্য অতুলপ্রসাদের স্মৃতিই সঠিক। রবীন্দ্রনাথের স্মৃতি এখানে তাঁকে প্রতারণা করেছে।

শিল্প ও সৃজন জগতের সঙ্গে এইখানেই তাঁর প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটে। প্রেরিত হন তিনি। পেয়ে যান রবীন্দ্র-সান্নিধ্যের বাঞ্ছিত সুযোগ। কিন্তু আইন ব্যবসায়ে প্রত্যাশিত সাফল্য আসে না। ইতিমধ্যে ১৮৯৭ সালে সৎপিতা দুর্গামোহন মারা যান। পুরো সংসারের দায়িত্ব এসে পড়ে। মামার বাড়ির সঙ্গে অস্বস্তিকর সম্পর্ক ঘনিয়ে ওঠে হেমকুসুমের পরিণয় প্রস্তাবে। শেষ পর্যন্ত ১৯০৯ সালে সম্পন্ন হয় তাঁদের বিচিত্র বিবাহ। বিচিত্র, কেননা ভাই-বোনের সেই সমাজছুট বিবাহে সেকালে আইনের সায় ছিল না। তাঁদের তাই যেতে হয় স্কটল্যাণ্ডের গ্রেটনাগ্রীন গ্রামে, সেখানে এই বিবাহরীতি বৈধ ছিল। অতুলপ্রসাদ আর হেমকুসুমের মিলন আত্মীয়বর্গের আশীর্বাদধন্য হয়নি। হেমন্তশশী কোনোদিন অন্তর থেকে মেনে নেননি

হেমকুসুমকে। হেমকুসুমও কোনোদিন সহ্য করতে পারেননি অতুলপ্রসাদের মাতৃভক্তি। বিশেষত তাঁর মনে এ-অভিমান ছিল যে বিবাহের পর তাঁদের দুবছর অসহায়ভাবে সংগ্রাম করতে হয়েছিল বিলাতে, যমজ সন্তানের একটি সেখানে মারা যায় অনেকটাই অযত্নে ও অর্থাভাবে। অনিশ্চিত বিলাত প্রবাস থেকে অতুলপ্রসাদ ফিরে আসেন ১৯০২ সালে। ব্যারিস্টার মমতাজ হোসেন তাঁকে লণ্ডনে পরামর্শ দেন লক্ষ্ণৌয়ে গিয়ে আইন ব্যবসা করতে। এ ব্যাপারে সক্রিয় সাহায্য করেন তিনি। তার ফলে ১৯০২ থেকে ১৯৩৪ এই বত্রিশ বছর লক্ষ্ণৌতে অতুলপ্রসাদ সফল হন তাঁর জীবিকায়, সমাজের নানা সংগঠনে জড়িত থেকে, গান গেয়ে লিখে ও শুনে। নিজের মা-বোনদের প্রতি যথাকর্তব্য ও দায়িত্ব পালন করেন, সমাজে প্রতিষ্ঠা পান, হন লোকপ্রিয়। কিন্তু কোনোদিনই সফলতা আসে না তাঁদের দাম্পত্য সম্পর্কে। দোটানায় পড়ে, অবহেলায় মানুষ হয় না একমাত্র সন্তান দিলীপকুমার সেন। অতুলপ্রসাদের শেষ বত্রিশ বছরের জীবন, প্রত্যহের কুশাংকুরের প্রহারে পাংশু ছিল। ছোটখাটো ঘটনা, ভুল বোঝাবুঝি, বিরহ, আবার ক্ষণমিলন থেকে গান জেগেছে তাঁর। একই লক্ষ্ণৌ শহরের দুই আলাদা বাড়িতে থাকতেন তিনি ও হেমকুসুম। পরস্পরের প্রতি আগ্রহ ছিল, ছিল মিলনেরও প্রতীক্ষা। এক এক দিন অতুল-প্রসাদের শূন্য ঘরে সুন্দরের আবির্ভাব ঘটত হেমকুসুমের রূপে কিন্তু তা অবিলম্বে ধ্বস্ত হত কুৎসিত সংঘর্ষে। হেমন্তশশী এসে থাকতেন প্রায়ই, থাকতেন বোনেরা। হেমকুসুমের ক্রোধের সেও ছিল এক কারণ। এদিকে নিজের বাড়িতে একলা বসে অর্গান বাজিয়ে তিনি গাইতে ভালোবাসতেন অতুলপ্রসাদেরই গান। 'তুমিও একাকী আমিও একাকী' গানটি আক্ষরিকভাবেই সত্য ছিল তাঁদের জীবনে।

ইতিমধ্যে অনেক গান জমে উঠেছে অতুলপ্রসাদের। তাতে দুঃখের ভাগই বেশি। লক্ষ্ণৌয়ের নানা জনহিতকর কাজে আমূল জড়িয়ে ফেলেছেন নিজেকে। প্রতি সন্ধ্যায় গানের মজলিস বসতো নিজের বাড়ি কিংবা অন্যত্র। ১৯২১ সালে লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকাল থেকে তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার সূচনা। বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক হয়ে আসেন ধূর্জটিপ্রসাদ, রাধাকুমুদ, রাধাকমল, নির্মল সিদ্ধান্ত, বিনয়েন্দ্র দাশগুপ্তের মতো গুণীজন। তাঁদের আড্ডার মধ্যমণি হয়ে ওঠেন অতুলপ্রসাদ। তাঁদের সান্নিধ্যে আত্মসান্ত্বনা দেন এমনতর গানে যে—

ভুলে যাই সবাই আমার
নইত আমি ভিন্ন সবার ;
দশের মুখে হাসি রেখে কাঁদব আমি কোন দুখে ?

জীবনদেবতাকে জানান,

সবারে রাখিব বুকে
মোরে কেমন রাখিবে দুখে
সবাকার হাসি যে গো মোরই।

কিন্তু কার্যত তাতে আত্মাকেন্দ্রিকতা ঘোচে না। হেমকুসুমের সঙ্গে প্রেম-অপ্রেমের এক বিচিত্র দোলাচল সম্পর্ক কেবলই গানে গাঁথা হতে থাকে। কখনও ভাবেন সবাইকে ভালোবেসে বুঝি মনের কালো ঘুচবে তাঁর। আবার কখনও নিজেকে বলেন—

ভুলে যা দুখের দাহন
ডুব দিয়ে গান-সুধার রসে।

শেষ পর্যন্ত তবু থাকে প্রতীক্ষা,

কবে তুমি আসিবে মোর আঙিনায়
কত বেলী, কত চামেলি যায় বৃথা যায়।

অবশেষে বুঝতে পারেন বাস্তবে তাঁদের মিলন বোধ হয় আর সম্ভবই নয়। কল্পনাপ্রবণ মন তাই স্বপ্নের হাতে নিজেকে সঁপে দিয়ে গাঢ় অভিমানে গায়,

তাই ভালো দেবী, স্বপ্নেই তুমি এসো।
যদি না বসিবে জীবন আসনে, পরান আসনে বোসো
আজি দুজনার কত ব্যবধান তবু দূর নাহি লেশ।

স্বামী-স্ত্রীর সেই অভিমানক্ষুব্ধ বৃত্তবন্দী জীবনের বাইরে অবশ্য একটা বড় সমাজের দাবিও ছিল অতুলপ্রসাদের কাছে। নানা উৎসব, সম্মেলন ও সংবর্ধনার জন্য প্রায়ই নানা গান লিখতে হত তাঁকে। উপলক্ষের পরিধি ছাপিয়ে সে সব গান এখন আমাদের নিত্য সম্পদ হয়ে উঠেছে। এখানে মনে রাখা চাই, ১৮৯২ সালে অতুলপ্রসাদ যখন বিলাত যাচ্ছিলেন তখন ভূমধ্যসাগরে পৌঁছে গণ্ডোলা চালকদের গানের সুরে তিনি একটি গান বাঁধেন : 'উঠগো ভারত লক্ষ্মী'। সেই গানের বাণী অপটু ও দুর্বল কিন্তু সুরের বিন্যাস গানটিকে আজ জনপ্রিয় করে তুলেছে। এ গান অবশ্য কোনো উপলক্ষ থেকে উৎসারিত নয় কিন্তু তাঁর শিক্ষানবিশ কালের উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি। বুঝতে হবে তখনও অর্থাৎ তাঁর কুড়ি বছরে পৌঁছে অতুলপ্রসাদ পাননি তাঁর নিজস্ব গান রচনার রূপবন্ধ ও নিজস্ব সুর রচনার ধরন। প্রতিতুলনার উদাহরণে এখানে স্মরণীয় যে, রবীন্দ্রনাথ তাঁর কুড়ি বছরে 'ভানুসিংহের পদাবলী' ও 'বাল্মীকি-প্রতিভা'-র গান সমেত ১১৩ খানি গান লিখে ফেলেছিলেন।

দ্বিজেন্দ্রলালও বিলাত যাত্রার আগে উনিশ বছর বয়সে তাঁর প্রথম গীতসংকলন 'আর্যগাথা ১ম খণ্ড' প্রকাশ করে গেছেন।

দেখা যাচ্ছে অতুলপ্রসাদের জীবনে গান রচনার উৎস কোনো স্বতোচ্ছল আনন্দ বা বিষাদজাত নয়, তিনি মূলত কবিও নন। ব্যক্তিজীবনের নিঃসঙ্গ আত্মবেদনার বাইরে তাঁর ঔপলক্ষিক গান রচনার সংখ্যা হয়তো খুব বেশি হলে দশটি। তার মধ্যে চারটি অতি বিখ্যাত। রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার পাওয়ার উপলক্ষে তাঁর আনন্দ উচ্ছ্বাস ফুটে ওঠে ১৯১৩ সালে লেখা 'মোদের গরব মোদের আশা' গানে। এ গানের বাণী ও সুরের বিন্যাস বিচার করলে বোঝা যায় চল্লিশোর্ধ্ব বয়েসর গীতিকার পেয়ে গেছেন তাঁর নিজস্ব বাণী ও বন্দেশ্। ১৯১৬ সালে লক্ষ্ণৌতে যে জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন বসে সেখানে সম্মেলক গানের প্রয়োজনে তিনি লেখেন 'বলো বলো বলো সবে শতবীণা বেণু রবে'। এ ছাড়া প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন আওয়ার ডে ফাণ্ডের চাঁদা তোলার জন্য তিনি লেখেন : 'হও ধরমেতে ধীর হও করমেতে বীর'। ১৯২৩ সালে লক্ষ্ণৌতে রবীন্দ্রনাথের আগমনকে উপলক্ষ করে তিনি লেখেন 'জয়তু জয়তু জয়তু কবি'। স্পষ্ট তথ্য জানা যায় না, তবে নিশ্চিত কোনো উপলক্ষেই তিনি লেখেন 'প্রবাসী, চল্‌রে দেশে চল্'। এই গানের বাণীতে বোনা আছে তাঁর শৈশবের সিক্ত স্মৃতি। ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করার ফলে তাঁর পিতা স্বগ্রামে হয়েছিলেন একঘরে। তাই গ্রামের নিম্নবর্গ ও মুসলমানদের সঙ্গে ছিল তাঁদের ভালোবাসা ও দেওয়া-নেওয়া। সেইজন্যেই কি তাঁর বিশেষভাবে এই গানে মনে পড়ল :

> হরির লুটের বাতাসা, আর পৌষমাসের পিঠা,
> পীরের সিন্নি, গাজীর গান আর করিম ভাইয়ের ভিটা।
> আহা মরি সেই স্মৃতি আজ লাগছে কত মিঠা!

তাঁর লক্ষ্ণৌ জীবনের ঘটনাপঞ্জী জড়ো করলে দেখা যাবে সারাদিন তাঁর কাটত আদালতে, সন্ধ্যাবেলা কাটত বন্ধুসান্নিধ্যে বা সংগঠনে, কোনো কোনোদিন গানের আসরে। দিলীপকুমার রায় তাঁর 'স্মৃতিচারণ' বইতে অতুলপ্রসাদ সম্পর্কে লিখেছেন :

> শ্রীঅতুলপ্রসাদ সেন ছিলেন লখনৌয়ের শ্রেষ্ঠ ব্যারিস্টার—সবাই জানেন। বহু টাকা উপায় করতেন। উর্দু বলতেন চমৎকার। অবাঙালীদের মধ্যেও তাঁর বন্ধুর অভাব ছিল না। যেমন উদার, তেমনি রসিক, তেমনি আতিথেয় ও বন্ধুবৎসল। লখনৌয়ের প্রবাসী বাঙালীদের তিনি ছিলেন সত্যই মুকুটমণি।

খেতে ভালোবাসতেন অতুলপ্রসাদ এবং খাওয়াতে। তার জন্য বাবুর্চি ছিল। দৈনন্দিন বিলাসব্যসনে ও শারীরিক শ্রমলাঘবে নিয়োজিত থাকত ভৃত্য। কিন্তু সহধর্মিণী থাকতেন না প্রায়শই। যদি হঠাৎ কখনও এসে পড়তেন হেমকুসুম কোনো উপলক্ষে তবে গান জেগে উঠত। এমনই এক ক্ষণমিলনের দিনে তিনি লেখেন :

আমার আঙিনায় আজি পাখি গাহিল একী গান ?
যে করেছে অবহেলা আমার গানের মালা,
আজ কি পাখির গলায় তার গলার প্রতিদান ?
যে দিয়েছে এত ব্যথা, মনে হয় তারি কথা ;
বুঝি গো ভিজেছে আজি তার নিঠুর দু'নয়ান।
বল্‌রে অজানা পাখি, তুই তার দূত নাকি ?
এতদিনে ভাঙিল কি তার গভীর অভিমান ?

এর বিপরীত ঘটনাও আছে এবং ভিন্ন সুরের গান। যেমন ১৯২৩ সালে যেবার রবীন্দ্রনাথ আসেন লক্ষ্ণৌয়ে অতুলপ্রসাদের বাড়ি তখন হেমকুসুম ছিলেন অন্য বাড়িতে। কিন্তু কবির আগমন সংবাদে হঠাৎই এসে পড়েন গৃহকর্ত্রীর স্বাভাবিক ভূমিকায়। সেবাযত্নে কদিন কাটান তিনি। অতুলপ্রসাদ পান প্রার্থিত কিন্তু দুর্লভ পত্নী-সান্নিধ্য। অথচ রবীন্দ্রনাথের বিদায়ের দিনই ছেলেকে নিয়ে হেমকুসুম ফিরে গেলেন তাঁর ক্যান্টনমেন্ট রোডের বাসায়। অপ্রতিভ অভিমানক্ষুব্ধ গীতিকার বুঝি সেদিনই লেখেন সেই অসামান্য গান

ওগো নিঠুর দরদী, এ কী খেলছ অনুক্ষণ !
তোমার কাঁটায় ভরা বন তোমার প্রেমে ভরা মন।
মিছে দাও কাঁটার ব্যথা, সহিতে না পার তা
আমার আঁখি-জল তোমায় করে গো চঞ্চল

ব্যক্তিজীবনের এমনই নানা বাষ্পাচ্ছন্ন অভিজ্ঞতা থেকে অতুলপ্রসাদ গান লিখতেন। কখনও কখনও তাঁদের দুজনের সম্পর্কের মধ্যে আসত অকল্পনীয় তিক্ততা। সেই সব একান্ত দুঃখতাপের ক্ষরণ তাঁকে টানত গানের দিকে। দিলীপকুমার রায়কে একবার তিনি 'কি আর চাহিব বলো হে মোর প্রিয়' গানটি শুনিয়ে বলেছিলেন, 'জান দিলীপ, এ গানটি আমি বেঁধেছিলাম আমার জীবনের এক দারুণ দুঃখের সময়ে—যখন মনে হয়েছিল···যাক সে কথা।' এই অনুক্ত বিষয়টি কোনো দিন জানা যাবে না। আরেক দিন 'বিধি আর তো

তোমাকে নাহি ডরি' গানটি গাইতে গাইতে তাঁর কণ্ঠ এসেছিল গাঢ় হয়ে। বলেছিলেন দিলীপকুমারকেই, 'দিলীপ, এ গানটি কিন্তু যার তার কাছে গেয়ো না। এ গানটি আমার বড় ব্যথার দিনে লেখা।' এ সব গানের উপলক্ষ যাই হোক, তুচ্ছ ঘটনার চিহ্ন তার গায়ে লেগে নেই। হয়তো সুরের কারুণ্যে কিছু ধরা পড়ে। হেমকুসুম ধরতে পারতেন সেই কারুণ্যের ধরন। লক্ষ্ণৌতে স্বামীসান্নিধ্যের বাইরে যখন একা থাকতেন তখন ফিটন গাড়িতে চেপে যেতেন কোনো কোনো বাড়ি। এমনই একজন অধ্যাপিকা স্নেহ চৌধুরীর বাড়িতে এসে ফরমাস করেছিলেন হেমকুসুম, 'গান করো তো শুনি। এ. পি. সেনের গান।' মনোযোগ দিয়ে গান শুনে মন্তব্য করেছিলেন, 'গান এ. পি. সেন ভালোই লেখে তবে বড় কুইপারা ( করুণ ) সুর।'

১৯০২ থেকে ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত একটানা লক্ষ্ণৌ বসবাসের মধ্যে দু বছরের ছেদ ঘটেছিল ১৯১৫ থেকে ১৯১৭। হেমকুসুমের গড়ে-তোলা একটা নিষ্ঠুর ঘটনার আঘাত পেয়ে অতুলপ্রসাদ চলে আসেন কলকাতায়। সেখানে ওকালতী করতে থাকেন এবং ওঠা বসা চলে সুকুমার রায়ের 'মনডে' ক্লাবে। গানবাজনা আড্ডা ও ভোজনে সময় কেটে যেত। সেই সময়েই যান শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে। যান জ্যেঠতুতো দাদা সত্যপ্রকাশের সঙ্গে দার্জিলিং। সেখানে সপুত্র হেমকুসুমও এসে অন্য হোটেলে ওঠেন। ছেলেকে কাছে রাখা নিয়ে মান-অভিমান চলে দুইপক্ষে। সেখানে একদিন সন্ধ্যেবেলা একজন প্রত্যক্ষদর্শী শিশিরকুমার দত্ত দেখেন, ম্রিয়মান অতুলপ্রসাদ চোখের উপর হাত রেখে গাইছেন অশ্রুধারায় :

আমায় রাখতে যদি আপন ঘরে
বিশ্ব ঘরে পেতাম না ঠাঁই।
দুজন যদি হত আপন
হত না মোর আপন সবাই।

কিন্তু জানতে ইচ্ছা করে সত্যি সত্যি কী চাইতেন তিনি? আপনঘর না বিশ্বঘর? তাঁর এক গানে এমন আত্মনির্দেশ আছে :

দুখের দাহনে হও অমল।

দিলীপকুমার স্মৃতিচারণ বইতে আরও লিখেছেন—

> বিবাহিত জীবনে অসুখী হয়ে স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর ছাড়াছাড়ি হয়। এজন্য তাঁর কুণ্ঠার সীমা ছিল না। কিন্তু এই নিবিড় বেদনায় তাঁর গানের একটা গভীর দিক খুলে যায়। স্বভাবে তিনি ছিলেন লাজুক ও সুকুমার অর্থাৎ

রিফাইণ্ড। এত সুকুমার যে, তাঁর মধুর স্নেহের নানা পেলব পরশে আমার মনে প্রায়ই ভাবোদয় হত। এমন অতি সুকুমার মানুষ আমি জীবনে বেশি দেখিনি পুরুষদের মধ্যে। গড়নে বলিষ্ঠ ও দীর্ঘাকৃতি হলেও স্বভাবে তিনি ছিলেন ঐ যে বললাম, পেলব—ডেলিকেট।

অতুলপ্রসাদের গান রচনার রীতি লক্ষ করলে বোঝা যায়, গান ছিল তাঁর নিষ্ক্রমণের পথ। খুব বড় আঘাতের ঝাপট তিনি গানে গানে সামলেছেন। সেই দিক থেকে তাঁর কয়েকটা গান যেন গাছের মতো সহিষ্ণু নীরবতায় দাঁড়িয়ে আছে আর ফুটিয়ে যাচ্ছে ফুল। যে ফুল আমাদেরই জন্য। গান ছিল তার সমর্পণেরও সম্ভার। যে বিশ্ববিধানের অলক্ষ নির্দেশে তাঁর জীবন হয়ে গিয়েছিল রিক্ত সেই অলক্ষ পরমকেই তাঁর শূন্য জীবন সমর্পণ করেন তিনি। কেননা, মানবনির্ভরতা তাঁকে শান্তি দেয়নি। তাই গান :

পক্ষ আমার গেল ভেঙে,<br>
বক্ষ আমার গেল রেঙে,<br>
তুলতে যারে বলছি<br>
হে নাথ, সেই চলে যায় দলে।

এই ভগ্ন পক্ষের বর্ণনা আমাদের পৌঁছে দেয় তাঁর গানের ভিতরের এক পাখির প্রতিমায়। নিজেকে পাখির ভূমিকায় এনে তাঁর অনুজ্ঞা ছিল : 'তুই গান গেয়ে যা আজীবন'। কিন্তু তা হলো কই ?

ঝড় এসে এক সর্বনাশা<br>
ফেলল ভূমিতলে।

এই অসহায় পতন তাঁর মধ্যে এনেছে নানা শূন্যতাবাচক উপলব্ধি। এক গানে বলেছেন 'আজি মোর শূন্য ডালা' অন্য গানে জীবনের বর্ণনা দাঁড়িয়েছে 'ভাঙা দেউল'। কখনো তা 'শুক্‌নো ডাল'। কখনো 'ভগ্ন দুয়ার'। তাঁর গানের একটি মাত্র পঙ্‌ক্তিতে গাঁথা আছে বিপন্ন জীবনের অসহায় প্রতিবেদন :

পথে ঝড়, ঘরে ডর, হাতে প্রেমফুলহার।

এই বিপন্নতা থেকে উদ্ধার পেতে তাঁর প্রারম্ভিক আবেদন ছিল মানুষীর কাছে। বলেছিলেন :

তোমার দুহাতে মম হাতখানি তোলো।

কিন্তু বলতে পারেননি, 'আমার তালে গাঁথো তোমার লয়'। ভীরু আত্মপ্রবঞ্চনায়

এই প্রেমিক শেষ পর্যন্ত মানবিক সম্পর্ককে স্বপ্নসম্ভাবনার তরল উপসংহারে এনে বলেছিলেন :

মম মনের বিজনে আমি মিলিব তব সনে;
আমি কব না, তোমার মনের কথাটি কব না,
মনোব্যথা রবে মনে।

কিন্তু মনোব্যথা মনেও রাখতে পারেননি। তার কিছু বেরিয়ে গেছে গান হয়ে। আর বাকিটুকু তাঁকে ন্যুব্জ করেছে সমর্পণে। তাঁকে পরাজয়ে বলতে হয়েছে :

সংসারে যদি নাহি পাই সাড়া,
তুমি তো আমার রহিবে!

এখানে 'তুমি' বলতে সর্বাতিশায়ী ঈশ্বর শুধু নন, তাঁর উচ্চারণে এমনকি বিশেষ ধর্মীয় 'হরি'। বাংলাগানের প্রবহমান রূপকরীতিতে তিনি কোনো কোনো গানে নিজেকে নিষ্ফল গাছের সঙ্গে তুলনা দিয়ে পরম শক্তিমানকে বলেছেন সেই গাছ দিয়ে তরী বানাতে। বাংলার বাউল গানে দেহ-তরু থেকে দেহতরী বানান যিনি তাঁকে বলা হয় সূত্রধর। 'এ মানব দেহ-তরী বানালো কোন সূত্রধর?'—এমন অনেক গান শুনেছি আমরা। অতুলপ্রসাদ তাঁর গানে এই দেহ-ভেলাকে কখনও মনে করেছেন ভাঙা, কখনও বলেছেন 'আজ আবার জোড় লেগেছে ভাঙা ভেলায়'। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বলেছেন,

তোমার ঐ মাঝ-গাঙে
এ তরীটি যদি ভাঙে
তবে সে অতল তলে
আমায় কুড়িয়ে নিয়ো হে শ্রীহরি।

এই উচ্চারণের দুর্বলতায় গানটি হারায় উজ্জীবনের মন্ত্র, হয়ে পড়ে চিরকালের বাংলাগানের গোত্রবদ্ধ। যা হতে পারত আত্মনিবেদন তা হয়ে যায় আত্মসমর্পণ। গানের মতো এও এক নিষ্ক্রমণের পথ তাঁর।

আসলে অতুলপ্রসাদ মানুষ হিসাবে ছিলেন দুর্বলচিত্ত। একবার ১৯২৫ সালের নভেম্বরে এক বন্ধুর জন্মদিনের উৎসব সেরে বাড়ি এসে দেখেন হেমকুসুম রাগে অন্ধ হয়ে অতুলপ্রসাদের সমস্ত পোশাক-আশাক দামী স্যুট প্যাণ্ট তাঁর সামনেই আগুনে পোড়াচ্ছেন। গাড়ি থেকে না নেমে তিনি সোজা চলে যান কোনো বন্ধুর বাড়ি। পরদিনই লক্ষ্ণৌ ত্যাগ করেন কলকাতার উদ্দেশ্যে। দু বছর আর ফেরেননি। এইসব বহির্ঘটনার চাপ তাঁর অন্তর্জীবনকে কতখানি বেদনাতুর করত তার বর্ণনা

পাওয়া যায় জ্যেঠতুতো দাদা সত্যপ্রসাদের ডায়েরিতে। এই ঘটনার পর তিনি দাদার বাড়িতেই উঠেছিলেন সেবার। সত্যপ্রসাদ তাঁর ডায়েরিতে লিখেছেন :

> অতুল আমার বুকে মাথা রাখিয়া পড়িয়া থাকিত। নীরবতার মধ্যেই তাহার প্রাণের বেদনা জানিতে ও বুঝিতে পারিতাম। সেও আমার সহানুভূতির স্পর্শ বুঝিতে পারিত। এরূপ সমবেদনায় আমরা কত বিনিদ্র রজনী কাটাইয়াছি। সেবারেই অতুল তার গানটি রচনা করে— 'যাব না, যাব না, যাব না ঘরে, বাহির করেছে পাগল মোরে'।

এই ঘটনা ও গানের সংলগ্নতা বিষয়ে শঙ্খ ঘোষ একটি মূল্যবান বিশ্লেষণ করে লিখছেন :

> দাদা সত্যপ্রসাদের স্মৃতি যদি গ্রাহ্য হয় তো মানতে হবে, সেই দিনটিতেই অতুলপ্রসাদ লিখেছিলেন তাঁর বিখ্যাত এই গান। এই তথ্য গানটির সঙ্গে একটি ভিন্ন কারুণ্য জুড়ে দেয় কিন্তু সেইটেই এখানে একমাত্র ভাববার কথা নয়। ভাববার কথা এইটে যে, জীবনের জটিল এ সব মুহূর্তকে জয় করে নেবার এক একটা পদ্ধতি যেন তৈরী হয়ে থাকে ও সব গানে, আমরা দেখতে পাই কীভাবে সর্বনাশ থেকে নিজেকে বাঁচাবার একটা পথ তৈরী করে নেন এঁরা, এই শিল্পীরা, তাঁদের সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে। ওই গান, প্রথম ওই দুটি লাইনের পরেই এসে ভর করতে চায় বাইরের প্রকৃতিতে, ব্যক্তিগত বেদনা শিল্পী প্রশমিত করে নিতে চান প্রাকৃতিক আনন্দের মধ্য দিয়ে।

এখানে উল্লেখযোগ্য হেমকুসুম যেদিন রাগে ক্ষিপ্ত হয়ে জামাকাপড পোড়ান সেই দিনই বোধহয় গানটি লেখা হয়নি। যদিও বিনয়েন্দ্র দাশগুপ্ত তাঁর বইতে লিখেছিলেন :

> আমি তাঁর বড় ভাই সত্যপ্রসাদ সেনের কাছে শুনেছি। একদিন অতুলপ্রসাদ বাড়ির ভিতরে ঢুকে দেখতে পেলেন তাঁর সমুদয় কোট, পাতলুন স্তূপীকৃত হয়ে আগুনে জ্বলছে। তিনি ক্রোধ এবং বহ্নি থেকে পালিয়ে এসে দাদার বাড়িতে রাত কাটালেন। সত্যবাবু আমাকে বলেন যে সেইদিন অতুলপ্রসাদ এই গানটা লিখেছেন।

বস্তুত সত্যপ্রসাদ তো লক্ষ্ণৌ থাকতেন না। থাকতেন কলকাতা। কাজেই সেদিন গানটা লেখা হয়নি। আগে উদ্ধৃত সত্যপ্রসাদের ডায়েরীর অংশ প্রমাণ করছে

গানটা লেখা হয়েছে কলকাতায়, ঘটনার কদিন পরে। কাজেই বিনয়েন্দ্রনাথের এই মন্তব্য একেবারেই টেঁকে না যে,

> কবির ক্ষুদ্র কলম ক্ষুদ্র ব্যথাকে উঁচুস্তরে নিয়ে গিয়ে বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে যুক্ত করিয়ে দিল। এই জন্যই অতুলপ্রসাদ কবি এবং একটি মধুরতম চরিত্র—যা সাঁধারণ মানুষের স্তর থেকে উচ্চে—এইখানেই অতুলপ্রসাদের মহত্ত্ব সংযম।

পরবর্তী বিশ্লেষণে বিনয়েন্দ্র অবশ্যই ঠিক লেখেন :

> মনের দুঃখ চাপি মনে
> হেসে নে সবার মনে······তিনি সত্যই এ নির্দেশ তাঁর জীবনে মেনে নিয়েছিলেন—কখনও মনের দুঃখ ও অপমান গৌরবের সঙ্গে বহন করে নিয়েছেন।

এই মহৎ সংবরণ যেমন মানুষ অতুলপ্রসাদের বিগ্রহ আমাদের কাছে বড করে ধরে তেমনই এ কথাও বড় হয়ে ওঠে, যেমন বলেন তিনি গানে, 'তার গোপন কথা প্রাণের ব্যথা করুণ গানে গাঁথা'। তাঁর গান বাংলার গীতিকারদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী জীবনসম্পৃক্ত।

তাই বলে আমরা যেন ভেবে না বসি যে, তাঁর সব গানই অব্যবহিত কোনো তাৎক্ষণিক' ব্যথার বাণীরূপ। আসলে অন্তঃশীল এক দুঃখের দাহন তাঁর জীবনে স্বতঃপ্রবাহিত ছিল। তাই অনেক সময় আনন্দের গান হয়ে যায় বিষাদপরিণামী। বলেওছিলেন সেই কথা :

> ভেবে দেখো, জীবনটা কি তাই নয়? যেথানেই দেখছ আনন্দ-তলিয়ে দেখবে সেখান থেকেই পাবে দুঃখ ও ব্যথা।

এই তলিয়ে দেখতে গিয়ে তিনি বনের বিজনে আবিষ্কার করে ফেলেন এক উদাসীন একাকীত্বের বোধ। জল তাঁকে পরামর্শ দেয় তার অতল অন্তরে শীতল হতে। তাঁর জীবনের শুকনো ডালে নবীন পাখি যখন গান গায় তখন তাতে করুণ সুরই বেজে ওঠে। নিদ্রাহারা তাঁর রাতের গানে সবচেয়ে বড় হয়ে ওঠে অবহ জীবনের বিষণ্ণতার অনুভব। ক্রুদ্ধ আকাশ আর রুদ্ধ দুয়ার দেখে ভাবেন, 'তুমি কি গো তারই সেই মুখভার?' কর্ষিত মাটিতে তিনি শস্যের ভাবী সম্ভাবনার ঘ্রাণ পান না। বরং মাটিব কর্ষণ তাঁকে অন্য কথা শেখায়,

> মৃত্তিকা বলে মোরে, 'ওরে মূঢ় নর,
> হৃদয় আঘাতে তব কেন এত ডর?

দীর্ণ মম বক্ষ যত, আঘাত যত খর
শস্য সুফল তত, ততই শ্যাম মনোরম।'

আত্ম উজ্জীবনের চেয়ে এ সব উচ্চারণে উৎসর্জনের কারুণ্য লেগে যায়।

তাঁর জীবন-ঘটনাকে আর একবার আনা যেতে পারে গানের স্বরূপ বুঝতে। ১৯১৫ থেকে ১৯১৭ কলকাতায় আইন ব্যবসায়ের পর আবার অতুলপ্রসাদ ফিরে আসেন লক্ষ্ণৌ। ডুবে যান কাজের চাপে ও বন্ধুতার আনন্দে। দাম্পত্য-সম্পর্কে তেমন করে আর জোড়া লাগে না। মাঝে মাঝে সংগীত অধিবেশন, কখনও জীবিকার টানে বিলাত যাওয়া চলে এইসব। মা আর বোনেরা পালা করে এসে থাকেন। ইতিমধ্যে তাঁর মা হেমন্তশশী অসুস্থ হয়ে পড়েন। ততদিনে জমে গেছে অনেক গানের সঞ্চয়। সেগুলি নিয়ে 'কয়েকটি গান' নামে একটি সংকলন ছেপে বার করলেন। মা তখন রোগে সংজ্ঞাহীন, মৃত্যুর আগমনী বেজেছে। বিনয়েন্দ্রনাথের স্মৃতিকথা থেকে শোনা যাক সেই বিবরণ। অতুলপ্রসাদের মাতৃভক্তির প্রত্যক্ষদর্শী অরুণপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উক্তি উদ্ধৃত করে বলেছেন :

> অরুণপ্রকাশের কাছ থেকে একটি কথা শুনেছিলাম। তিনি বলেছিলেন, অতুলপ্রসাদের মার মৃত্যুর কয়েকদিন পূর্বে যখন মা অজ্ঞান অবস্থায় পড়েছিলেন তখন তাকে ঘরে ডেকে অতুলপ্রসাদ বললেন, 'মা এখন সংজ্ঞাহীন—আমার 'কয়েকটি গান' মুদ্রিত হয়ে এইমাত্র এল—তোমাকে সামনে রেখে আমি আমার বইখানি মার পাদপদ্মে নিবেদন করতে চাই' এই বলে অতুলপ্রসাদ মার পায়ের উপরে পড়ে শিশুর মতো কাঁদতে লাগলেন।

এই ঘটনার দু-এক দিনের মধ্যে ১২ মে ১৯২৫ হেমন্তশশী দেহত্যাগ করেন। এর পরে রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে কদিন শান্তিনিকেতন ঘুরে এলেন অতুলপ্রসাদ। মেতে উঠলেন লক্ষ্ণৌ নিখিল ভারত সংগীত সম্মেলনের কাজে। মার শেষ ইচ্ছাটিকে রূপ দিতে তিনি ১৯২৬ সালে নিজের বাড়ি বানালেন। নাম হল 'হেমন্ত নিবাস'। অচিরে শূন্য ঘরে সুন্দর রূপে এসে গেলেন হেমকুসুম। কিছুদিন আগে দেরাদুনে পা ভেঙে গিয়েছিল তাঁর। তাই হুইল চেয়ারে করে ঘুরতেন ঘরে বারান্দায়। একদিন হুইল চেয়ারে করে ঢুকলেন সামনের ঘরে। সেখানে ছিল হেমন্তশশীর একখানি তৈলচিত্র। সেটি দেখেই উত্তেজিত হেমকুসুম বলে উঠলেন, **'She is still here to guard my house?'** অনেক চেঁচামেচিতেও অতুলপ্রসাদ থাকলেন অনড়। রাজি হলেন না ছবি সরাতে। সেই শেষ। হেমকুসুম ফিরে

গেলেন। ভাগ্যতাড়িত একজন মানুষের প্রাণপণ সুন্দরভাবে বেঁচে থাকার ইচ্ছা একদিকে আর জেদী কর্তৃত্বপ্রবণ একজন অস্বাভাবিক নারীর আত্মসম্মানবোধ আরেক দিকে। মাঝখানে ব্যবধান তৈরি করল একটি স্নেহপ্রবণ অথচ অসহায় ভাগ্যহত নারীর আলেখ্য।

## ৩

অতুলপ্রসাদের গানের সংখ্যা গোনাগুনতি মাত্রই দুশো সাতটি। এখন তার মধ্যে পঞ্চাশ-ষাটখানি গানও গাওয়া হয় কিনা সন্দেহ। ব্রাহ্মসমাজ থেকে নীহারবিন্দু সেনের সম্পাদনায় অতুলপ্রসাদের গানের স্বরলিপি গ্রন্থ 'কাকলি' ( মোট ৬ খণ্ড, প্রতি খণ্ডে ২০ খানি গান) বাজারে পাওয়া যায়। অর্থাৎ তাঁর সাতাশিটি গানের সুরের হদিশ নেই। যে একশো কুড়িটি গানের স্বরলিপি পাওয়া যায় তার মধ্যে মোটামুটি শিল্পীদের কণ্ঠে শোনা যায় পনেরো-কুড়িখানি গান ঘুরে ফিরে। এই প্রচারনিঃস্বতার জন্য অনেকে খেয়াল করেন না যে অতুলপ্রসাদের বেশিরভাগ গানের বাণী বেশ দুর্বল এবং সুরের বিন্যাসে রয়েছে কিছুটা একঘেঁয়েমি। এর কারণও তাঁর জীবনঘটনাকে আলাদাভাবে পর্যবেক্ষণ করলে বোঝা যায়। প্রথমেই দেখা যায়, ১৮৭১ সালে তাঁর জন্ম থেকে ১৮৮৪ সালে পিতার মৃত্যু পর্যন্ত তেরো বছর খুব উল্লেখযোগ্য গানের পরিবেশ তিনি পাননি। কেবল ঢাকার ব্রাহ্মসমাজে সাধারণ পর্যায়ের উপাসনার গান শুনতেন। ঠাকুরবাড়ির মতো সাংগীতিক আবহ, যদুভট্ট-বিষ্ণু-শ্রীকণ্ঠ সিংহের গান—যা উদ্বোধিত করেছিল রবীন্দ্রনাথকে, তেমন কিছু পাননি অতুলপ্রসাদ। পাননি দ্বিজেন্দ্রলালের মতো পিতা সংগীতগুণী কার্তিকেয়-চন্দ্রের সান্নিধ্য। কোনো জ্যোতিদাদা তাঁকে কৈশোরে গান রচনায় উদ্বুদ্ধ করেননি। বরং তেরো বছরে পিতৃহীন হবার পর মাতামহ কালীনারায়ণের বাড়িতে স্থিত হয়ে তিনি কিছুটা গানের আবহাওয়া পেয়ে যান। সাধু কালীনারায়ণের রচিত ভাবসংগীতগুলি ছিল বাউল অঙ্গের। ঢাকার তাঁতি বাজারে সে সময়ে মাঝে মাঝে নাটক হতো। তার গান শুনতে পেতেন। তবে সে তো উচ্চস্তরের কোনো আদর্শ গান নয়, যার থেকে অতুলপ্রসাদ তাঁর নিজ গানের রূপবন্ধ বা ধরন তৈরি করবেন ভবিষ্যতে। মাতামহের বাড়িতে বসবাসের সময় চন্দ্রনাথ রায় নামে একজন ঢাকায় সখের বাউল দল গড়েছিলেন। 'তাঁরা বাউল সেজে সকলে রাত্রিবেলায় বাড়ি বাড়ি ঘুরে বাউল গান গেয়ে শোনাতেন।' এছাড়া ঢাকায় গোবিন্দ কীর্তনীয়া সুন্দর কীর্তন গাইতেন। আর মাঝে মাঝে গ্রামের বাড়িতে যাতায়াতের সুবাদে শুনতে

পেতেন মাঝিমাল্লাদের মুর্শিদ্যা বা ভাটিয়ালী। এই ছিল তাঁর গড়ে-ওঠার কালে গানের সর্বমোট অভিজ্ঞতা ও সঞ্চয়। ব্রাহ্মসমাজের যে-শুদ্ধ সংসর্গে তিনি মানুষ হয়ে ওঠেন সেখানে খেয়াল-ঠুংরির উচ্ছ্বাসচপলতা খুব মর্যাদা পেতো এমন ভাবার কারণ নেই। কাজেই অতুলপ্রসাদের গানে ভবিষ্যতে যেটুকু বাঙালী উপাদান পাওয়া যায় তার মূলে ঐ বাউল-কীর্তনের কৈশোর সঙ্গ নিঃসন্দেহে কাজ করেছে। তাঁর বহু গানের রূপবন্ধ স্পষ্টতই বাউল অঙ্গের। তাঁর গানের মধ্যে মাটি-জল-আকাশ-বৃক্ষ-ফুল-পাখি-জমির বহুল চিত্রকল্প এসে গেছে সরাসরি বাংলার বাউল গানের আবহমান ধারাস্রোত থেকে। গানের মাঝে মাঝে 'ভোলা' 'খ্যাপা' 'পাগলা' 'কালা' 'রাতকানা' এইসব আত্মসম্বোধনও বাউল গানের অনুসারী। এক শব্দ একাধিক অর্থে প্রয়োগের ধরন বাউল-দেহতত্ত্বের গানের স্মৃতি জাগায়। যেমন—

১. আমি সেই পথে যাব সাথে—
যে পথে বন্ধু গেছে বন্ধুর সাথে বন্ধুর পথে।

২. করি তুই আপন আপন
হারালি যা ছিল আপন,
এবার তোর ভরা আপণ
বিলিয়ে দে তুই যারে তারে।

৩. কেন তবে দাও না ধরা
কেন খোঁজাও সারা ধরা।

সারাজীবনের গানের বাণী রচনায় অতুলপ্রসাদ শিশুর মতো মুগ্ধ ও তুষ্ট থাকতেন এমনতর শব্দ প্রয়োগে, যা গীতিকার রূপে তাঁর দুর্বলতার স্মারক হয়ে রয়েছে। এমনই এক অনপনেয় দুর্বলতা তাঁর গানে চিহ্নিত হয়ে আছে অনুপ্রাস ও রূপক অলংকার প্রয়োগের অতিরেকে। অনুপ্রাসের টানে তিনি লিখে ফেলেছেন,

সে আনন্দ ওরে অন্ধ বন্ধ-মনের-সিন্দুকে।

জীবনের রূপকে গাঁথা তাঁর শব্দাবলী বিশেষ লক্ষণীয়,

জীবন মূলে, জীবন-তরী, জীবন-পথে, জীবন-জমিন, জীবন-পাষাণ, জীবন-রবি, জীবন-হাটে, জীবন-জলধি, জীবন-ডালা, জীবন-বন্দর, জীবন-বাসর, জীবন-নদী

অতুলপ্রসাদের গানের অন্তঃশরীর বিশ্লেষণ করলে এমনতর আরও অনেক বাণীগত দুর্বলতা চোখে পড়বে। এখন সেই প্রয়াসে ক্ষান্তি দিয়ে বরং তথ্য হিসাবে জেনে নেওয়া যেতে পারে তাঁর মোট গানের মধ্যে কীর্তনভঙ্গিম গানের সংখ্যা ১৫,

বাউল অঙ্গের গান ১৭, প্রসাদী সুরের গান ২ এবং বাউল-কীর্তনের সমন্বিত সুরে গান ৩। আগে উল্লেখ করেছি তাঁর ৮৭টি গানের সুর তালের কোনো হদিশ মেলেনি। তবে সন্তোষ সেনগুপ্ত অতুলপ্রসাদের ১২খানি গানে সুর দিয়ে প্রচার করেছেন।*

এ সম্পর্কে সন্তোষ সেনগুপ্তের বক্তব্য (দ্র. 'আমার সঙ্গীত ও আনুষঙ্গিক জীবন' পৃ ৪৭-৪৮) এখানে উদ্ধারযোগ্য। তিনি মনে করেছেন :

> অতুলপ্রসাদের যে-সব গানের কোনো প্রামাণ্য সুর পাওয়া যায়নি—যে-সব গান শুধুমাত্র বইয়ের পাতায় মুদ্রিত হয়েই শেষ হয়ে গিয়েছে—তাতে যদি নবতর সুর সংযোজনা করে পুনর্জীবিত করা যায় এবং তা যদি রসোত্তীর্ণ হয়—যদি তাতে অতুলপ্রসাদের গানের বৈশিষ্ট্য বজায় থাকে এবং সংগীত রসিক সমাজ তা যদি গ্রহণ করে—তাতে আপত্তি করবার হয়ত কিছু নেই একমাত্র গোঁড়ামি ছাড়া। বিচারের ভার ভবিষ্যতের হাতে ছেড়ে দেওয়াই যুক্তিযুক্ত।...
>
> আমি প্রায় ২০।২৫ বছর আগে অতুলপ্রসাদের কয়েকটি গানে সুরারোপ করেছিলাম—সেই সব গানই অতুলপ্রসাদের সুর হিসেবে সর্বজনগ্রাহ্য হয়েছে, রেকর্ডে ও রেডিওতে গাওয়া হয়ে আসছে।

তাঁর সুরারোপিত বারোখানি গানের তালিকা আগেই পেশ করেছি। এবারে উদ্ধৃত করছি এমনই একটি গান সম্পর্কে সন্তোষ সেনগুপ্তের চমকপ্রদ টিপ্পনী। লিখেছেন :

> 'আমায় ক্ষমা করিয়ো যদি' শ্রীরাজ্যেশ্বর মিত্রের পরিচালনায় শ্রীসুশীল চট্টোপাধ্যায় কয়েক বৎসর আগে HMV-তে রেকর্ড করেছেন। রাজ্যেশ্বর মিত্র অতুলপ্রসাদের গান সম্পর্কে বিশেষ অবহিত। তিনি বলেছেন এই গানটি অতুলপ্রসাদের সুরারোপিত বলেই তিনি জানেন। আমি মনে করি এইটেই আমার সুরের স্বীকৃতি।

অতুলপ্রসাদের গান সম্পর্কে যে-বিচিত্র অর্ধমনোযোগের বৃত্তান্ত উপরের টিপ্পনীতে প্রকট হয়ে উঠেছে তার থেকে বোঝা যাচ্ছে বাংলায় তাঁর গান প্রচারে ও গায়নে একধরনের শিথিলতা আছে। বস্তুত ১৯০২ থেকে ১৯৩৪ সালের মধ্যে লক্ষ্ণৌ

* গানগুলি : ১. আমি বাঁধিনু তোমার তীরে ২. তুমি কবে আসিবে মোর আঙিনায় ৩. হে পান্থ বারেক ফিরে চাও ৪ আমায় ক্ষমা করিও ৫. করুণ সুরে ও কি গান ৬. তোমার নয়নপাতে ৭. শুধু একটি কথা কহিলে ৮. মোর আজি গাঁথা হল না মালা ৯. বঁধু ক্ষণিকের দেখা ১০. ফিরায়ে দিয়াছ বারে ১১. মম মনের বিজনে ১২. আমি বসে আছি তব দ্বারে।

বসবাস কালে অতুলপ্রসাদের গানের স্ফুরণ ঘটে। সে সব গান তিনি নিজেই গাইতেন। তাঁর গানের অন্যান্য ভাণ্ডারীদের মধ্যে ছিলেন মামাতো বোন সাহানা দেবী, মাসী সুবালা আচার্য, বন্ধু দিলীপকুমার রায় এবং অনেক পরে লক্ষ্ণৌবাসী অনুজপ্রতিম পাহাড়ী সান্যাল। ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যাবে ১৯২২-২৩ সাল বরাবর কলকাতা থেকে প্রথম অতুলপ্রসাদের গানের রেকর্ড বেরোয় সাহানা দেবী ও হরেন চট্টোপাধ্যায়ের কণ্ঠে। সাহানা দেবী তাঁর গানের একটি মাত্র রেকর্ড করে পণ্ডিচেরী চলে যান। কিন্তু হরেন চট্টোপাধ্যায় অনেকগুলি গান রেকর্ড করেন। সেসব গান তিনি শেখেন বন্ধু দিলীপকুমারের কাছে। তাছাড়া অতুলপ্রসাদ যখনই কলকাতা আসতেন তখনই হরেন চট্টোপাধ্যায়কে ডেকে পাঠিয়ে নিজের গান শিখিয়ে দিতেন। সেই সদ্য-শেখা গান হরেন চট্টোপাধ্যায় রেকর্ড করতেন। তাঁর কণ্ঠে অতুলপ্রসাদের অনেক গান রেকর্ডে জনপ্রিয় হয়েছে সেকালে। পরে ঢাকায় আরেক সুকণ্ঠী মামাতো বোনকে অতুলপ্রসাদ আবিষ্কার করেন এবং তাঁকে কলকাতায় এনে নিজের ট্রেনিংয়ে রেকর্ড করান। পরবর্তীকালে তিনিই হয়ে ওঠেন যশস্বিনী রেণুকা দাশগুপ্ত, যাঁর কণ্ঠে অতুলপ্রসাদের গান সবচেয়ে সার্থকভাবে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে।

কিন্তু আশ্চর্য যে, অতুলপ্রসাদের গানের স্বরলিপি 'কাকলি' (প্রথম খণ্ড ১৩৩৬, দ্বিতীয় খণ্ড ১৩৩৭) যখন প্রথম বেরোয় সাহানা দেবীর সম্পাদনায় (নেপথ্যে ছিলেন দিলীপকুমার) তখন হরেন চট্টোপাধ্যায় ও রেণুকা দাশগুপ্তের রেকর্ডে গাওয়া গানের নির্ভরযোগ্য সুর ও গায়কী অনেকটাই পালটে দেওয়া হয়। সেই সুরই অদ্যাবধি চলে আসছে। 'কাকলি' দুই খণ্ডে ৭১ খানি গান আছে। তার স্বরলিপি প্রসঙ্গে অতুলপ্রসাদ নিজে ভূমিকায় লিখেছেন :

> আমি নিজে স্বরলিপি জানি না ; তাই আমার ভাই মণ্টু (অর্থাৎ শ্রীমান দিলীপকুমার রায়) স্বরলিপি ছাপাবার ও আমার বোন ঝুনু (অর্থাৎ শ্রীমতী সাহানা দেবী) আমার গানের স্বরলিপি করে দেবার ভার নিয়েছেন। তাঁদের আগ্রহ ও সহায়তা না পেলে আমার গানগুলি মূক হয়েই থাকত, 'কাকলি' শ্রবণগোচর হত না।

নিজের গান নিজে স্বরলিপি করতে না পারার ফলে অতুলপ্রসাদের গানের অনেকটা স্বাদ ও নিজস্বতা যে আজ আর নেই সেকথা ঐতিহাসিক সত্য। তাঁর গান পরবর্তীকালে দিলীপকুমারের সূত্রে মঞ্জু গুপ্তের কণ্ঠে প্রচারিত ও রেকর্ড হয়েছে। সরলা দেবীচৌধুরাণী, ইন্দিরা দেবীচৌধুরাণী, বিষ্ণুপুরের সুরেন্দ্রনাথ

বন্দ্যোপাধ্যায়, হিমাংশু দত্ত সুরসাগর, রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও হরিপদ রায় তাঁর গানের যেসব স্বরলিপি প্রণয়ন নানা সময়ে করে গেছেন তার কতগুলি যে আজ আমাদের ব্যবহার্য তা বলা কঠিন। তাঁর দুর্ভাগ্যময় জীবনের সঙ্গে গান সম্প্রচার ও গায়নবিভ্রাটেরও একটা সংযোগ রয়েছে বলে মনে হয়। তবে সবচেয়ে পরিতাপের বিষয় হলো অতুলপ্রসাদের গানের বিভিন্ন তথ্য ও বিবরণ সম্পর্কে সর্বসাধারণের ব্যাপক অজ্ঞতা। এবারে তেমন এক দিক দেখা যাক।

খুব সহজভাবে ভাবলেই বোঝা যায়, অতুলপ্রসাদের গানে তিনটি মূল বিচার্য বিষয়। এক, তাঁর গানের সংখ্যা ও ভাবরূপের বৈচিত্র্য বড়ই কম ; দুই, তাঁর গানের প্রচার খুব ব্যাপকভাবে হয়নি ; তিন, তাঁর গানের উচ্চারণে যতখানি আত্মবেদনা আছে ততটা নৈরাত্ম্যদৃষ্টি তথা আধুনিকমনস্কতা নেই। এই সব কটি বিচার্য বিষয়ের স্বচ্ছ সমাধান মিলবে অতুলপ্রসাদের জীবনের সঙ্গে গান রচনার ব্যাপারটি মিলিয়ে দেখলে। এবারে সেদিকে দৃষ্টি ফেরাই।

১৮৯০ সালে অতুলপ্রসাদের মা পুনর্বিবাহ করেন ( তখন অতুলপ্রসাদের বয়স উনিশ )। ১৮৯২ সালে অতুলপ্রসাদকে বিলাত পাঠানো হয়। ১৮৯৫ সালে দেশে ফিরে ১৯০০ সালে আবার স্কটল্যাণ্ডে গিয়ে বিবাহ ও বসবাসের মধ্যে মোট পাঁচ বছর তিনি কলকাতায় ছিলেন। সে সময়ে তাঁর জীবনে গানের কোনো অবকাশ ছিল না, কারণ একদিকে চলছিল কলকাতা হাইকোর্টে আত্মপ্রতিষ্ঠার কঠিন সংগ্রাম আরেকদিকে হেমকুসুমকে বিবাহপ্রস্তাবের দরুন মতান্তরের পারিবারিক সংঘাত। অবশ্য এই সময়েই তিনি কলকাতার এলিটিস্টদের খাম-খেয়ালি সভার গানে মজলিসে গৃহীত হয়েছেন সমাদরে। কিন্তু সেই সমাবেশের মধ্যমণি ছিলেন রবীন্দ্রনাথ এবং হাসির গানের রাজা দ্বিজেন্দ্রলাল ছিলেন একজন পার্ষদ। অতুলপ্রসাদের উপস্থিতিই সেখানকার মস্তবড় স্বীকৃতি, গান গাওয়া তো দুর্লভতম উচ্চাশা। শেষ পর্যন্ত অবশ্য ১৯০০ সালে তিনি কলকাতা ত্যাগ করে স্কটল্যাণ্ডে গিয়ে হেমকুসুমকে বিবাহ করলেন কিন্তু তাই বলে জীবন খুব একটা সুসহ বা স্বচ্ছন্দ হলো না। ১৯০০ থেকে ১৯০২ সালের দুটি বছর বিদেশে স্বজন-পরিত্যক্ত অসহায় সেই দম্পতি, যাঁদের অসম বিবাহ আত্মীয় বন্ধুদের নৈতিক সমর্থন পায়নি, বড় মর্মান্তিক টেনশ্যনে কাটান। তাঁদের জীবনে আসে যমজ সন্তান

* অতুলপ্রসাদের গানের আরও অনেকে স্বরলিপি করেছেন। তার কিছু মুদ্রিত, কিছু বিনষ্ট। সম্পূর্ণ বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য, 'অতুলপ্রসাদ সেন,' ব্রজেন্দ্রনাথ মিত্র, সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা ১২৫, পৃষ্ঠা ২৯

দিলীপ ও নিলীপ। কিন্তু অচিকিৎসায়, দারিদ্র্যে, বিদেশের প্রবল শৈত্যে নিলীপের মৃত্যু ঘটে। এ সবের মধ্যে গানের বিনোদন ঘটতে পারে কি?

অবশেষে ১৯০২ সালে লক্ষ্ণৌ শহরে এসে আইনব্যবসায়ে ক্রমে ক্রমে স্থিতি ও সফলতা লাভের মধ্যে দিয়ে তাঁর গানের জীবনও যেন সবেগে জেগে ওঠে। ১৯০২ থেকে ১৯৩৪ জীবনের এই শেষ বত্রিশ বছর অতুলপ্রসাদের গান রচনার জীবন। সে-গানের বিষয় যেমন জীবনকে ছুঁয়েই গড়ে উঠেছে তেমনই সে-গানের মৌল কাঠামো গড়ে উঠেছে লক্ষ্ণৌ অঞ্চলের ঠুংরি আর নানা বর্গের দেশীয় গীতরীতির (সাওয়ন, হোরী, কাজরী, চৈতী, লাউনি) আওতায়। জীবনের নিঃসঙ্গতার যন্ত্রণা, পত্নীবিরহ এবং পরিণামে ঈশ্বরনির্ভরতা—এই হলো তাঁর গানের মূল প্রসঙ্গ। খুব সাদামাটাভাবে তাঁর গানের প্রসঙ্গ মোট দু'রকম। তার একটা ভাব হলো:

তোমারে পাইলে সরস সংসার
বিরস তোমা বিহনে।

আর একটা ভাব:

দৈন্য আমার ঘুচবে
যবে পাবো দীনবন্ধুকে।

এর মাঝখানে রয়ে গেছে একধরনের প্রত্যাশার ধূসর অনুভূতি, যেখানে তাঁর উচ্চারণ:

তুমি নিজ হাতে ভরি দিবে
তাই রিক্ত হৃদয় বহি গো।

এই ত্রিধাবিভক্ত ভাবতরঙ্গের মধ্যে অতুলপ্রসাদের গানের অন্তর পৌনপুনিক চংক্রমণ। তাঁর ও হেমকুসুমের মধ্যে বিচিত্র সম্পর্ক এবং ব্যবহারের স্ববিরোধ গানকে করে তুলেছে করুণমধুর কিন্তু গীতিবিষয়ের একঘেঁয়েমিও এসে গেছে। এই একঘেঁয়েমি হয়তো কাটতে পারতো গানের নানাজাতীয় আঙ্গিক বৈচিত্র্যে কিন্তু অতুলপ্রসাদ ঠুংরি ছাড়া অন্য কোনো রূপবন্ধে সিদ্ধ ছিলেন না। ধ্রুপদ ছিল তাঁর স্বভাববিরোধী, খেয়ালে তাঁর রুচি ছিল না অথচ ঠুংরিতেও সুরবিস্তার বা সুরমিশ্রণের সুযোগ নেননি। আঙ্গিকের এই সীমাবদ্ধ ব্যবহার তাঁর গানের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা। নাটকের গান রচনা কিংবা দেশিবিদেশি সুরের মিশ্রণজনিত নবীনতাও তাঁর গানে নেই, যা রবীন্দ্রসংগীত ও দ্বিজেন্দ্রগীতির সবচেয়ে বৈচিত্র্য-সঞ্চারী নবীনতার মূল কারক। গূঢ় বিবেচনায় তাই মনে হয় অতুলপ্রসাদের

গানের নিজস্ব ঢং বলে বোধহয় কিছু নেই, কেননা তাঁর গানে সম্পূর্ণ বিরোধী দুটি ধরন সহাবস্থান করছে। একদিকে বাংলা বাউল-কীর্তনের রীতি, আরেকদিকে লক্ষ্ণৌর লচা ঠুংরির রীতি। এই দুই রীতিকে তিনি সুচারুভাবে মেশাতে প্রয়াসী হননি বা মিশিয়ে তার থেকে তৃতীয় কোনো নিজস্ব গীতরীতির উদ্‌ভাবন করতে পারেননি। এই অপারগতার কারণ ততটা প্রতিভার অভাবজনিত নয়, যতটা সুস্থিত নিরীক্ষাপ্রবণ জীবনেরই শূন্যতাজনিত। তাঁর গানের অত্যাশ্চর্য সংখ্যাল্পতার কারণও সম্ভবত এইটাই। এই প্রসঙ্গে তাঁর ক্রিয়াপর জীবনের আর একটি দিক লক্ষণীয়। রবীন্দ্রনাথ বা দ্বিজেন্দ্রলালের মতো তাঁর কোনোরকম নাট্যরচনার অভিজ্ঞতা ছিল না। এমনকি গানের পাশাপাশি কাব্যচর্চাও করেননি তিনি। এই চর্চার অভাব তাঁর পক্ষে ভাল হয়নি। কারণ কবিতা ও গানের অন্তঃস্বভাবে একটা সমতা যেমন আছে, তেমনই আছে নিগূঢ় স্বাতন্ত্র্য। যাঁরা একসঙ্গে এ দুই রূপবন্ধের চর্চা করেন তাঁদের গানে ভাবের দেওয়া-নেওয়ার এক সূক্ষ্ম লাবণ্য আর বিচিত্রতা ধরা পড়ে। বাণীবিন্যাস ও প্রতিমা রচনায় একধরনের আমগ্নতা ও শিল্পবোধ আভাসিত হয়। একের আলো অন্যের প্রাঙ্গণকে আলোকিত করে। অতুলপ্রসাদের ক্ষেত্রে এমনটি ঘটেনি। কোনোদিন তেমনভাবে কাব্যচর্চা করেননি বলে তাঁর গানে যেমন রয়েছে শব্দচয়নের দুর্বলতা তেমনই ভাবে রয়েছে বহুদিকস্পর্শিতার অভাব। বত্রিশ বছরের সুদীর্ঘ প্রবাসজীবন যতটা তাঁর গীতিসত্তাকে সমৃদ্ধ করেছে ভিন্ন প্রাদেশিক গীতরীতির সাবলীল ব্যবহারসিদ্ধতায় ততটাই রুদ্ধ করে রেখেছে সেই সময়কার বাংলা গানের নবীনতার স্পর্শ থেকে। সমকালীন বাংলা কাব্যান্দোলন এবং বাংলা সাহিত্যের নতুন রূপরীতির কৃৎকৌশলের জগতের অনেকটাই দূরে ছিল তার বসবাস। আশ্চর্য যে, তাঁর দুই সুহৃদ ছিলেন ধূর্জটিপ্রসাদ ও দিলীপকুমারের মতো বহুপাঠী, বিবেচক ও বিতর্কপ্রবণ ব্যক্তি অথচ তাঁরা অতুলপ্রসাদের গানের দুর্বলতার দিকগুলি ধরিয়ে দেননি। যদিও ব্যক্তি ও সুরপাগল অতুলপ্রসাদ সম্পর্কে তাঁদের রচনায় বহু উচ্ছ্বসিত উল্লেখ রয়েছে। এমনই এক বর্ণনা পাই দিলীপ-কুমারের 'স্মৃতিচারণ' বইতে, যেখানে বলা হয়েছে :

> এই সময়ে বাংলাদেশে খাঁটি হিন্দুস্থানী ঢঙের গান অনেক সঙ্গীতোৎসুকের মনকেই একটু একটু করে রসিয়ে তুলছিল। ফলে বাঙালী সঙ্গীত-রসিকরা ঠুংরির রস চাইছিলেন বাংলা গানে, কেননা হিন্দুস্থানি ঠুংরির নানা গানেরই কথা অতি কদর্য—গাওয়া হত—ভুরু কামান, চোখ কাটারি, কোঁকড়া চুল ইত্যাদি (বিখ্যাত ঠুংরিগায়ক শ্রীগিরিজাশঙ্কর

চক্রবর্তী মহাশয় গাইতেন একটি গান—'ননদিনী পান খায়ে মুখ লাগ' )
—এককথায় নিম্নশ্রেণীর শৃঙ্গাররসে ভরা। ভদ্র বাঙালী শ্রোতার আসরে এসব গান গাওয়া অসম্ভব, অথচ ঠুংরির পেলব আদিরসে আপত্তি করবে কে—অরসিক ছাড়া? এইরকম পরিস্থিতিতে হাজির হল অতুলদার নানা ঠুংরিভঙ্গিম গান।...লখনৌয়ে বহু বৎসর থেকে সেখানকার সেরা ঠুংরির রস তাঁর কানের ভিতর দিয়ে মরমে পশেছিল তো, তাই যে-রসে নিজে রসিয়ে উঠেছিলেন অপরকে সে-রসের রসিক করে তুলতে তাঁকে বেগ পেতে হয়নি। কীভাবে লখনৌয়ের ঠুংরি তাকে অনুপ্রাণিত করেছিল একটি দৃষ্টান্ত দিই স্মৃতিচারণী ঢঙেই।

লখনৌয়ে সেবার অচ্ছনবাইয়ের গান শোনার সুযোগ এল এক বাঙালী ভদ্রলোকের বাড়িতে। বাইজির দক্ষিণা অতুলদাই দিয়েছিলেন।... সেদিন সন্ধ্যায় এ-মহিয়সী গায়িকা কী গানই যে গাইলেন সমজদার শ্রোতা পেয়ে! কোনোদিন কি ভুলব তাঁর 'মুকুটধারী কান্‌হ বাজায়ে বাঁশিয়া রে'! সে কত তান, কত মিড়, সুরকে নিয়ে কত আদর, কখনো অশ্রু কখনো আনন্দ। অতুলদার চোখ আবেশে সজল হয়ে এল সাবাশ দিতে দিতে।

পরদিন সন্ধ্যায় অতুলদা আমাকে তাঁর সুরম্য ছাদে ডাকলেন। নিজের গান শোনাতে তিনি সত্যিই লজ্জা পেতেন। বললেন লাজুক সুরে: 'দিলীপ কাল রাতে একটা গান বেঁধেছি। কেমন হয়েছে কে জানে?' ...পরে তাঁর সুকুমার লাজুক ভঙ্গিতে সুমিষ্ট সুরেলা কণ্ঠে গাইলেন:

চাঁদিনী রাতে কে গো আসিলে

অচ্ছনবাইয়ের নানা মর্মস্পর্শী মিড়, কম্পন ও সূক্ষ্ম কারুকাজ এ-গানটির মধ্যে সহজেই অনুপ্রবেশ করেছিল অতুলদার শিল্পীহৃদয়ের আনন্দের সহজ তাগিদে।

এমনতর উল্লেখ, অতুলপ্রসাদের গান গাইবার বিবরণ, অনেকের রচনাতেই পাই। কিন্তু লক্ষ করলে এটাও দেখা যায় যে, দুই আর তিন দশকের কলকাতার আধুনিক কবিসাহিত্যকদের পরিমণ্ডলে অতুলপ্রসাদ ঠিক স্থান করে নিতে পারেননি। সেখানে কাজী নজরুল ইসলামের যেন একচ্ছত্র আধিপত্য। অতুলপ্রসাদের আভিজাত্য, ব্রাহ্মসমাজের সংসর্গ বা বিত্তের খ্যাতি কি তাঁকে নবীন লেখকদের কাছে আড়াল করেছিল নাকি তাঁর লাজুক স্বভাব ও বিনত সৌজন্যবোধ? ১৯২৩

সালে কলকাতা থেকে 'কল্লোল' বেরিয়েছে, ১৯২৬ সালে ঢাকা থেকে 'প্রগতি', ১৯২৭ সালে কলকাতার 'কালিকলম'। এইসব সাহিত্যগোষ্ঠীর সঙ্গে (বুদ্ধদেব-প্রেমেন্দ্র-অচিন্ত্যকুমার যাঁদের প্রধান পুরুষ) তাঁর সংসর্গ ও ঘনিষ্ঠতা হয়নি। রবীন্দ্রনাথের দুর্লভ সঙ্গ পেয়েছিলেন অতুলপ্রসাদ, ভালবাসতেন তাঁর গান, কিন্তু সে-গানের আধুনিক ধরন, সুরমিশ্রণের মৌলিকতা ও বাণীর দ্যোতনা তিনি সঠিক অনুধাবন করতে পারেননি। রবীন্দ্রনাথও অতুলপ্রসাদের সন্তপ্ত জীবনে যতখানি শুশ্রূষা দিতে চেয়েছিলেন ততটা উৎসাহ বা মনোযোগ তাঁর গানগুলি সম্পর্কে দেননি মনে হয়। অতুলপ্রসাদ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের যে কবিতাটি আছে তাতে তাঁর সদাব্রত স্বভাব, মৈত্রী ও আতিথ্যের কথার বিশেষ উল্লেখ রয়েছে, আর 'সুরে ভরা সঙ্গ তব' বলতে নিশ্চয়ই অতুলপ্রসাদের গায়ক বিগ্রহের পরিচয় ফুটে উঠেছে। লক্ষণীয় যে, রবীন্দ্রনাথ অতুলপ্রসাদের গান সম্পর্কে কোনো মূল্যনির্ধারণ করেননি।

সেইজন্যই মনে হয়, অতুলপ্রসাদ সব দিক থেকেই বাংলা গানে নিঃসঙ্গ এক ব্যক্তিত্ব। নিঃসঙ্গ পরম্পরার বিচারেও। রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল ও নজরুলের গানের ধরন পরবর্তী বাংলা গানে নানাভাবে অনুবর্তিত হয়েছে। কিন্তু অতুলপ্রসাদের গানের অনুসরণ কোনোভাবেই পরবর্তীরা করেননি। তাঁর গানে যে হোলি-ফাগ-ঝুলা-রঙ আর আবীরের অনুষঙ্গ, বাদল ঝুমঝুম বোল আর চাঁদিনী রাতের রঙিন আবেশ, মাঝে মাঝে যে তাতে লেগে যায় 'হরি আবন কি আওয়াজ' এ সবই বেশ উপভোগ্য এবং উত্তরভারতীয় গানের সংরাগে উচ্ছল। কিন্তু নানা কারণে তাঁর গান আমাদের হৃদয়কে ছুঁয়ে গেলেও আমাদের সৃষ্টিচেতনাকে জাগাতে পারেনি।

বিবাহিত জীবনের নিত্যনব দ্বন্দ্ব ও দোলাচলে যেমন তাঁর গানের জীবনে বারে বারে অন্‌সুর লেগে গেছে তেমনই তাঁদের একমাত্র সন্তান দিলীপকুমার সেন তেমনভাবে বিকশিত হতে পারেননি। জীবন ও জীবিকার দ্বিমুখী জগতে তিনি অস্থির ছিলেন বরাবর। দুঃখে ক্ষোভে মর্মজ্বালাপীড়িত তাঁর সন্তান দিলীপ একদিন এক আত্মজনের কাছে বলেছিলেন: 'Such parents cannot expect better son'। কথাটি হয়তো ঠিক কিন্তু এ কথাও সত্য যে অতুলপ্রসাদের আসল সন্ততি তো তাঁর গানগুলি। জটিল, স্ববিরোধী, অন্তর্জ্বালাময় সেইসব গানে অতুলপ্রসাদের নির্ভুল জীবনচিহ্ন সনাক্ত করা যায়। তাঁর গান যেন তাঁর উৎক্ষিপ্ত উদ্‌ভ্রান্ত আত্মজীবনেরই এক-একটি বর্ণবহুল উদ্ভাসের মতো জেগে থাকে।



# স্ববিরোধের শিল্প : আধুনিক বাংলা গান

তথাকথিত আধুনিক গানের যাঁরা রচয়িতা, সুরকার, গায়ক-গায়িকা, তাঁরা আমাদের প্রায় সব আশা ভরসার বাইরে।

ইদানীং স্থূল বাণিজ্যপ্রয়াসী গ্রামোফোন কোম্পানির ষড়যন্ত্রে আধুনিক বাংলা গান সুরের সরণি থেকে বিচ্যুত হয়ে প্রায়শ বিদেশী রক-অ্যাণ্ড-রোল কিংবা সস্তা পপ্ মিউজিক-এর পর্যায়ে নেমে এসেছে বলে সন্দেহ হয়। সুরে বৈচিত্র্য-সৃষ্টির নামে প্রায়ই যন্ত্রের তারস্বর কোলাহলে সুরকে ডুবিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে।...আধুনিক গানের কথাংশে ইচ্ছাকৃতভাবে আনা হচ্ছে নিম্নরুচির ভাবের ব্যঞ্জনা। কদর্য যৌনাত্মক ইঙ্গিতে ও সংকেতে গানগুলিকে বানিয়ে তোলা হচ্ছে সমাজে অপসংস্কৃতি ছড়াবার এক প্রধান বাহক।

খোলামন নিয়ে বিচার করে দেখুন, আধুনিক কাব্যসঙ্গীতের প্রতি নিরতিশয় অবজ্ঞা ও ঔদাসীন্য ছাড়া আমরা আর কোনো মনোভাব প্রদর্শন করিনি। একথা আমরা একবারও ভাবিনি যে, সঙ্গীত-জগতে যখন একটা শূন্যতা বিরাজ করছে তখন তাকে সুষ্ঠুসম্ভারে পূর্ণ করা প্রয়োজন।...পরের যুগ যেন আমাদের সম্পর্কে এ অভিযোগ তুলতে না পারে যে, বিদগ্ধসমাজের নিষ্ক্রিয়তায় এ যুগের সঙ্গীতে উল্লেখযোগ্য কোনও পরিবর্তন বা উন্নতি ঘটেনি।

আধুনিক বাংলা গান সম্পর্কে উপরে উদ্ধৃত তিনটি মন্তব্য আমি সংগ্রহ করেছি তিন প্রবীণ সংগীত-সমালোচকের বই থেকে। তিনজন সমালোচকই সংগীতের তত্ত্ব, ভারতীয় গান এবং বাংলা গান বিষয়ে দীর্ঘকাল চিন্তাভাবনা ও লেখালেখি করছেন। কাজেই তাঁদের ধারণা বা সিদ্ধান্ত সম্পর্কে কোনোরকম লঘু বা পাশ-কাটানো মনোভাব আমরা নিতে পারি না। কিন্তু তিনটি মন্তব্যের মধ্যে নিশ্চয়ই লক্ষ করতে পারি এক মৌলিক স্ববিরোধের স্তর। লক্ষ করা যায়, প্রথম দুজনের মন্তব্যে আধুনিক বাংলা গানের ব্যাপারে যতখানি হতাশা ও অনুদারতা রয়েছে তৃতীয়জন সে-অনুপাতে অনেকটাই সহৃদয় ও অনুকম্পায়ী। আধুনিক বাংলা গানের সৃজন ও শিল্পময়তার মূলে আসলে অন্যতর কিছু কিছু সমস্যা রয়েছে। তার জন্য চাই অন্য দৃষ্টিকোণ।

সেই দৃষ্টিকোণে পৌঁছোবার আগে আধুনিক বাংলা গান কথাটার একটু ইতিহাস জেনে নেওয়া দরকার। অনেকে ভাবেন, রবীন্দ্রপরবর্তী একদল আধুনিক-মনস্ক কবিদের নতুন ধরনের কবিতাকে যেমন সনাতনবাদীরা 'আধুনিক কবিতা' বলে কটাক্ষ করতেন, আধুনিক গানও বুঝি সেইরকম বাঁকা মনের তৈরি-করা

সংজ্ঞা। কিন্তু তথ্য ঘাঁটলে দেখা যাবে ১৯২৭ সালে কলকাতা বেতারকেন্দ্র চালু হবার পর যেসব নতুন-তৈরি বাংলা গান সেখানে পরিবেশিত হতো তার নাম ছিল 'ভাবগীতি' ও 'কাব্যগীতি'। অনেক পরে ঢাকায় যখন বেতারকেন্দ্র স্থাপিত হলো তখন সেখান থেকে 'আধুনিক বাংলা গান' কথাটা প্রথম চালানো হয়। সেইটাই শেষপর্যন্ত সবাই মেনে নিয়েছেন। কিন্তু স্ববিরোধ এইখানে যে, অনেক শিক্ষিত মানুষও মনে করেন রবীন্দ্রনাথ-দ্বিজেন্দ্রলাল-রজনীকান্ত-অতুলপ্রসাদ এবং নজরুলের গান ঠিক যেন এইজাতীয় আধুনিক গান নয়। স্পষ্টত তাঁরা মনে করেন নজরুল-পরবর্তী বাংলা গানই আধুনিক গান।

গোড়া থেকেই এই যে একটা গোলমাল হয়ে রইলো তার মূলে রয়েছে আমাদের সংগীতবোধের অভাব। আধুনিকতায় কালের লক্ষণ যতটা থাকে মনের ধরন তার চেয়ে বেশি ফোটে তাতে। প্রাচীন বাংলা গানের সঙ্গে আধুনিক গানের স্বভাবগত তফাত এইখানে যে আধুনিক গান ব্যক্তিগত অনুভূতিকে নিজের মতো করে প্রকাশ করতে চায় সংগীতকারের নিজের বাণী ও সুরসৃজনে। যেমন-তেমন এক নির্দিষ্ট রাগ-রাগিণীর যথাবিহিত ছাঁচে গানের ভাব ঢালাই করা আধুনিকতার ধর্ম নয়। মল্লারেই বর্ষা সংগীত বাঁধতে হবে এমন অলঙ্ঘ্য অনুশাসন আধুনিক মন মানেনি বলেই রবীন্দ্রনাথ এমন কি বাহার রাগিণীতে বর্ষার গান বেঁধেছেন এবং তা সকল আধুনিক মনকে নাড়া দিয়েছে। এই দিক থেকে ভেবে দেখলে বোঝা যায় উনিশ শতকের মাত্র চারজন সংগীতকার—রাধামোহন সেন, নিধুবাবু, কালী মির্জা ও শ্রীধর কথক—তাঁদের কালের প্রচলিত বিধিবদ্ধ ছককে ততটা মানেননি। সেই জন্যই তাঁদের গানকে আধুনিকতার অগ্রদূত বললে ভুল হয় না। অর্থাৎ তাঁরা গান রচনার ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত অনুভূতিকে প্রধান বিবেচ্য মনে করেছিলেন বলেই রূপবন্ধকে ভেঙেছিলেন, গানের ভুবনে সেইটাই নবসৃষ্টি—সেইটাই আধুনিকতা। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখলে 'রবীন্দ্রসংগীত', 'দ্বিজেন্দ্রগীতি', 'কান্তগীতি,' 'অতুল-প্রসাদের গান' বা 'নজরুলগীতি', এ সবেরই সংজ্ঞাগত ভ্রান্তি ও সীমাবদ্ধতা চোখে পড়ে। এই সব মার্কা থেকে তাঁদের গানের নিজস্ব ধরনটা বোঝা মুশকিল। বড়জোর স্বীকার করা যায় এই গীতরীতিগুলির মধ্যে 'রবীন্দ্রসংগীত' একমাত্র কোনো স্পষ্ট বন্দেশের দাবি রাখতে পারে। কেননা একমাত্র রবীন্দ্রসংগীতেই বাণী ও সুরের শোভন মাত্রাগত বিন্যাস আছে এবং সে গানের গায়নরীতি সুনির্দিষ্ট। দ্বিজেন্দ্রগীতি, কান্তগীতি, নজরুলগীতি ও অতুলপ্রসাদের গানের গায়নে বহুস স্বাধীনতার অবকাশ আছে, বাণী ও সুরের সমঞ্জসতা নেই অনেকটাই। কিন্তু এঁদের

সকলের গানই নিঃসন্দেহে আধুনিক গান। সেই আধুনিকতার লক্ষণ বোঝা যায়, গানের মর্মার্থে ও ব্যঞ্জনার মৌলিকতায়, আত্মভাষণে ও স্বতন্ত্র বোধে এবং সবচেয়ে প্রবলভাবে বোঝা যায় সুরমিশ্রণে, গীতরীতির জোড়কলমে ও তালের নব বিন্যাসে। এঁদের গানের আরেকটি সামান্যলক্ষণ হলো, গান এঁদের এক সার্বিক কীর্তি। এঁরা নিজেরা গান লেখেন, তাতে সুর দেন, আবার নিজেরাই গেয়ে দেখান গানের স্বরূপ। তাই রবীন্দ্রনাথের ভাষাতে অহংকার করে এঁরা সবাই বলতে পারতেন: 'রচনা যে করে রচিত পদার্থের দায়িত্ব একমাত্র তারই...যার যেটি কীর্তি তার সম্পূর্ণ ফলভোগ তার একলারই।'

নজরুল-পরবর্তী বাংলা গান এই অহংকার করতে পারে না। কেন না সেখানে রয়েছে নানা বিভাজন। গান লেখেন একজন, সুর দেন অন্য আরেক ব্যক্তি, এবারে গানটি কণ্ঠে রূপায়ণ করেন আরেকজন। এঁদের তিনজনের রুচি-শিক্ষা-ব্যক্তিত্ব-বোধের মাত্রাগত সমতা তো থাকতে পারে না। সেইসঙ্গে 'অ্যারেঞ্জার' নামে নতুন এক ব্যক্তির ভূমিকা বাংলা গানের রেকর্ডিংয়ে অধুনা অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছে। কেননা এখন আর আগেকার গানের মত 'ছাড়' মিউজিক বাজিয়ে বা গানের সুর অনুসরণ করলে চলে না, বাণিজ্যিক প্রয়োজনে গানের ফাঁকে প্রিলিউড, ইণ্টারলিউড, বিভিন্ন কর্ড-প্রয়োগ পদ্ধতির সাহায্য নেন অ্যারেঞ্জার। আন্তর্জাতিক গানের জগৎ যন্ত্রবাদ্যের উন্নতির ফলে এবং সাউণ্ড সিস্টেমের সর্বাধুনিক কৃৎকৌশলের সাহায্যে এতটাই ধ্বনিময় ও ঝংকৃত হয়ে উঠেছে যে, এদেশের কোনো প্রকৌশলী দক্ষ অ্যারেঞ্জার যদি সেই আধুনিকতার ধরন বাংলা গানে জুড়ে দেন তবে তা কি আধুনিকীকরণ বলে বিবেচিত হবে না? আমাদের সাবেকী মন তা মেনে না নিলেও আধুনিক নবীন শ্রোতাদের কান যে তা চাইছে! তারাই তো সংখ্যাগরিষ্ঠ ক্রেতা।

নামকরা গায়ক ও সুরকার শ্রীদিনেন্দ্র চৌধুরী 'আধুনিক গান: অবক্ষয়ের নেপথ্য' নামে একটি নিবন্ধে (চতুরঙ্গ। এপ্রিল ১৯৮৬) এই প্রসঙ্গে চমৎকার বিশ্লেষণ করে জানিয়েছেন:

> বহু প্রতিভাবান যন্ত্রীর অর্জিত শিক্ষা এবং নৈপুণ্য নিয়োজিত হতে থাকে এক-একটি সার্থক সংগীতের আবহ রচনার কাজে। যুগের দাবি অনুযায়ী যুগের গানকে তাই আধুনিকতার স্পর্শে উজ্জ্বল হয়ে উঠতে হয়েছে। সারা পৃথিবীর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে দেশীয়, প্রদেশীয় সুরের প্রভাব ছাড়াও বিদেশীয় সংগীতের রীতিনীতির সঙ্গে পরিচিতি তাই প্রয়োজনীয় হয়ে

পড়েছে এবং এর সফল প্রয়োগ সম্ভব হয়েছে সর্বাংশে। আধুনিক গানের ক্ষেত্রে এই উদ্যোগ অগ্রগতির পথই প্রসারিত করেছে।

এই-সমস্ত পরিবর্তনের সঙ্গে রুচি-মন-মেজাজকে যাঁরা মিলিয়ে নিতে পেরেছেন, তাঁরাই প্রগতিবাদী। যাঁরা পারেন নি, গণ্ডগোল সেইসব সনাতনপন্থীদের নিয়ে। দেশ বিদেশের অগ্রসরবর্তী সংস্কৃতির সঙ্গে অপরিচিত থাকার কূপমণ্ডুকতা সমর্থনযোগ্য নয়।...সাহিত্য সংগ্রহের মতো সংগীতেও বীটোফেন, মোজার্ট, বাক, চাইকোভস্কি থেকে এলভিস প্রিসলে, প্যাট বুন, পল রোবসন, ন্যাট কিং কোল, কিংবা পিট সীগার, জোয়ান বয়েজ অথবা ডীন মার্টিন, টনি ব্রেনট, নীল ডায়মণ্ড পর্ব শেষ করে বিটল্‌স, বনি এম, ওসি বিসা অতি সাম্প্রতিক চাঞ্চল্য জাগানো মাইকেল জ্যাকসন পর্যন্ত আমাদের সাংস্কৃতিক দৌড় অব্যাহত। কিন্তু আমাদের আধুনিক গানে তার সামান্যতম প্রভাবই আমাদের রক্ষণশীল মনোভাব মেনে নিতে দ্বিধাগ্রস্ত। প্রভাব বলতে, ঠিক অনুকৃতি নয়, পদ্ধতিগত নৈপুণ্য প্রয়োগে আমাদের সংগীত সংগঠিত করা। বিষাদযুক্ত কলাবস্তুতে ওয়াল্‌জ্‌ ধাঁচের ছন্দ, স্কেল-প্রগ্রেসন, কর্ড-প্রগ্রেসন বা কাউণ্টার পয়েণ্টের সুচারু ব্যবহার বা ভায়োলিনের কিংবা স্যাক্‌শের ওবিলিগ্যাটো প্রয়োগে একটা গানের চেহারায় কতটা জৌলুস ফেরাতে পারে, তেমন পারদর্শিতার অজস্র নজির ছড়িয়ে আছে আধুনিক গানে।

তাহলে বোঝা গেল আধুনিক গানে সর্বাধুনিক ধ্বনিব্যবস্থা ও কৃৎকৌশল প্রয়োগ নিতান্ত কালোচিত ও আন্তর্জাতিক। কিন্তু দিনেন্দ্রবাবুর ভাষায় 'সনাতন-পন্থী' বা 'রক্ষণশীল'দের যে সেই অ্যারেঞ্জমেণ্ট ভালো লাগছে না সে কি তাঁদের অনাধুনিকতা না ধ্বনির কান তৈরি হয়নি বলে? এই প্রসঙ্গে উদ্ধার করা চলে একজন সনাতনপন্থী শ্রীঅনন্তকুমার চক্রবর্তীর বক্তব্য তাঁর 'সে অগ্নিতে দীপ্ত গীতে' (১৯৩৬) বই থেকে। তাঁর মনে হয়েছে:

প্রাক-ধনতান্ত্রিক সমাজে শাস্ত্রীয় তথা লোকায়ত শিল্পের যেটা ভিত্তি, আধুনিক পুঁজিতন্ত্র তাকে ক্রমশ ধ্বংস করছে। সম্প্রতি আসছে মার্কিন অনুপ্রবেশ। সেই ধ্বংস আর এই আমদানির কল্যাণে বিরাট লাভজনক ইণ্ডাস্ট্রি গড়ে উঠেছে, উৎপাদন হচ্ছে এক পরিবর্ত শিল্পপণ্যের—জনতার ভোগের উদ্দেশ্যে—সাধারণের জন্যেই তৈরী, সাধারণের দ্বারা নয়।...

> ক্রমশ ঐতিহ্য থেকে যত সরে আসছি বিকারও তত প্রকট হচ্ছে। বলা হচ্ছে জনগণের রুচিই নাকি এমনি। **কিন্তু এই রুচিটাও তো একটা বানিয়ে তোলা পদার্থ,** ব্যবসার প্রয়োজনে সংগঠিত। কই কিছুদিন আগেও তো রুচিটা এমন ছিল না!

এবারে সমস্যাটার কাছাকাছি পৌঁচেছি আমরা। অর্থাৎ আধুনিক গানের সমস্যা মোটামুটি দুরকম—ঐতিহ্যভ্রষ্টতা এবং বাণিজ্যের কারণে আমদানিকৃত রুচিবিকার। এইখানে আমাদের আগ বাড়িয়ে বলা উচিত যে এই ঐতিহ্যভ্রষ্টতা বা রুচিবিকার শুধু সুরে বা অ্যারেঞ্জমেণ্টে নয়—গানের বাণীতেও।

তাহলে আরেকটা কথা স্পষ্টভাবে উঠে আসছে এইসব চাপান-উতোর থেকে। রবীন্দ্রনাথ থেকে অতুলপ্রসাদ পর্যন্ত আমাদের যে-আধুনিক গান তার প্রেরণা ও নির্মিতিতে কোনো বাণিজ্যসংস্কার ছিল না। তাঁদের গান রচনার প্রেরণার সঙ্গে রেডিও-রেকর্ড-ফিল্মে সম্প্রচারের সম্ভাবনা ছিল না, জনরুচির দাস্য তাঁদের করতে হয়নি। রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলাল অবশ্য নাটকের জন্য গান বেঁধেছেন, (দ্বিজেন্দ্রলালের ক্ষেত্রে মূলত পাবলিক স্টেজ) তবু তাতে জনরুচির চাপ ছিল না বরং তাঁদের গান নাট্যামোদীদের মারফত গীতরসিকদের কাছে চমৎকার রুচিমান নাট্যসংগীতরূপে এসে পৌঁচেছিল। অর্থাৎ এককথায়, তাঁরা গান রচনার মধ্যে দিয়ে শিল্পই সৃষ্টি করেছেন—বিপুল জনসংঘের জন্যে কোনো পরিবর্ত-শিল্প বানাতে হয়নি তাঁদের। এই স্বতঃস্ফূর্ত শিল্প আর বানিয়ে-তোলা পরিবর্ত-শিল্পের মধ্যে স্বরূপত অনেকটা ফাঁক থাকে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যে। শিল্পের উদ্দেশ্য আত্মবোধন ও আত্মপ্রকাশ। তার লক্ষ্য শুধু সমকাল নয়, অনাগত কালও। পরিবর্ত-শিল্পের কাজ সমকাল বা সমসময়কে পরিতৃপ্ত করাই কেবল, তাৎক্ষণিক গ্রাহকদের চমকে দেওয়ার বিপণন তার। এই পরিবর্ত-শিল্প তাই চলতি-হাওয়ার-পন্থী। আজ তাই যে গান ও গানের যে-রীতি জনপ্রিয়তম, এক বছর পরেই সেই-গান ও সেই-রীতি তেমন চলবে না। সেই কথা ভেবেই বিপণন সংস্থা স্বল্পতম সময়ে বৃহত্তম সংখ্যায় রেকর্ড ও ক্যাসেট বিক্রি করে বাজার গুটিয়ে নেন এবং চালু করেন নতুন ধরনের গানের ক্যাসেট। এই কারণে যে-নাজিয়া হাসানের 'ডিস্কো দেওয়ানা' লক্ষ লক্ষ কপি বাজারে চলেছিল এখন সেই নাজিয়ার গান আর আমরা শুনি না। রুনা লায়লাকে এইভাবেই একদা ব্যবহার করে এখন বর্জন করা হয়েছে। এই পদ্ধতিতে মার্কেট রিসার্চারবৃন্দ গত পাঁচ বছর বাজারে গজল ছেড়ে দেখছেন তার ব্যবসায়িক ফলাফল অথবা অনুপ জলোটাকে দিয়ে ভজন আর গজল মিশিয়ে তৈরি করছেন 'ভজল'।

কিন্তু এ সবই তো সর্বভারতীয় ব্যাপার। আমরা ভাবছি বাংলা গানের কথা। সেখান থেকেও উদাহরণ দেওয়া যায়। স্বপ্না চক্রবর্তীর 'বড়লোকের বিটি লো' এবং 'বলি ও ননদী' এক সময় সুপার হিট করে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর গায়নরীতিকে দোহন করা শুরু হয়। তার পরিণামে এইরকম অভব্য গান বেরিয়ে আসে :

১ রসিক লাগর আমার দেখো ডাগর হঁয়েছে।
লাগর আমায় দেখে
আড়ে আড়ে চোখ টাঁড়াইছে॥

২ আমি তখন পুকুর ঘাটে কাচছিলম শাড়ি
বুড়ো ইশারাতে আমায় ডেকে লড়ালছিল দাড়ি।
আবার ফোকলা দাঁতে হেসে বলে,
'বস আমার পাশেতে'।

এর ফল এই হয়েছে যে স্বপ্না চক্রবর্তীর গান এখন আর কান পেতে শোনা যায় না। কিন্তু এ তো গেল তরুণবয়সিনী গায়িকার মতিচ্ছন্নতার কথা। এ ব্যাপারে তিনি হয়তো সর্বাংশে দায়ী নন। পাশাপাশি দেখা যেতে পারে বর্ষীয়ান ও প্রতিষ্ঠিত নির্মলেন্দু চৌধুরীর উদাহরণ। তাঁর ছিল এক সমৃদ্ধ লোকায়ত গানের ভিত্তি এবং প্রগতিপন্থার ভূমিকা। গণ আন্দোলন ও লোক সংগীতের এই দীক্ষিত শিল্পী একবার নিজেই একটা গান লিখে তাতে সুর দিয়ে রেকর্ড করেন। সে-গানের নমুনা :

সাধের লাউ রে কদু
তোর ভিতরে কী আছে এত মধু।
লাউ না পাইয়া বৈষ্ণবী যে করে দাপাদাপি—
বৈষ্ণব গোঁসা কইর‍্যা প্রসাদ খায় না
বৈষ্ণবীরে রাখি॥

খোঁজ নিলে দেখা যাবে এ-গানের উৎসে আছে রুনা লায়লার ব্যবসাসফল গান 'সাধের লাউ বানাইল মোরে বৈরাগী'। শুনেছি কেউ কেউ নাকি এ জাতীয় গানকে বলেন : 'ফোকো-মডার্ন'। সে কি পপ্-রকের মতো কোনো সঙ্করজাতীয় পদার্থ?

যে জাতীয়ই হোক, একটা কথা স্পষ্ট। বাজারে টিকে থাকা এবং নিজের চাহিদাকে টিকিয়ে রাখাই আজকের গানের শিল্পীদের মূল সাধনা। গানের রেকর্ড হিট করলে মোটা রকম রয়ালটি মানি পাওয়া যায়। গানকে তাই নিত্যনব রুচির সঙ্গে তাল মিলিয়ে ভোগ্যপণ্য বানাতে গিয়ে এখন শিল্পীদের মধ্যে শুরু হয়েছে অসুস্থ প্রতিযোগিতার ইঁদুর-দৌড়। তার ফলে গায়ক, গীতিকার ও

সুরকারের সংখ্যা অনেক বেড়ে যাচ্ছে অথচ তাঁদের তালিম কম এবং সংগীতগত যোগ্যতা সম্পর্কে সন্দেহ আছে। আরেকদিকে দেখা যাচ্ছে গানকে আকর্ষণীয় করতে গিয়ে তাতে আনা হচ্ছে উদ্ভট প্রসঙ্গ। এ সব হচ্ছে, তার কারণ, শ্রোতাদের সম্পর্কে কোনো সামাজিক দায়বোধ কোনো স্তরে কারুর নেই। পরিহাসের মতো শোনালেও মান্না দে-র একটা গানে বলা হয়েছে 'তাতে তোমার কী আমার কী'? কথাটা সত্যি। বাপ্পী লাহিড়ী একটা আধুনিক গানে উচ্চারণ করেন আরেকটা নির্মম সত্য : 'সম্পর্ক নাই সম্পর্ক নাই সম্পর্ক নাই সম্পর্ক নাই' এবং 'সে আমার কেউ নয় / তার আমি কেউ নই'।

আধুনিক বাংলা গানের জগৎ এমনই এক বিচিত্র সম্পর্কহীনতার সুতোয় ঝুলছে। কারুর জন্যে কারুর দায় নেই সেখানে। শিল্পী বলছেন শ্রোতারা এমনই চাইছেন, শ্রোতারা বলছেন শিল্পী রুচিভ্রষ্ট, প্রযোজক ভাবছেন বাজারের কথা, সমালোচক বলছেন 'গেল গেল'। এইখানে আমাদের এগিয়ে এসে মনে করিয়ে দিতেই হয় সংগীততাত্ত্বিক শ্রীরাজ্যেশ্বর মিত্রের একটি মন্তব্য 'বাংলার গীতকার ও বাংলা গানের নানাদিক' (১৯৩৩) বইয়ের অন্তর্গত 'আধুনিক বাংলা গান' নিবন্ধ থেকে যে,

> হাল্‌কা রুচি নিয়ে জনসমাজকে দোষী করাটা যুক্তিযুক্ত নয়, কেননা এটা দেখা গেছে যে, যাঁরা শিল্পের প্রযোজক তাঁরাই জনচিত্তের দুর্বলতা পর্যবেক্ষণ করেন, এবং ব্যবসায়িক সাফল্যের জন্য শিল্পকে সেইভাবেই নিয়োজিত করেন। অনুসন্ধান করলে জানা যাবে, প্রত্যেকটি লঘুরীতির প্রশ্রয়দাতা প্রযোজক, পরিচালক বা শিল্পীর কাছ থেকে এসেছে এবং এর জন্য তাঁরাই দায়ী।

এখানে ইতিহাসের কথা মনে রাখলে আমরা বুঝবো, এমন রুচিহীনতার অবস্থা একদিনে আসেনি। সিদ্ধার্থ ঘোষের লেখা 'যন্ত্ররসিক এইচ বোস' ('এক্ষণ', ১৩৩০ শারদ সংখ্যা) নিবন্ধ থেকে জানা যায় ১৯০৭ সালের পর থেকে কলকাতায় উন্নতমানের গ্রামোফোন রেকর্ড প্রচলিত হতে থাকে এবং অনুমান করা যায় এই নতুন যন্ত্র ১৯৩০ সালের মধ্যে কলকাতা ও বৃহত্তর বাংলায় কী বিপুল উদ্দীপনা ও লোকপ্রিয়তা জাগিয়েছিল। ইতিমধ্যে ১৯২৭ সালে কলকাতায় বেতার কেন্দ্র চালু হয় এবং নির্বাক ছায়াছবির জগৎ সবাক হবার ফলে সেখানেও গানের সংযোজন শুরু হয়ে যায়। এই তিনরকম সম্প্রচার সূত্রে বাংলা গানের ব্যাপারে এক নতুন শ্রোতার দল তৈরি হয়, যারা আরও নতুন নতুন গান অনবরত পেতে চাইতেন। সেই চাহিদা থেকে বিপণনের এক নতুন পথ সহসা খুলে যায়। তার ফলে অর্ডারি

গান তৈরি হতে থাকে নানা রকমের, জনরুচির বিচিত্র চাহিদা মেটাতে। এই সময়ে গীতিকাররূপে যাঁরা এগিয়ে আসেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য চারজন হলেন: সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় (১৮৮৪-১৯৩৬), হেমেন্দ্রকুমার রায় (১৮৮৮-১৯৩৬), তুলসী লাহিড়ী (১৮৯৭-১৯৫৭) এবং নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৫৭)। সাধারণ রঙ্গমঞ্চ ও গ্রামোফোন রেকর্ডে এঁদের গান খুব জনপ্রিয় হয় এবং বাংলা গানে শুরু হয় পেশাদারী যুগ। এঁদের মধ্যে সাফল্য ও পেশাদারী নৈপুণ্যে নজরুলই সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্রনাথ থেকে অতুলপ্রসাদ পর্যন্ত বাংলা গানে আত্মভাব উন্মোচনের জন্য গান রচনার যে শিল্পময় ঐতিহ্য সৃষ্টি হয়েছিল নজরুল থেকে তা ভ্রষ্ট হলো। এবারে গরিষ্ঠসংখ্যক বাংলা গান হলো মূলত ব্যবহারিক ও বাণিজ্যিক সৃজন। শ্রোতাদের দিকে চেয়ে তার সৃষ্টি।

২

তিনের দশক বরাবর বেতার-রেকর্ড-চলচ্চিত্র মারফত ব্যবহারিক প্রয়োজনে গানের চাহিদা সৃষ্ট হলো আর অমনি নজরুল আর তাঁর সমকালীনরা বানিয়ে ফেললেন নতুন বাংলা গান, ব্যাপারটা এত ফর্মুলামাফিক হয়নি। আসলে তাঁদের আগেই বাংলা গানের এক সবল ঐতিহ্য ছিল এবং ছিল বাংলা রঙ্গমঞ্চের গানের ধারা। রবীন্দ্রনাথ-দ্বিজেন্দ্রলাল-রজনীকান্ত-অতুলপ্রসাদ আধুনিক বাংলা গানের এক সর্বজনগ্রহণীয় চেহারা ও চরিত্র দিয়ে ফেলেছেন ততদিনে। পুরনো বাংলা গানের নানা রূপ-রীতি তাঁরা নিজেদের গানে সমীকৃত করেছিলেন, শোধন করে নিযেছিলেন লোকায়ত নানা গানের রীতি ও ছন্দ, প্রযোজনে বিদেশী সুর সুসমঞ্জসভাবে বাংলা গানে মেশাতে দ্বিধা করেননি। মোটকথা সর্বভারতীয় হিন্দুস্থানী গানের দাপট রুখে তাঁরা আধুনিক বাঙালীর গাইবার মতো উচ্চস্তরের গান প্রস্তুত করেছিলেন। নিরীক্ষাহিসাবে রাগমিশ্রণ এবং সিদ্ধরাগের ব্যত্যয় তাঁরা সাহসের সঙ্গে ঘটিয়েছিলেন। পৌনপুনিক প্রণয় সংগীতের একমুখী খাতে তাঁরা এনেছিলেন আত্মভাবনা, আধ্যাত্মিকতা, নিসর্গ ও স্বদেশবোধের নতুন ধারা। শিষ্ট বাঙালী তাঁদের কাছ থেকেই পেয়েছিলেন নিজেদের নতুন ভাবনার উচ্চারণ। উৎসব, অনুষ্ঠান, শোক, আনন্দ ও উদ্দীপনায় তাঁদের গানই আধুনিক মনকে রূপ দিয়েছে। এ সবই নজরুলকে প্রেরণা দিয়েছিল, তৈরি করেছিল তাঁর গানের ভিত্তি। সেইসঙ্গে ছিল তাঁর অপরিমিত সৃজনসামর্থ্য, গজল রূপবন্ধ বিষয়ে সূক্ষ্ম অভিজ্ঞতা এবং চটজলদি গান রচনার প্রতিভা—যে-কোনো উপলক্ষে ও ন্যূনতম প্রেরণায়। আধুনিক বাংলা

গানে নজরুল তাই সহজেই সাড়া জাগালেন, আনলেন বৈচিত্র্য ও প্রগল্‌ভতা। তিনিই প্রথম বাংলা গানে আনেন পেশাদারী জলুস। আত্মপ্রেরণার চেয়ে অর্থকরী আহ্বান অথবা ছোটখাট আব্দার ও উপলক্ষ তাঁকে দিয়ে অনেক গান লিখিয়ে নিয়েছে। অবশ্য সে-সব বিপুল সংখ্যক গান সম্পর্কে তাঁর তেমন মমতা ছিল বলে শোনা যায় না। কেননা বেহিসাবী বোহেমিয়ান সদাচঞ্চল তাঁর স্বভাব মানতো না কোনো শৃঙ্খলা বা সংগঠন। তাই মাত্র দু-আড়াই দশকে বানানো তাঁর ত্রিসহস্রাধিক গান চৈত্রের শিমুল তুলোর মতো হাওয়ায় বিকীর্ণ হয়ে গেছে সাবলীল ছন্দে। তার সামান্য ধরা আছে সতর্ক স্বরলিপিতে। বেশির ভাগ সুর হারিয়ে গেছে।

তবু, পরিণাম যাই হোক, নজরুলই বাংলা গানে প্রথম রবীন্দ্র-অনুষঙ্গ ভাঙেন। ভাব, সুর, বাণী আর গায়নরীতি—এই চারদিক থেকে তাঁর গান অন্যরকম এবং সমকালে ছিল সবচেয়ে জনপ্রিয়। এই জনপ্রিয়তা যেমন গানের বিষয়গত লঘুতার জন্য তেমনই রাগরাগিণী-ছোঁওয়া সুর ছন্দ তানের চমৎকার খোশমেজাজী চালের

নজরুল তাঁর সমকালে ছিলেন উচ্চকিত যৌবনের বিগ্রহ। তাঁর অস্থির অনিশ্চিত আর আবেগসর্বস্ব জীবনযাপনের রীতি, তাঁর বিদ্রোহবাদী কবিতা ও নতুন রকমের গান, তাঁর রাজনৈতিক উন্মাদনা ও চলচ্চিত্রের সংরাগ তাঁকে জনপ্রিয়তার এমন এক উন্মাদনাকর শীর্ষে তুলে ধরেছিল যার ধারেকাছে আর কেউ ছিলেন না। প্রত্যক্ষদর্শীরা বলেন সেকালে অর্থাৎ তিনের দশকে রবীন্দ্রনাথের গানের চেয়ে নজরুলের গান অনেকবেশি জনপ্রিয় ছিল। রবীন্দ্রকবিতা তখন যতটা বহুপঠিত ছিল রবীন্দ্রসংগীত ততটা সম্প্রচার পায়নি। এই তথ্য আশ্চর্যজনক কিন্তু ঐতিহাসিক তাৎপর্যে খুবই দ্যোতক।

এখন নিরপেক্ষভাবে দূর থেকে বিচার করলে বোঝা যায়, বাংলা গানের বাতাবরণে রবীন্দ্রসংগীতের চেয়ে নজরুলগীতির সে-কালীন জনপ্রিয়তার ফল ভবিষ্যতের পক্ষে ভালো হয়নি। কেননা নজরুল-পরবর্তী বাঙালী গীতিকাররা নজরুল-গীতির অপকৃষ্ট দিকটির দ্বারাই বেশি প্রভাবিত হয়েছেন। যেমন—চাঁদ ফুল মালা আর সমাধির প্রসঙ্গ নজরুলের গানের সরণি বেয়ে চলে এসেছে পরবর্তী বাংলা গানে। আর বাংলা গান যে নজরুল পরবর্তীকালে রুদ্ধ হয়ে যায় কেবল প্রেম ও বিরহের প্রসঙ্গে তার মূলেও বোধহয় নজরুলের অপপ্রভাব। নজরুল গীতির সমকালীন জনপ্রিয়তার আরেক বড় কারণ ছিল। তাঁর নিজস্ব দৃপ্ত গায়ন

ছাড়াও নজরুল গীতি প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছিল দিলীপকুমার রায়, জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী ও শচীন দেববর্মনের মতো বিখ্যাত ও দক্ষ শিল্পীর কণ্ঠে।

গানে নজরুলের ব্যবহারিক চাহিদা ও সাফল্য তাঁর সমকালীন আর পরবর্তী অনেক গুণী ব্যক্তিত্বকে বাংলা গানের দিকে আকর্ষণ করে। গান লিখে বা গানে সুরারোপ করে ভালো অর্থপ্রাপ্তির সুনিশ্চিত সম্ভাবনাও হয়ত অনেককে টেনেছিল। মনে রাখতে হবে সমগ্র বাংলায় তখন চলছে দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী আর্থিক মন্দা, হতাশা ও বেকারত্ব। নাচ, গান, নাটক, হাসির গান, পত্রিকা সম্পাদনা, বেতার চলচ্চিত্র—সব স্তরেই তখন জীবিকা খুঁজেছেন হেমেন্দ্রকুমার, তুলসী লাহিড়ী, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, নলিনীকান্ত সরকার ও সজনীকান্ত দাসের মতো ব্যক্তিরা। মোট কথা বাংলা গানে নজরুলের আর্থিক সাফল্য পরবর্তী-দের প্রলোভিত করে। সেই প্রফেশনাল দৃষ্টিভঙ্গি, সেই শ্রোতাদের রুচিমাফিক অর্ডারি গান লেখার নতুন ধারা পরবর্তী বাংলা গানকে সৃজনাবেগ থেকে ও মৌলিকতা থেকে অনেকটাই ভ্রষ্ট করেছে। তখন থেকেই আধুনিক বাংলা গান বলতে সাধারণত সবাই বুঝতেন প্রণয়-সর্বস্ব সস্তা চপলতা বা সাজানো বেদনা।

নজরুল-পরবর্তী বাংলা গানে অবশ্য একটা নতুনত্ব এল, যাকে বলা যায় গানেব নির্মাণে এক বিভাজিত বিন্যাস। তখন থেকে শুরু হলো গীতিকার-সুরকাব-শিল্পী এই তিন সমন্বয়। তাতে ফল সব সময়ে খারাপ হয়নি। বিশেষ কবে অজয় ভট্টাচার্যের বাণীতে হিমাংশু দত্তর সুরারোপ আর তাতে শচীন দেববর্মনের কণ্ঠদান তো প্রবাদপ্রতিম। অজয় ভট্টাচার্য ও শৈলেন বাযেব লেখা গানে ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়েব গাওয়া রাগাশ্রয়ী গানগুলি আধুনিক বাংলা গানের একগুচ্ছ উজ্জ্বল উপহার। এখানে উল্লেখ প্রয়োজন যে, ১৯৩৭ সালে 'রাগপ্রধান গান' কথাটি সৃষ্টি করেন সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী। রাগপ্রধান গান আসলে আধুনিক বাংলা গানেরই এক সমান্তরাল সম্প্রসারণ, যার ধারা এখনও সজীব এবং যা যন্ত্রেব দাপটে এখনও পর্যুদস্ত হয়নি।

যাই হোক, আপাতত নজরুল-পরবতী একঝাঁক গীতিকারের নাম উল্লেখ করা দরকার, বাংলা গানের বিকাশে ও বিন্যাসে যাঁদের ভূমিকা তর্কাতীতভাবে উল্লেখ-যোগ্য। এঁদের নাম বয়সের ক্রমানুসারে : সজনীকান্ত দাস (১৯০০-১৯৬২), হীরেন বসু (১৯০৩-১৯৮৭), শৈলেন রায় (১৯০৫-১৯৮৭), অজয় ভট্টাচার্য (১৯০৬-১৯৪৩) বাণীকুমার (১৯০৭-১৯৭৪) সুবোধ পুরকায়স্থ (১৯০৭-১৯৮৩), অনিল ভট্টাচার্য (১৯০৯-১৯৪৪) নিশিকান্ত (১৯০৯-১৯৭৩) এবং প্রণব রায় (১৯১১-১৯৭৫)।

পাঁচের দশকের আগে পর্যন্ত বাংলা গান এঁদের রচনাতে সমৃদ্ধ হয়েছে। এঁদের লেখা গানে কৌশলী সুরকারদের সুরযোজনা এবং দক্ষ শিল্পীদের কণ্ঠবাদন বাংলা গানে এক নতুন মাত্রা এনেছিল একদা। এঁদের সঙ্গে সমকালীন সুরকার ও গায়ক-গায়িকার সম্পর্ক ছিল অতি ঘনিষ্ঠ ও বিনিময়ধর্মী। সেই কারণে এই কালের গান এক অকৃত্রিম আবেদন আনে। সে-সময়ের সুরকারদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য : হিমাংশু দত্ত, দিলীপকুমার রায়, রাইচাঁদ বড়াল, কৃষ্ণচন্দ্র দে, সুধীরলাল চক্রবর্তী, অনিল বাগচী, হীরেন বসু, কমল দাশগুপ্ত, অনুপম ঘটক, সুবল দাশগুপ্ত, শৈলেশ দত্তগুপ্ত ও শচীন দেববর্মন। শিল্পীদের মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন : দিলীপকুমার রায়, কানন দেবী, কৃষ্ণচন্দ্র দে, আঙুরবালা, ইন্দুবালা, কমলা ঝরিয়া, সায়গল, পঙ্কজকুমার মল্লিক, জগন্ময় মিত্র, শৈল দেবী, ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়, শচীন দেববর্মন, জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী, উমা বসু ও সন্তোষ সেনগুপ্ত। কী অসামান্য নামের তালিকা! আশ্চর্য যে এমন সব প্রথম শ্রেণীর প্রতিভাবান গুণী ব্যক্তি সেকালে বাংলা গানকে অচ্ছুৎ বলে মনে করেননি এবং বাংলা চলচ্চিত্রের জন্য গান তৈরি করতে তাঁদের কোনো হীনমন্যতা জাগেনি। চলচ্চিত্রের গানের প্রসঙ্গে এখানে অবশ্য উল্লেখ্য একটি নাম প্রেমেন্দ্র মিত্র ( ১৯০৪-১৯৩৭ )। অবলীলাক্রমে চমৎকার অনেকগুলি ছায়াছবির গান লিখে খেলাচ্ছলেই তিনি বিদায় নিয়েছেন গানের জগৎ থেকে।

আধুনিক বাংলা গানের অগ্রগতির ইতিহাসে সদ্য উল্লিখিত নজরুল-পরবর্তী গীতিকারদের রচনা গুরুত্বপূর্ণ এইজন্যে যে তাঁরা গানের বাণীতে প্রকাশের নানা মৌলিকতা এবং ভাবনার নতুনত্ব দেখিয়েছেন। বাণীরচনায় অবশ্য অনেকের ঋণ ছিল রবীন্দ্রনাথের গানের কাছে। গানের রূপবন্ধ নির্মাণে রবীন্দ্র-উদ্‌ভাবিত সঞ্চারী এঁদের রচনায় অনুকৃত হয়েছিল। অথচ রবীন্দ্র-সংগীতের অন্তর্গূঢ় গভীরতা এবং ভাববৈচিত্র্য এঁদের আয়ত্তাধীন ছিল না। উদ্দীপনার বদলে একধরনের কাল্পনিক বেদনা-বিলাস এবং স্বরচিত দুঃখের মায়াজগৎ ঘিরে এঁদের ছিল অভি-মানী বিচরণ। রুগ্ন রোমান্টিক কোনো বিষাদবোধ, ভ্রষ্ট প্রেমের জন্য সন্তাপ এই সময়কার বাঙালী গীতকাররা কেন এত ভালবেসেছিলেন, কেনই বা সেই গান বুকে তুলে নিয়েছিলেন তিন ও চারের দশকের শ্রোতা তার কি কোনো কারণ অনুমান করা সম্ভব? মনে রাখা দরকার যে, সেই সময়কাল কোনো রোমান্টিক গানের পক্ষে অনুকূল ছিল না। মধ্যবিত্ত বাংলা সমাজ তখন নৈরাশ্যে, অর্থনৈতিক মন্দায় ও নির্বেদে অতল, জীবিকাবিহীনতায় ভারসাম্যহীন। সেইজন্যই কি বকুল বিছানো-

পথে চলে-যাওয়া-প্রেম হয়ে উঠেছিল আমাদের গানের পলায়নী মনোভাবের দ্যোতক ?

এই স্ববিরোধী চেতনার প্রবলতায় বাংলা গান ভ্রষ্ট হলো সমাজচেতনা ও দেশকালের সত্য থেকে। আমাদের গানে রইল না আমাদের নিজস্ব অস্তিত্বের সংকট বা সেই সংকটমোচনের উদ্দীপন বাণী। অথচ সেই সময়েই ১৯৪১ সালে, রবীন্দ্রনাথ 'ঐ মহামানব আসে' গান রচনার নেপথ্য ঘটনা উল্লেখ করে জানাচ্ছেন : 'সৌম্য আমাকে বলেছে মানবের জয়গান গেয়ে একটা কবিতা লিখতে···তাই একটা কবিতা রচনা করেছি, সেটাই হবে নববর্ষের গান।'* কিংবা এর কিছুকাল আগে ১৯৩৮-৩৯ সালে 'বাঁধ ভেঙে দাও' গান লিখেছেন, তারও আগে ১৯৩৬ সালে লিখেছেন উদ্দীপনার 'শুভ কর্মপথে ধরো নির্ভয় গান/যত দুর্বল সংশয় হোক অবসান।'

অথচ সেই দশকেই আধুনিক গানের একজন গীতিকার বলতে চাইছেন : 'রাতের ময়ূরী ছড়ালো যে পাখা আকাশের নীল গায় / তুমি কোথায় ?' আরেকজন বললেন : 'আমি আজ নিয়ে যাই পরাজয়'। আরেকজন ডুবে থাকতে চাইলেন চাঁদ ও চামেলির বন্ধুতায় ও বিরহে। জীবনে যাকে মালা দেওয়া যায় না মরণে কেন তাকে ফুল দিতে আসা ? একটি গানের বিচিত্র জিজ্ঞাসা এতটাই তরল।

কিন্তু শুধু তরল স্বপ্নবাদিতার উচ্ছ্বাস নয়, এঁদেরই অনেকের বাচনে স্পষ্ট আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি মেলে। অজয় ভট্টাচার্যের চৈত্রদিনের ঝরাপাতার পথে জাগে অন্য এক আশ্বাসের দিক। দুঃখে যাদের জীবন-গড়া তাদের দিকে চকিতে নজর পড়ে তাঁর। প্রণব রায় খুব শানিত বাচনে বলে ওঠেন : 'শুধু সেই তব কথার লাগিয়া হয়ত আসিব ফিরে'। কিংবা তাঁর কল্পনাতেই তন্দ্রার তীর হয়ে ওঠে তীর্থ। বাণীকুমার তাঁর গানে শোনান অশ্রুকণার মেলা নয়নের নতুনত্ব। সজনীকান্ত তাঁর গানে আক্ষেপ জানান এই বলে যে, মনের গহনে সুন্দরের মূর্তিখানি কেবলই ভেঙে ভেঙে মুছে যেতে চায় বারে বারে। এসব উপলব্ধি ও বাচন নিঃসন্দেহে বাংলা গানে রবীন্দ্র-অনুষঙ্গতার চেয়ে ভিন্নতর এক আবেশ জাগায়। অনেকটাই স্বয়ম্বশ উচ্চারণে প্রেমেন্দ্র মিত্র তাঁর গানের আধুনিকতায় বলেন : 'আজকে জানি আমরা দুজন বাদে পৃথিবী নির্জন।' এমন আশ্চর্য পংক্তি তাঁর গানেই কেবল পাই আমরা : 'মেঘেতে যা কিছু আঁকিয়া যাক / জানি আকাশে কখনও লাগে না দাগ।' অন্যদিকে নিশিকান্ত নিসর্গকে নতুন চোখে দেখে বলে ওঠেন : 'সবুজের মর্মে ফোটে শুভ্র সুনীল ফুলের তারা'।

---

* গানটি হলো 'ঐ মহামানব আসে'।

গানের এই সব একান্ত উচ্চারণের উত্তাপ নজরুল-পরবর্তী বাংলা গানকে যখন এক ধরনের নান্দনিকতায় ও স্মৃতিভারাতুর বিষণ্ণতায় গাঢ় করে তুলছে, ভেতরে ভেতরে তখন বাংলায় চেপে বসছে আসন্ন ঝড়ের গুমোট। একদিকে আগস্ট আন্দোলন, আরেকদিকে বাংলাব্যাপী দুর্ভিক্ষ-প্লাবন-মন্বন্তর। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমকালীন প্রগতি আন্দোলন, 'কংগ্রেস সাহিত্য সংঘ', 'ভারতীয় গণনাট্য সংঘ', 'ক্রান্তি শিল্পী সংঘ' ও সব স্তরের গণজাগরণ, অলস প্রণয়মগ্ন স্বপ্নবাদী গানের জগৎকে ধ্বস্ত করতেই যেন এগিয়ে আসছিল। সারা বিশ্বে যুদ্ধজনিত নৈরাশ্য ও ভাঙা গড়া, বাংলার ফ্যাসিবিরোধী সংগঠন এবং পরাধীন ভারতে বৃটিশ সিংহের শেষ থাবার হুংকার আমাদের গানের জগৎকে এক লহমায় মুখোমুখি করে দেয় সত্যের দিকে, সমাজ বাস্তবতার অভিমুখে। গান্ধীর 'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে' এই আহ্বানের বাণীরূপ নিয়ে বাংলা গান উচ্চারণ করলো : 'করিব অথবা মরিব এ পণ / ভরিয়া তুলেছি ভারত ভুবন'। তেভাগা আন্দোলনের মন্ত্রে গান বাঁধা হলো : 'হেই সামালো ধান হো'। তাতে ১৩৫০ সালের মন্বন্তরের এই ঐতিহাসিক সত্য গাঁথা থাকলো যে, 'পঞ্চাশে লাখ প্রাণ দিছি / মা-বোনেদের মান দিছি'। বাংলা গানের এমন বন্ধ রোমান্টিকতার অন্ধতা ভাঙতেই হয়ত জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র ঘোষণা করেন : 'এসো মুক্ত করো অন্ধকারের এই দ্বার'। বাংলার দুর্দিন নিয়ে লেখা গানের একদিকে জানানো হলো 'আজ বাংলার বুকে দারুণ হাহাকার' আরেকদিকে থাকলো এমনতর শপথ 'ঝঞ্ঝা ঝড় মৃত্যু দুর্বিপাক / ভয় যারা পায় তাদের ছায়া দূর মিলাক'। আহ্বান করে বলা হলো : 'শহীদ স্মরণে আপন মরণে রক্তঋণ শোধ করো'। মোট কথা বাংলা গান এবারে ক্রমশ হয়ে উঠলো ভাবের দিক থেকে বাস্তববাদী, বক্তব্যের দিক থেকে সমকালীন। ইতিমধ্যে দেশবিভাগের বিচ্ছেদ এবং উদ্বাস্তু ছিন্নমূল জীবনের অভিজ্ঞতা গ্রহণ করতে হলো আমাদের। তার থেকেই জেগে উঠলো নতুন গান। হেমাঙ্গ বিশ্বাস লিখলেন উদ্বাস্তুদের উদ্বুদ্ধ করে 'বাঁচব রে বাঁচব / ভাঙাবুকের পাঁজর দিয়া, নয়া বাংলা গড়ব'। বিনয় রায় গাইলেন কমলাপুর, ডোঙ্গাজোড়া, চন্দনপিঁড়ির শহীদস্মৃতির গান। এমন কি সুদূর মালাবারের কায়ুর বিপ্লবীদের ফাঁসির প্রতিবাদে তিনি গর্জে উঠলেন 'ফিরাইয়া দে, মোদের কায়ুর বন্ধুদেরে'। এ সবই আমাদের নবজীবনের গান, নব ভাবনার।

সত্য হিসাবে আরেকটা কথাও মনে রাখতে হবে অবশ্য। এ সব গানের বেশির ভাগই সম্প্রচারিত হয়নি বেতারে, বাণীবদ্ধ হবার সৌভাগ্য পায়নি তখনকার গ্রামোফোন ডিস্কে। তবু এসবই আধুনিক বাংলা গান। স্বাধীনতা লাভের আগে

পরের সব রকমের গণ আন্দোলনে ও সামূহিক উন্মাদনায় এইসব গানই তখনকার বাঙালি গেয়েছেন ও শুনেছেন। এ গান ও তার পটভূমি অনুধাবন না করলে বাংলা গানে সলিল চৌধুরী ও হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের চকিত আবির্ভাবের মর্ম বোঝা যাবে না। বোঝা যাবে না পাঁচের দশকে সলিল চৌধুরীর 'গাঁয়ের বধূ' 'রানার' বা 'পালকি চলে' কী আশ্চর্য নবজাগরণ এনেছিল বাংলা গানের বিষয়ে ও সুরে। মূল্য নির্ধারণ করা যাবে না সুকান্ত, সুকৃতি সেন, সজনীকান্ত, পরেশ ধর, অনল চট্টোপাধ্যায় বা অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রবীর মজুমদারের গানের কৃতির। এই পর্বের গীতিকার-দের একটি ক্রমানুসারী তালিকায় চোখ বুলিয়ে নেওয়াও দরকার। তাঁদের নাম : জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র ( ১৯১১-১৯৭৭ ), হেমাঙ্গ বিশ্বাস ( ১৯১২-১৯৮৮ ), বিনয় রায় (১৯১৮-১৯৭৭), পরেশ ধর (১৯১৮), সলিল চৌধুরী ( ১৯২৩ ), অনল চট্টোপাধ্যায় ( ১৯২৮ ) ও হৃদয় কুশারী। আলাদাভাবে উল্লেখ করলেও এ কথা বোধ হয় স্পষ্ট যে এই পর্বের গীতিকারদের সকলেই প্রধানত রাজনৈতিক বিশ্বাস থেকে গান লিখেছেন। রাজনৈতিক বিশ্বাসের বাইরে থেকেও এ সময়ে ভালো গান নিশ্চয়ই লেখা হয়েছে। একটি নমুনা তো বিখ্যাত। মোহিনী চৌধুরীর ( ১৯২০-১৯৮৮ ) লেখা 'মুক্তির মন্দির সোপানতলে কত প্রাণ হলো বলিদান'। রেকর্ডে কৃষ্ণচন্দ্র দে-র গাওয়া এই গান শুনে এককালে কে না উদ্বুদ্ধ হয়েছেন ?

কিন্তু স্বাধীনতার আগে-পরে গড়ে ওঠা বাংলা গানের এই সমৃদ্ধ পরিবেশ হঠাৎই বদলে গেল পাঁচের দশকের মাঝামাঝি। তার আগে অবশ্য প্রয়াত হয়েছেন অজয় ভট্টাচার্য ও হিমাংশু দত্ত। পাকাপাকিভাবে পণ্ডিচেরী চলে গেছেন দিলীপ-কুমার, নিশিকান্ত ও ভীষ্মদেব। প্রয়াত হয়েছেন সায়গল, উমা বসু ও অনিল ভট্টাচার্য। প্রেমেন্দ্র মিত্র গান লেখা ছেড়ে দিয়েছেন। শচীন দেববর্মন ভাগ্য-সন্ধানে গেছেন বোম্বাইয়ের চলচ্চিত্র জগতে।

এদিকে স্বাধীনতার পরেই কংগ্রেসের সাংস্কৃতিক সংগঠন 'কংগ্রেস সাহিত্য সংঘ' নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। 'গণনাট্য সংঘ' ও 'ক্রান্তি শিল্পী সংঘ' হয়ে পড়ে দুর্বল ও বিচ্ছিন্ন। কম্যুনিস্ট পার্টির নির্দেশে বিনয় রায় চলে যান মস্কো। জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র যান প্রথমে বোকারো, পরে দিল্লী। সলিল চৌধুরী ও হেমন্ত মুখোপাধ্যায় যান বোম্বাইয়ের চলচ্চিত্র শিল্পে। তার ফলে আধুনিক বাংলা গানের সাজানো সংসার হঠাৎ ভেঙে যায় কিন্তু গানের জগৎ তো শূন্য থাকতে পারে না, তাই এগিয়ে আসেন নতুন একদল গীতিকার-সুরকার-শিল্পী। চলচ্চিত্রে এই সময়েই গড়ে ওঠে বিখ্যাত উত্তম-সুচিত্রার জুটি। 'পথের পাঁচালী' মুক্তি পাওয়ার পরেও বাংলা

চলচ্চিত্রে উত্তমকুমারের ক্যারিস্‌মা দীর্ঘদিন ছিল। তাঁর জনপ্রিয় বিগ্রহের পেছনে থেকে কণ্ঠদান করে পঁচিশ বছর ধরে বাঙালি শ্রোতাকে মাতিয়ে রাখেন হেমন্ত-মান্না-কিশোরকুমার; সুচিত্রার গলায় কণ্ঠ মেলান সন্ধ্যা ও আরতি। আর সেই সব হিট গান লেখেন ও বিখ্যাত হন গৌরীপ্রসন্ন, শ্যামল গুপ্ত ও পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়।

বাংলা গানে যেটুকু প্রগতিপন্থার হাওয়া লেগেছিল, এসেছিল সমাজবাস্তবতা ও দেশকালের স্পর্শ, পাঁচের দশকের গান তাকে অস্বীকার করে কোন অজ্ঞাত টানে আবার ফিরে গেল সেই অলস প্রণয়স্বপ্ন ও অভিমানী বিরহের তাপে। আবার কাকলি আর কুহুর মিতালি, স্বপ্ন আর সমাধি, ভুলের বালুচর, আশার খেলাঘরের গান বাঁধা হলো। 'পাষাণের বুকে লিখো না আমার নাম' একজনের গানের বিনতি। 'এমন দিন আসতে পারে যখন তুমি দেখবে আমি নাই' সকাতর অনুনয় অন্যজনের। 'আকাশপ্রদীপ জ্বলে দূরের তারার পানে চেয়ে' পৃথিবীর কষ্টকল্পনা এতদূর পৌঁছালো। একজন খেদ করলেন, 'খেলাঘর মোর ভেসে গেছে হায় নয়নের যমুনায়'। তবু এ সবই সে-সময়ের জনপ্রিয়তম হিট গান। অন্য কোনো গানের বিকল্প ছিল না বলেই বোধহয় বাঙালী এই ধরনের গানে খুশি ছিলেন। সেই সময়ে বাংলা গানের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল হিন্দী সিনেমার গান। 'লা-রে লাপ্পা'-এর যুগ পেরিয়ে তা শঙ্কর-জয়কিষনের বা ও. পি. নায়ারের কিংবা সি রামচন্দ্রের সুরে দেশ কাঁপিয়ে দিয়েছিল। হিন্দী ফিল্মে শচীন দেববর্মন, সলিল চৌধুরী ও হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সুরও হয়েছিল জনপ্রিয়।

কিন্তু বাংলা গানের ভাবসম্পদ ফিরে গেল পিছন দিকেই। এই সময়কার সফল গীতিকারদের একটি ক্রমানুসারী উল্লেখ এখানে প্রাসঙ্গিক মনে হবে। তাঁদের নাম : হীরেন বসু (১৯০৩-১৯২৮), সুবোধ পুরকায়স্থ (১৯০৭-১৯২০), বিমল-চন্দ্র ঘোষ (১৯১০-১৯২০), প্রণব রায় (১৯১১-১৯২৮), মোহিনী চৌধুরী (১৯২০-১৯২৫), সলিল চৌধুরী (১৯২৩), শ্যামল গুপ্ত (১৯২৫), গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার (১৯২৫-১৯৩১) এবং পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৩১)। এছাড়া উল্লেখযোগ্য পবিত্র মিত্র, গোপাল দাশগুপ্ত ও মুকুল দত্তের নাম। এই সময়ের সুরকারদের মধ্যে রবীন চট্টোপাধ্যায়, সুধীরলাল চক্রবর্তী, সলিল চৌধুরী, অনুপম ঘটক, নির্মল ভট্টাচার্য, শৈলেন মুখোপাধ্যায়, সুধীন দাশগুপ্ত, দিলীপ সরকার, প্রবীর মজুমদার, অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখেন। এঁদের সুরে যাঁরা গাইতেন তাঁদের তালিকা সুদীর্ঘ। ইতিহাসের খাতিরে যাঁদের উল্লেখ থাকা প্রয়োজন।

তাঁদের নাম: জগন্ময়-সুধীরলাল-হেমন্ত-ধনঞ্জয়-মানবেন্দ্র-মান্না-শ্যামল-তরুণ-অখিলবন্ধু-শচীন গুপ্ত-তালাত মামুদ-দ্বিজেন-পান্নালাল-রবীন-সতীনাথ-মৃণাল-শৈলেন-দিলীপ সরকার। সুপ্রভা-উৎপলা-সন্ধ্যা-প্রতিমা-নির্মলা-আরতি-গীতা দত্ত-নীতা সেন। এঁদের কণ্ঠে আশ্রয় করে ১৯৬০ পর্যন্ত আধুনিক বাংলা গান বিপুল জনাদর কেড়েছে তার কারণ পারফরমার হিসাবে এঁদের মান ছিল অত্যন্ত উঁচু। তাছাড়া গানের সুরে একটা চিন্তাভাবনার পরিচয় রাখতেন সুরকাররা। কিন্তু তবু আধুনিক গানের অভিঘাত রসিকসমাজে ক্রমশই ম্লান হতে থাকলো, সম্ভবত গানের বাণীর মাঝারিয়ানার জন্য। আর হঠাৎ ১৯৬০ সালে এসে গেল রবীন্দ্র-শতবর্ষ। গীতসুধার তরে চিত্তপিপাসিত বাঙালী শ্রোতা সহসা রেকর্ড ও রেডিওতে এবং চলচ্চিত্রেও (সত্যজিৎ তপন সিংহ-ঋত্বিকের ছবিতে বিশেষত) রবীন্দ্রনাথের গানের জগতের এক অনর্গলিত সম্ভার আর অনবদ্য সৃজনের মুখোমুখি হলেন। এর ঠিক আগে পূর্ণ দাস ও নির্মলেন্দু চৌধুরীর বাংলা লোকায়ত গানে বাঙালী শ্রোতা স্বাদবদলের আনন্দ পেয়েছিলেন, ভালো লেগেছিল ভূপেন হাজারিকার গান। কিন্তু রবীন্দ্রসংগীতের বিচিত্র আবেদন হলো অভূতপূর্ব। হেমন্ত-অশোকতরু-দেবব্রত-সুবিনয়-শান্তিদেব-সুচিত্রা-কণিকা-রাজেশ্বরী-নীলিমা-বনানী-সুমিত্রা সেন। চিন্ময়-অর্ঘ্য-অরবিন্দ-স্বপন গুপ্ত-দ্বিজেন-সাগর সেন-চিত্রলেখা-মায়া সেন-গীতা ঘটক-পূরবী-ঋতু এমন অজস্র নাম করা যায়। বেরোতে লাগল বহুরকম বিন্যাসে রবীন্দ্র সংগীতের দীর্ঘবাদন রেকর্ড। বেরোলো সবকটি রবীন্দ্র-গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্যের রেকর্ড। বেতারে দিনের মধ্যে বেশ কয়েক ঘণ্টা রবীন্দ্রসংগীতের সম্প্রচার চললো। রবীন্দ্রসংগীতের নানা-রকমের আসরে ভরে গেল দেশ। রবীন্দ্রসংগীত-শিল্পীদের দক্ষিণা অনেক বেড়ে গেল।

এই ব্যাপক রবীন্দ্রসংগীত প্রচারে বাঙালী শ্রোতাদের সামনে দুটো ব্যাপার স্পষ্ট হয়ে উঠলো। এক, তাঁরা এতদিনে জানতে পারলেন রবীন্দ্রসংগীতের বিপুল ঐশ্বর্য ও অন্তর্লীন বৈচিত্র্যের সংবাদ। বুঝলেন কত বড় গানের গুপ্তধন তাঁদের কাছে লুকানো ছিল এতদিন। দুই, দেখা গেল অনেক রবীন্দ্রসংগীত-শিল্পীর মধ্যে রয়েছে দীর্ঘ সাধনার প্রস্তুতি ও ঈর্ষণীয় গায়নসামর্থ্য। ১৯৬০ সালের আগে সুচিত্রা-দেবব্রত-হেমন্তর মোটামুটি প্রতিষ্ঠা ছিল, কণিকা ও রাজেশ্বরীর গান অনেকে শুনেছিলেন। কিন্তু সুবিনয় রায়ের গান শোনা যেত কেবল ব্রাহ্মসমাজের সাধন বেদীতে। শান্তিদেব আর নীলিমার গান শুনতে পেতেন কেবল শান্তিনিকেতনের আশ্রমিকরা। এবারে রবীন্দ্রজন্মশতবর্ষ উপলক্ষে প্রবলভাবে ফুটে বেরোলেন সুবিনয় ও শান্তিদেব। রাজেশ্বরী ও নীলিমা শোনালেন গান পরিবেশনের শুদ্ধতা।

সুচিত্রা কণিকা অবাক করলেন তাঁদের কণ্ঠসম্পদ ও গানের বৈচিত্র্যমুখী সঞ্চয়ে। হেমন্ত-চিন্ময়-দ্বিজেন-সাগর সেন রবীন্দ্রগানের উচ্চমানের পরিবেশনে ভরিয়ে দিলেন শ্রোতার প্রত্যাশা। অমল নাগ-অর্ঘ্য সেন-বনানী ঘোষ-ঋতু গুহ-পূর্বা দাম-কৃষ্ণা হাজরা গীতা ঘটক-পূরবী মুখোপাধ্যায় শোনালেন তাঁদের নিভৃত সাধনার গোপন ঐশ্বর্য। অশোকতরু ও অরবিন্দ বিশ্বাস রবীন্দ্রগীতিবিচিত্রার নানা অজানা পর্যায় শোনাতে লাগলেন। আর, সবাইকে ছাপিয়ে দেবব্রত বিশ্বাস তাঁর রাজসিক কণ্ঠ-সম্পদে যুবজনের মনোহরণ করলেন। তাঁর গায়নরীতি ও যন্ত্রানুষঙ্গ ( যা নিয়ে পরে হবে বিতর্ক ) মাতিয়ে দিলো অনেককে।

এই সম্পন্নতার পাশে আধুনিক বাংলা গানের মাঝারিয়ানা সহসাই যেন প্রকট হয়ে উঠলো। রবীন্দ্রসংগীতের বিচিত্র গভীর সৃষ্টির ভুবন, তার বাণী-সুরের সৌষম্য ও বিন্যাসের চমৎকারিত্ব একবার যাঁদের মন কেড়ে নেয় তাঁরা আর কি দুর্বল বাণী, চেষ্টিত সুর আর সেই সব চাপা দিতে যন্ত্রের দাপট শুনতে চান? ১৯৬০ সালের আগেও রবীন্দ্রসংগীত ছিল। কিন্তু তখন পঙ্কজ মল্লিক ও হেমন্ত তা গাইতেন। তাঁদের দুজনেরই রবীন্দ্রগীতির সঞ্চয় ছিল খুব কম। কণ্ঠও ছিল না সবরকম রবীন্দ্রগানের উপযোগী। তাদের সমসময়ে রবীন্দ্রসংগীত চলচ্চিত্রে গেয়ে জনপ্রিয় করেছিলেন সায়গল ও কানন দেবী। তাঁদের গানে প্রার্থিত গায়কী, মনন এবং তালিমের অভাব ছিল স্বভাবত। অথচ তিন-চার দশকে রবীন্দ্রগীতির অনেক শুদ্ধ গায়ক-গায়িকা ছিলেন। অমলা দাস, সাহানা দেবী, মালতী ঘোষাল, কনক দাস, বীণা চৌধুরী, সুধা মুখোপাধ্যায়, অমিতা সেন, সুনীল রায়, দ্বিজেন চৌধুরী, সমরেশ চৌধুরীর মতো শিল্পীর গান তেমন বিপুল সাড়া তোলেনি, যেমন উন্মাদনা উঠলো রবীন্দ্রশতবর্ষ ও তার পরের এক দশকে।

ইতিমধ্যে ১৯৫৩, ১৯৫৫ আর ১৯৫১ সালে এসে গেল দ্বিজেন্দ্রলাল রজনীকান্ত ও অতুলপ্রসাদের শতবর্ষ। রবীন্দ্রগীতির সমান্তরালে দ্বিজেন্দ্রগীতি কান্তগীতি অতুল-প্রসাদের গানেরও সমাদর করলেন বাঙালী শ্রোতা। বাংলা গানের অন্যতর সম্পদ ও ঐতিহ্যের সন্ধান মিললো এবার। উঠে এলেন আরেকদল শিল্পী কণ্ঠসম্পদের আরেক গোত্রের সম্ভার নিয়ে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য : কৃষ্ণা চট্টোপাধ্যায়, মঞ্জু গুপ্ত, গোবিন্দগোপাল ও মাধুরী মুখোপাধ্যায়, দিলীপকুমার রায় ( ছোট ), সুশীল চট্টোপাধ্যায়, নীলা মজুমদার, ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়, শর্বাণী হোম, চিত্রলেখা চৌধুরী, রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়, নিশীথ সাধু। অন্যদিকে ১৯৬৫ থেকে গ্রামোফোন কোম্পানি নজরুলগীতির রেকর্ড বাজারে প্রকাশ করে বিপুল ব্যবসায়িক সাফল্য পেলেন।

এইখানেই তৈরি হলো আধুনিক গানের পরাজয়ের সাম্প্রতিক পাদপীঠ। নজরুলের গানকে অবলম্বন করে একদল শিল্পী যেমন উঠে এলেন জনাদরের আলোক-মঞ্চে, আরেকদল আধুনিক গানের শিল্পী তেমনই পুনর্বাসন পেলেন এই রাগভিত্তিক কণ্ঠবিহারের প্রাঙ্গণে। প্রথম দলে উল্লেখযোগ্য ধীরেন্দ্রচন্দ্র মিত্র, ফিরোজা বেগম, পূরবী দত্ত, অঞ্জলি মুখোপাধ্যায়, সুপ্রভা সরকার, ধীরেন বসু। দ্বিতীয় দলে মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, অনুপ ঘোষাল, সুকুমার মিত্র, অধীর বাগচী। এটা তো ঠিকই যে রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনীকান্ত বা অতুলপ্রসাদের গানের যথার্থ রস আদায় করতে গেলে, গায়নের একটা বিশেষ রূপ আছে তার। প্রতিতুলনায় নজরুলের গানে আছে শিল্পীর অবাধ স্বাধীনতা ও সুরবিহারের অবকাশ। আধুনিক বাংলা গানের শিল্পীদের অনেকেরই কণ্ঠসম্পদ অসামান্য, রাগতালের জ্ঞান পাকা, গায়নের অভিজ্ঞতাও সুদীর্ঘ। তাই নজরুলের গান হলো তাঁদের পরম আশ্রয়। তাতে সমস্যা এই হলো যে নতুন নতুন শিল্পী এখন যতটা ও যে-পরিমাণে নজরুল গীতির ক্ষেত্রে আসছেন সেই ভাবে আধুনিক গানে আসছেন না। নজরুলের গান এখন শিল্পীর স্বাধীনতার নামে ক্রমে স্বৈরতায় পর্যবসিত হয়েছে। কারণ গরিষ্ঠ-সংখ্যক নজরুল গীতির কোনো স্বরলিপি নেই। স্বেচ্ছাবৃত অনেক অভিভাবক এখন নজরুলের গানের জগতের নেতৃত্বে।

আধুনিক গানের ক্ষেত্রে এখন তাই চলেছে পিছন দিকে যাবার পালা। শুধু নজরুলগীতি নয়, 'ডাউন মেমারী লেন' নাম দিয়ে গ্রামোফোন কোম্পানি প্রকাশ করে চলেছেন অনেক ধরনের পুরোনো হিট গান বা তার 'রিমেক'। রেকর্ড কোম্পানিগুলি মূলত ক্যাসেট বার করে চলেছেন চার পাঁচ ছয় দশকের শিল্পীদের গাওয়া আধুনিক গানের। সেগুলির বিক্রয় বেশ ভালো। কিন্তু এই যে এখনকার সদ্য-তৈরি বাংলা গানের চেয়ে পঁচিশ তিরিশ বছর আগেকার গান শ্রোতাদের ভালো লাগছে তার কারণ কি? কয়েকজনের জবানী ও বিশ্লেষণ শোনা যাক।* হেমন্ত মুখোপাধ্যায় মনে করেন: 'সুরে অনেক মেলডি ছিল, কথায় কাব্যধর্মিতা ছিল। আর কথা সুরকে ঠিকমত মিলিয়ে দিতে পারতেন শিল্পীরা।' জগন্ময় মিত্র: 'একটা গান রেকর্ডিং করার আগে আমরা পরিশ্রম করতুম। গানটি ভাল করে তোলা হয়ে গেলে তারপর অর্কেস্ট্রার সঙ্গে রিহার্সাল, শেষে রেকর্ডিং। বোঝাই যাচ্ছে বেশ সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। এখন কারুর সময় নেই।...এখন গান হয়েছে

---

* হেমন্ত, জগন্ময়, ধনঞ্জয়, সন্ধ্যা, সতীনাথ, মান্না ও প্রবীর মজুমদারের উদ্ধৃত সব মন্তব্যের জন্য দ্রষ্টব্য, 'গান বাজনা থেকে বাজনা-গান'। দেশ, ৫৫ বর্ষ ৪১ সংখ্যা।

readymade garments business। আজ গান লেখা হল, কাল সুর, পরশু রেকর্ডিং।' সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় আরেক দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছেন: 'তখন কোনো arranger থাকতেন না। সুরকারই সব ঠিক করতেন গানের প্রিল্যুড, ইণ্টারল্যুড। কার গানে, কি গানে, কোন্ যন্ত্র বাজবে বা না বাজবে সে ব্যাপারেও সুরকার ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্যরাও চিন্তাভাবনা করতেন। যেমন আমার tonal quality-র সঙ্গে বাঁশির আওয়াজ clash করে বলে আমার গানের সঙ্গে বাঁশি বাজে না। সে সময় কয়েকজন সুরকারকে দেখেছি short hand-এর notation করে নিতেন।...আর এইভাবেই ভাল গান তৈরি হত।' ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য বলেন: 'আগে আমাদের সময়ে তিন মিনিটের রেকর্ডে প্রিল্যুড ইণ্ট্যারল্যুড মিলিয়ে আধ মিনিট যন্ত্র থাকত বাকিটুকু গান। সম্প্রতি ঠিক তার উল্টো। তখন ছিল গান-বাজনা আর এখন হয়েছে বাজনা-গান।' সতীনাথ মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন: 'আজ থেকে বিশ ত্রিশ বছর আগে গীতিকার সুরকার বা শিল্পীর ওপর রেকর্ডিং কোম্পানির কর্ণধারদের কোনো খবরদারি ছিল না কিন্তু ইদানীংকালে পপ্ মিউজিক যখন বেশ জাঁকিয়ে বসেছে সে-সময়ে রেকর্ডিং কোম্পানী গীতিকার সুরকার শিল্পী-দের বিশেষ নির্দেশ দিচ্ছেন যে এমন গান করুন যা বাজারে ভাল বিক্রি হবে।' মান্না দে মনে করেন 'কোয়ানটিটি ভয়ানক বেড়ে গেছে।...বারো চোদ্দটার মধ্যে মাত্র দু-তিনটে ভাল হচ্ছে। আর এই বারো চোদ্দটা গান এসব তো হয়েছে রেকর্ডিং কোম্পানিগুলোরই কথায়। খানকতক গান ভরে দিতে পারলেই হল। আর শ্রোতারাও বোধহয় তাই চাইছে।' প্রবীর মজুমদারের মতে: (আগেকার গানে) 'কথা অনেক কাব্যধর্মী ছিল...সুরকাররা সুরও করতেন সেইমত। পরিশ্রম করে মাথা খাটিয়ে।...আর সুরে ছিল অফুরন্ত মেলডি।'

## ৩

এইবার তাহলে আধুনিক বাংলা গানের মূল সমস্যায় এসে পড়ি আমরা। এই গান কাদের জন্য? এই গানের এখনকার রচয়িতা-সুরকার-শিল্পী কে? এই গানের সম্প্রচার, বিপণন এবং সমৃদ্ধিদানের সুষ্ঠু উপায় কি?

একটা কথা প্রথমেই স্পষ্ট হয়ে যাক যে, পুরনো ঐতিহ্যসম্পন্ন গানের চর্চা ও প্রচার করলে আধুনিক গানের ভবিষ্যৎ ধূসরই হবে ক্রমশ। যোগ্য শিল্পীরা যদি কেবলই আধুনিক গানের ক্ষেত্র ছেড়ে অন্যধরনের গানে মন দেন তবে অপকৃষ্ট শিল্পীরাই ভিড় জমাবেন সেখানে। ঠিক এই মুহূর্তে আধুনিক গানের প্রতিষ্ঠিত ও

সম্ভাব্য শিল্পীদের অবস্থান ও ভূমিকা জেনে নিলে সংকটের স্বরূপ বোঝা যাবে। ধনঞ্জয় ও মান্না ষাট বছর পেরিয়েছেন। হেমন্ত, শ্যামল মিত্র ও অখিলবন্ধু ঘোষ প্রয়াত। ধনঞ্জয় মূলত গান শ্যামাসংগীত, মান্না পুজোতে কিছু আধুনিক গান রেকর্ড করেন। তরুণ-দ্বিজেন-পিণ্টু-ভূপেন হাজারিকার কাছে নতুন প্রত্যাশা নেই। মানবেন্দ্র-অনুপ-সুকুমার মিত্র পাকাপাকি নজরুলগীতিতে আশ্রয় নিয়েছেন। সন্ধ্যা ও আরতি পুজোতে রেকর্ড করেন। সতীনাথ-উৎপলা-প্রতিমা-নির্মলা-মাধুরী-শ্রাবন্তী ম্লান। আধুনিক গানের শিল্পী বললে এখন বোঝায় জটিলেশ্বর, সুধীন সরকার, শিবাজী, বনশ্রী, হৈমন্তী, অরুন্ধতী ও শ্রীরাধা। শৈলেন মুখোপাধ্যায় ও সুধীন দাশগুপ্তের অকালপ্রয়াণে আধুনিক গানের সুষ্ঠু নির্মিতিতে একটা বিরাট শূন্যতা তৈরি হয়েছে। ক্লান্ত সলিল চৌধুরীর কথা ও সুর নতুন করে আর কি প্রত্যাশা জাগাবে? অভিজিৎ, অনল ও প্রবীর মজুমদার সামর্থ্যের শেষ সীমায়। শ্যামল গুপ্ত, পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত বাণী একঘেয়ে। গৌরীপ্রসন্ন প্রয়াত হয়েছেন। এখন সুরকার বলতে কিছু ভাবনার পরিচয় রাখছেন জটিলেশ্বর, অনল, অশোক রায়, দিনেন্দ্র চৌধুরী, অজয় দাস ও নীতা সেন। নিজের চলচ্চিত্রের গানে চমৎকার বাণী ও সুর করেন সত্যজিৎ রায়। কোনো অজ্ঞাত কারণে তাঁর সঙ্গে আধুনিক গানের তেমন সংযোগ নেই।

কিন্তু বাংলা গান থেমে নেই। অনেক সদ্য-চালু রেকর্ড কোম্পানি নতুন নতুন রেকর্ড বার করছেন। এখন টাকা খরচ করতে পারলে যে-কেউ রেকর্ড শিল্পী হতে পারেন। আকাশবাণী কলকাতা-কার্সিয়াং-শিলিগুড়ি সারাদিনে অনেক রকমের বাংলা গান পরিবেশন করেন। বোম্বাইয়ের শিল্পীসমন্বয়ে বছরে কিছু বাংলা গান বাজারে হিট করে এখনও। রাহুল-আশার কিংবা স্বপন চক্রবর্তীর তৈরি সেই গানের যোগ বড় চমৎকার কৃৎকৌশলে তৈরি করা হয়। বাপ্পী লাহিড়ী কিংবা রবীন্দ্র জৈন মাঝে-মাঝে আধুনিক বাংলা গানে সুর দেবার বিলাসিতা করেন।

এলোমেলো এই সমস্যার গভীরে যাবার আগে বাংলা গানের নৈমিত্তিক চাহিদা ও যোগান সম্পর্কে আমাদের কিছুটা ধারণা থাকা ভাল। চাহিদা আছে দেশাত্মবোধক গান ও গণসংগীতের। উভয়ক্ষেত্রে পুরনো গানে কোনোরকমে কাজ চলছে। রবীন্দ্রনাথের পর এমন কোনো জনপ্রিয় গীতিনাট্য বা রঙ্গনাট্য হয়নি যা মানুষ গাইবে। সাধারণ রঙ্গমঞ্চে গিরিশচন্দ্র-ক্ষীরোদপ্রসাদ-দ্বিজেন্দ্রলালের পর তিনের দশকে কেউ কেউ (যেমন হেমেন্দ্রকুমার রায়) এমন নাট্যসংগীত তৈরি করেছিলেন যা মঞ্চের

বাইরেও বাঙালী শ্রোতা শুনতে চেয়েছেন। আমাদের পুরো গণনাট্য-নবনাট্য-অন্য নাটকের গান আটকে থাকল গ্রুপ থিয়েটারের ক্ষুদ্র বলয়ে। তা ছড়িয়ে পড়ল না। উৎসব-অনুষ্ঠান-সম্বর্ধনা-বিদায়গীতি ইত্যাদি উপলক্ষে এখন আর গান রচনা হয় না। রবীন্দ্রনাথ বা অতুলপ্রসাদের গানে সে কাজ মিটে যায়। এইভাবেই দৈনন্দিন চলমান জীবনের উৎসমুখ থেকে গানের নব সম্ভাবনা বিলীন হয়ে যাচ্ছে। সবচেয়ে বড় অচলতা দেখা দিয়েছে শ্রোতাদের চাহিদার ক্ষেত্রে, প্রত্যাশার দিক থেকে।

এই কথাটা ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে আধুনিক সংস্কৃতি-জগতের সঙ্গে নতুন বাংলা গানের একটা গূঢ় বিচ্ছেদ ঘটে গেছে। আধুনিক বাঙালী শ্রোতা তাঁর নিজের সমসময়ের গানে খুব বড় রকমের প্রত্যাশা রাখেন না। পাঁচ ও ছয় দশকে আধুনিক গান আগ্রহে ও ব্যগ্রতায় যতখানি মন ও শ্রুতি ভরিয়েছিল আজ তার সিকি ভাগ সম্ভাবনা নেই। এখানে তাই খেদের সঙ্গে সেই পুরনো কথাটাই বলতে হয়: 'একাকী গায়কের নহে তো গান গাহিতে হবে দুইজনে'। সেই বিচারে আমরা অপরাধী হয়ে থাকছি, কেননা শ্রোতার দায় আমরা নিচ্ছি না তেমন করে। অপরাধটা গুরুতর এই কারণে যে বাংলার অন্যতর কলাবিদ্যার ক্ষেত্রে বাঙালী এতটা নিরুত্তাপ ও অনাগ্রহী নয়। বাংলার এখনকার চলচ্চিত্র, নাটক, চিত্রকলা, সাহিত্য ও ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে আমরা অতিসাম্প্রতিক বিষয় সম্পর্কে আগ্রহী, উৎসাহী এমনকি তর্কমুখর। শিক্ষার যথার্থ ভাষা-মাধ্যম বাংলা না ইংরাজী তা নিয়ে আমাদের সভাসমিতি ও সংবাদপত্র উত্তাল। কলকাতার পার্কে ময়দানে প্রতিষ্ঠিত সাম্প্রতিক মনীষী-মূর্তিগুলি শিল্প না পুতুল তা নিয়ে তর্কের শেষ নেই। রবীন্দ্রসংগীতের স্বরলিপি ও তাতে হার্মোনিয়াম ব্যবহার নিয়ে যুযুধান লড়াই তো আমাদের খুব রোচক। কলকাতা দূরদর্শন কর্তৃপক্ষের অদূরদর্শিতা নিয়ে মিঠেকড়া মন্তব্য কাগজে বেরোয়। বিভিন্ন সাহিত্য পুরস্কারের নেপথ্যের নাট্য বিষয়ে বাঙালীর কৌতূহল বিস্ময়কর রকমের তরতাজা। কিন্তু আধুনিক বাংলা গান নিয়ে কারুর কোনো তাপ উত্তাপ নেই। তার গায়ে আমরা দেগে দিয়েছি মানহীনতার এক অমার্জনীয় কলঙ্ক। যেন তা আমাদের সংস্কৃতির বাইরে—অচ্ছুৎ ও অনাদরের সামগ্রী। বাংলা গানের সর্বাধুনিক সরণি তাই আর বহতা নেই, কানাগলিতে তা অবরুদ্ধ।

তাই আমাদের সদ্যতন গানের বাণীর অবনতি, ভাবগত অকিঞ্চিৎকরতা, গায়নের নিম্নমান বা তালবাদ্যের অতিরেক আজ আমাদের আলোচ্য হয়ে ওঠে না। সংগীত সমালোচকদের কাজ আজ শুধু নির্বিচার নিন্দা করা। অথচ পশ্চিমবঙ্গেই প্রতিদিন

কত গান প্রয়োজনে সৃষ্ট হয় এবং সরকারি কর্তৃপক্ষ তার জন্যে কত সহস্র টাকা ব্যয় করেন তার কি সামান্য খবরও আমরা রাখি? রাখি না যে তা বোঝা গেল একটি বই থেকে। আকাশবাণীর উচ্চ পদাধিকারী ও গীতিকার-সুরকার শ্রীঅমলেন্দুবিকাশ করচৌধুরী তাঁর বইতে লিখেছেন ('বাংলা গানের কথার কথা' ১৯৮৬):

> প্রতিদিনকার জন্য উভয় বাংলায় ১০০ গান কমপক্ষে, মাসে ৩০০০ হাজার, বছরে ৩৬০০০ গানের প্রয়োজন তা মেটাবে কে? শুধুমাত্র গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার, পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্যামল গুপ্ত বা সলিল চৌধুরী প্রমুখ গীতিকারের সাহায্যে তো আর সেই চাহিদার পূরণ সম্ভব নয়। কাজেই অনিবার্যভাবেই আগাছার মতো কিছু গান রচিত হচ্ছে এবং হবেও।

এখানে অবশ্য একটি কথা অনুক্ত থাকলো। অমলেন্দুবাবু জানালেন না যে, আকাশবাণীতে কোনো গীতিকারের গান সম্প্রচারিত হলেগীতিকার পান প্রতিবারের সম্প্রচার বাবদ উর্ধ্বপক্ষে মাত্র দু টাকা। কাজেই প্রশ্ন উঠবে ঐ সম্মানমূল্যে শ্যামল গুপ্তরা কেন গান লিখবেন এবং আগাছারাই বা কেন শুধু লিখবেন না?

কিন্তু কী সেই সব গান যা আকাশবাণীতে নিত্যপূজায় লাগে? সেগুলির গালভরা নাম: 'সংগীতালেখ্য'র গান, 'সমূহকণ্ঠের' গান, 'বৃন্দ গান', 'দেশ বন্দনা', 'সুগম সংগীত', 'সংগীতাঞ্জলি', 'রম্যগীতি', 'এমাসের গান' ইত্যাদি। এ ছাড়াও আছে সরাসরি আধুনিক বাংলা গান।

প্রসঙ্গক্রমে অমলেন্দু বিকাশের বই থেকে আকাশবাণীর আত্মপক্ষ কিছুটা শোনা যেতে পারে:

> সরবরাহের চাইতে চাহিদা বেড়ে যাওয়াও বাংলা গানের দুর্দিনের আরেক কারণ। আগে যেখানে দুই চারজন খ্যাতিমান গীতরচয়িতা গান লিখতেন সেখানে এসে গেলেন কয়েক শত গীতিকার। স্বাভাবিক ভাবেই গীতিকবিতার মান খানিকটা নেমে যেতে বাধ্য হলো। শুধু তাই নয় শ্রোতাদের চাহিদা ও রুচির মানও এইজন্য দায়ী এবং সেই সঙ্গে সুরকারদের ভূমিকাও।
>
> বেতারে প্রতিদিন এবং প্রতিমাসে যে অসংখ্য বাংলা গানের প্রয়োজন হয় তা মেটাতে অসংখ্য উন্নতশ্রেণীর গীতরচনা সম্ভব নয়। বেতারে রুচিহীন অথবা অশ্লীল গান যাতে প্রচার না হয় সেইদিকেই যথেষ্ট দৃষ্টি দেওয়া হয়ে থাকে। বস্তুত পক্ষে, বলা যায় বেতার ছাড়া অন্যান্য প্রচার

> মাধ্যম যেখানে লঘু জনচিত্তের চাহিদা অনুযায়ী গান রচনা ও প্রযোজনা করে প্রচার করে থাকে, বেতার বরং সেই গানগুলি যাতে প্রচারিত না হতে পারে তার জন্য বিশেষ নির্বাচনী বা screening ব্যবস্থার আশ্রয় নিয়ে থাকে। জনরুচি গঠন করার মহান দায়িত্ব এবং তাকে সুন্দর ও সার্থক করার চেষ্টা বেতারের বিশেষ নির্বাচনী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ অধিকাংশ গানের মধ্যেই পাওয়া যাবে। যদিও প্রতিদিন শিল্পীরা নিজে থেকে যেসব গান নির্বাচন করে গেয়ে থাকেন তার দায়িত্ব অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁদের।

অমলেন্দুবিকাশ করচৌধুরীর বক্তব্যের অন্তঃসারশূন্যতা বড় প্রকট। প্রথমত, তিনি বেতারে গানের মান অবনয়নের ব্যাপারে শ্রোতাদের রুচি ও চাহিদার কথা তুলে হতবাক করে দেন। বেতারের গান কি বিক্রয়যোগ্য ভোগপণ্য যে তাতে শ্রোতাদের আবদার খাটবে? দ্বিতীয়ত, তাঁর মতে বেতারে লঘু জনচিত্তের উপযোগী অন্য মাধ্যমের গান (অর্থাৎ রেকর্ড ও চলচ্চিত্রের গান) প্রচারিত হয় না অথবা screening করে হয়। কথাটা ঠিক নয় কারণ বেতারে বহু নিম্নরুচির রেকর্ড প্রচারিত হয় এবং ছায়াছবির গানের আসরে বহু নিম্নরুচির গান বাজে। আর সত্যি বলতে কি, বেতারের নিজস্ব পরিকল্পনার অনুষ্ঠানের চেয়ে 'অনুরোধের আসর', 'ছায়াছবির গান' বা 'হারানো দিনের গান' শ্রোতাদের কাছে অনেক বেশি জনপ্রিয়। তৃতীয়ত, দেখা যাচ্ছে নির্বাচনী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ গান করাই বেতারের সাধারণ বিধি কিন্তু শিল্পী যদি তার বাইরে 'নিজে থেকে নির্বাচন করে' (অর্থাৎ জনরুচি ও চাহিদার বশে, যা বেতারে অচল) কোনো গান করেন তবে তার দায়িত্ব শিল্পীর। তাহলে বেতারের এই screening-এর আদিখ্যেতা কেন?

অবশ্য সাফাই গেয়ে শ্রীকরচৌধুরী বলেন শেষমেষ:

> শিল্পীর, গীতিকার ও সুরকারের গীতরচনা, সুর-সংযোজনা এবং পরিবেশনা সম্পূর্ণ স্বাধীনতাকে স্বীকার করেই প্রচার মাধ্যম হিসেবে বেতারের পক্ষে বাংলা গানের ক্রমবিকাশ ও উন্নতরূপ পরিবেশন করা যতখানি সম্ভব, বেতার তাই করে আসছে।

তাহলে কথাটা দাঁড়ালো কি? বেতার মাধ্যম সবাইকে অবাধ স্বাধীনতা দিয়েই শেষ পর্যন্ত কিন্তু বাংলা গানে প্রার্থিত উচ্চ-মান আনতে পারেন না। এ ব্যাপারে খেদ প্রকাশ করে বর্ষীয়ান সংগীততাত্ত্বিক শ্রীরাজ্যেশ্বর মিত্র লিখেছেন:

> সঙ্গীত-বিষয়ে লোকরুচিকে সব দিক থেকে উন্নত এবং উৎকৃষ্ট করবার সুযোগ

একমাত্র আকাশবাণীরই থাকবার কথা, কেননা এই প্রতিষ্ঠান ব্যবসায়ের সঙ্গে যুক্ত নয়, এবং একটি বলিষ্ঠ নীতি অবলম্বন করবার মতো ক্ষমতা বা স্বাধীনতাও এই প্রতিষ্ঠানের আছে। আমাদের আশা ছিল আকাশবাণী এই সুযোগ পুরোপুরি গ্রহণ করবেন, কিন্তু সে দিক থেকে আজ পর্যন্ত কোনও সম্ভাবনা দেখা যায়নি। আকাশবাণী ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলির নীতিই অবলম্বন করেছেন। বস্তুত এ ক্ষেত্রে আকাশবাণী ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানসমূহকে সম্যকভাবে অনুসরণ করছেন বললে অত্যুক্তি হয় না।

আকাশবাণী সম্পর্কে রাজ্যেশ্বরবাবুর ক্ষোভ অনেকটাই নরম মনে হয়, কেননা লক্ষ করলে দেখা যায়, 'আকাশবাণী' ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলিকেও সম্যক অনুসরণ করেন না। বস্তুত সংগীত প্রচারের ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান তাঁদের বিপণনের স্বার্থে অনেক ঝুঁকি নেন ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন, আকাশবাণী সেটুকুও করেন না। আমাদের মনে থাকে যে বিভিন্ন গ্রামোফোন কোম্পানি সম্প্রতি নজরুলগীতির পুনরুত্থানে খুব শ্রদ্ধেয় কাজ করেছেন। দ্বিজেন্দ্রলাল ও রজনীকান্তের গানের প্রচারে তাঁদের কৃতি সাধুবাদযোগ্য। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের গান, উপাসনার গান, আরাধনার গান, কৃষ্ণচন্দ্র দের পদাবলী কীর্তন, সলিল চৌধুরীর গণসংগীত তাঁরা দীর্ঘবাদন রেকর্ডে প্রকাশ করে আমাদের ঋণী করেছেন। রামকুমার চট্টোপাধ্যায়কে দিয়ে রেকর্ডে পুরাতনী গানের ধারাবাহিক পুনঃপ্রচার খুব বড় মাপের কাজ। দিলীপকুমার, ভীষ্মদেব-গীত নানা গান এবং হিমাংশু দত্ত সুরারোপিত গানের রেকর্ড সম্ভার আমাদের গর্ব করার মতো সঞ্চয়। সত্যতন রবীন্দ্রগীতির বিন্যস্ত সম্পূট 'গানের সুরের ধারা' তো এক যুগান্তকারী পরিকল্পনা। তার পাশে আকাশবাণী কি করছেন? তাঁদের টেপ লাইব্রেরি কি সেভাবে ব্যবহৃত হয়? সংগীত-গবেষকরা আকাশবাণীর অবেক্ষাগারে কোনো পুরনো সামগ্রী পেতে পারবেন কি? এখনকার বেশিরভাগ অনুষ্ঠান তাঁরা বহুব্যবহৃত ইমালসনহীন জীর্ণ টেপে ধরে রাখছেন এ খবর কি সত্য নয়? রাজ্যেশ্বর মিত্র তাই তাঁর অভিযোগের ধারাবাহিকতায় ঠিকই বলেন যে :

রাজনীতির দিক থেকে যাঁদের তৎপরতা অপরিসীম তাঁরা ইচ্ছা করলে ললিত কলার দিকে কোনও বৈশিষ্ট্য স্থাপন করতে পারেন না, এটা নির্ভরযোগ্য যুক্তি নয়। আকাশবাণীর প্রধান উদ্দেশ্য রাজনৈতিক প্রচার, সংস্কৃতি তাঁদের পরিকল্পনায় নিতান্তই গৌণস্থান অধিকার করে, এ কথা আমাদের উপলব্ধিগত সত্য। আধুনিক বাংলা কাব্যসংগীতকে মনোরম

করে তোলবার মতো কোনও চেষ্টাও এঁদের তরফ থেকে দেখা যায়নি, এমনকি এ বিষয়ে এঁদের কোনও নীতি আছে কিনা তাও সন্দেহ।

আকাশবাণী সম্পর্কে তবু আমরা কিছু তর্ক বা সমালোচনা করতে পারি কিন্তু কলকাতার দূরদর্শন কর্তৃপক্ষ সে সবেরও উর্ধ্বে, যেহেতু আধুনিক বাংলা গান ও তার নবনির্মাণবিষয়ে তাঁদের কোনো পরিকল্পনাই নেই। অন্যদিকে তথ্যহিসাবে এমন কথাও জানা যায় যে, কলকাতার কোনো কোনো গণ্যমান্য লোকজন আকাশবাণীকে প্রস্তাব দিয়েছিলেন আধুনিক গান বর্জন কবতে। এ-প্রস্তাব সব দিক থেকেই আত্মপ্রতারণার চরম উদাহরণ। গঠনমূলক চিন্তাভাবনার বদলে এমন বিধ্বংসী প্রয়াস গড়ে তুলবে স্ববিরোধের আবহাওয়া।

আর একটা দিক আমাদের জানা দরকার। এতদিন আমরা কেবল বেতার কর্তৃপক্ষ, শ্রোতা ও সমালোচকের প্রতিক্রিয়ার মূল্য দিয়েছি। কেন ভালো বাংলা গান হয় না তার জন্য গীতিকারদের মন্দপ্রতিভার কথাও জেনেছি। কিন্তু বেতার শিল্পীর বাস্তব সমস্যা সম্পর্কে বোধহয় আমরা তেমন ওয়াকিবহাল হইনি। সে ব্যাপারে অনুসন্ধান করতে গিয়ে তথ্যহিসাবে জানা যায় বর্তমানে বেতারে প্রোগ্রাম করতে গিয়ে আধুনিক গানের শিল্পী অসহায় বোধ করছেন। কয়েকবছর আগেও বেতারে সরাসরি লাইভ ব্রডকাস্ট হতো এবং সহযোগী যন্ত্রীদল ছিলেন কনট্র্যাক্ট সার্ভিসের কর্মী। ফলে শিল্পী ও যন্ত্রীদলের থাকতো সময়সচেতনতা ও সম্ভাব্য উৎকণ্ঠা। অনুষ্ঠান সম্প্রচারের আগে চলতো দীর্ঘক্ষণের মহড়া। সরাসরি যাতে অনুষ্ঠানটি প্রাণবন্ত হয় তার জন্য থাকতো প্রবল আন্তরিকতা। এখন এসেছে নিষ্প্রাণ টেপের যুগ, ফলে কোনো আতন্তি নেই, উত্তেজনা নেই। আর সহযোগী যন্ত্রীদলের ভূমিকা? শ্রীদিনেন্দ্র চৌধুরী জানিয়েছেন তাঁর নিবন্ধে :

> ষাট দশকের আগে যন্ত্রীরা কনট্র্যাকট সারভিসের মাধ্যমে নিযুক্ত হতেন। সারভিস রেকর্ড সন্তোষজনক না হলে বা কাজে যোগ্যতা প্রকাশে অসমর্থ হলে চুক্তিপত্র নবীকরণে কিছু বাধা-নিষেধের ব্যবস্থা ছিল। কর্মীরা তাই নিষ্ঠা-প্রদর্শনে তৎপর থাকতেন। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী যখন বেতার-মন্ত্রী ছিলেন, এঁদের নিয়োগ ব্যবস্থাটি কনট্র্যাকটের বদলে পাকা করে নেওয়া হয়। এঁরাও ভয়শূন্য মনে আর পাঁচটা সরকারি দপ্তরের আদর্শ অনুসরণ করে দিনগত পাপক্ষয় নীতিতেই সচেষ্ট হলেন। তাই একদিকে গলা, অন্যদিকে বে-ঘাটে হাত পড়া যন্ত্রের বেসুরো আর্তনাদ আর তবলার আক্রমণে শিল্পীরা পর্যুদস্ত হতে লাগলেন।

শিল্পী-সংখ্যা অনুযায়ী যন্ত্রী সংখ্যা অপ্রতুল তাই শিল্পীর হাতে হারমোনিয়াম দেওয়া হল। হারমোনিয়াম হাতে আসতে বহু যন্ত্রের সহযোগিতা থেকে শিল্পীকে বঞ্চিত হতে হল। অ্যালটমেণ্ট চার্টে কিন্তু বহু সহযোগীর নামই নথিভুক্ত থাকতে দেখা যায়। যন্ত্রীরা তার তোয়াক্কা করেন বলে মনে হয় না।

এসব প্রতিবন্ধকতা পেরিয়ে শিল্পীর মানসিক ভারসাম্য এবং গান পরিবেশনের মান উন্নত থাকতে পারে না। সুরে তালে যন্ত্রানুষঙ্গে তাই দুঃসাহসিক নিরীক্ষা দূরে থাক শিল্পীরা প্রাণ বাঁচাতে প্রাণান্ত হন। তাই তখন তাঁদের রক্ষাকবচ হয় সহজ সুরে ও সহজ তালে-ভরা মধ্য লয়ে নিবদ্ধ কোনো গান। তাতে সব দিক রক্ষা হয় কিন্তু বাংলা গান হারায় তার আকর্ষণ ও সম্মোহ।

তাহলে বোঝা গেল বাংলা গানের পুনরুজ্জীবনে আকাশবাণী সঠিক পথ নিতে পারেননি উপরন্তু সেখানে গড়ে উঠেছে একটা প্রতিবন্ধী পরিবেশ। অনুসন্ধানে জানা যায় কোনো ব্যক্তি যদি পঁচিশখানি গান পেশ করেন এবং বেতারের নির্বাচক-মণ্ডলী যদি সেই গান অনুমোদন করেন তবে সেই ব্যক্তি বেতারের পঞ্জীভুক্ত গীতিকাররূপে গণ্য হন। অতঃপর তাঁর লেখা গান বেতারে যে কোনো শিল্পী পরিবেশন করতে পারেন। এইভাবেই কয়েকশো গীতিকার বেতারের নানা রকমের গান লেখার সুযোগ পান। তাঁদেব রচনার কিছু নমুনা এখানে পেশ করা চলে।

১ নিভে গেল দীপ কেন মেঘ ঢাকে চাঁদ
কেন কেন তবে ঝরে গেল ফুল
এই পথ চাওয়া এ যেন ভুল।

২ হয়তো অশনি কখনো শকুনি পাশা
দধীচি পাঁজর লুটায় মুখর লোভে
তবুও সে দান বজ্রে মহান হবে।

৩ রূপের হাটে রূপোর কাঁকন হারিয়ে গেছে কোথায়!
কে তা জানে কে তা জানে বল কে তা জানে।
হাত বাড়িয়ে রূপসী তাই খুঁজে বেড়ায়
খুঁজে বেড়ায় এখানে ওখানে।

৪ সবুজ অবুঝ ওই চা-পাতার গালিচা
তোমার পাশে দেখো ঝরনার আয়না।

৫ এলো রে শীতের বেলা বহে যায় সুসময়

রাখ তোরা আর নয় সারা দিনমান মিছে খেলা।

গানগুলি সংগ্রহ করেছি শ্রীকরচৌধুরীর 'বাংলা গানের কথার কথা' বই থেকে। তাঁর ভাষ্য অনুযায়ী প্রথম তিনখানি প্রচারিত হয়েছে 'বিশেষভাবে প্রস্তুত "এ মাসের গান" জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ' অনুষ্ঠানে, যেখানে তাঁর মতে, 'সকলের মনোরঞ্জনে সমর্থ না হলেও একেবারে মানবিহীন sub standard এবং অপসংস্কৃতির সামান্যতম ছোঁয়া থাকলেও সেই ধরনের গান আকাশবাণীর সংগীত দপ্তর থেকে অনুমোদন পাবার কোনোরকম সম্ভাবনা থাকে না।' বাকি দুটি গান শিলিগুড়ি থেকে 'অঞ্জলি' অনুষ্ঠানে প্রচারিত এবং এই গান 'বিশেষ নির্বাচনী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ'। মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। তবে সাধারণ পাঠক জানুন বেতার কর্তৃপক্ষ বাংলা গানকে উচ্চমানবিশিষ্ট করতে ও অপসংস্কৃতিমুক্ত রাখতে কত সতর্ক ও অধ্যবসায়ী। এসব জেনে বিশেষ নির্বাচনী পরীক্ষার পরীক্ষকদের নাম জানতে লোভ হয়!

শ্রীদিনেন্দ্র চৌধুরী আরেকটা নেপথ্য সংবাদ ফাঁস করে দিয়েছেন। তাঁর মতে:

> মজার কথা, প্রচারকালে গীতরচয়িতার নাম ঘোষিত হওয়ার জন্য এনলিস্টমেনটের তালিকাটি দিন দিন দীর্ঘতর হচ্ছে। রেডিও কর্মীরা অনেকেই তাঁদের নাম সহজেই তালিকাভুক্ত করিয়ে নিয়েছেন।...এর ফলে শিল্পীরা বেসিক ডিসকের গানেও এঁদের রচিত বা সুর-করা গান রাখা উচিত মনে করছেন, তাতে যদি অনুরোধের আসরে কিংবা বাঙলা গানের অন্য কোনো 'চান্সে' গানগুলি একটু বেশি বার বাজে! বাস্তবে ঘটছেও তাই।

এই বারে বোঝা গেল বেতারের রেকর্ড অনুষ্ঠানে কেন অমন স্বৈরনির্বাচন ঘটে!

৪

সামগ্রিকভাবে আধুনিক বাংলা গানের নির্মাণের সঙ্গে প্রধানত যাঁরা জড়িত তাঁদের সম্পর্কেও প্রশ্ন আছে। প্রশ্ন তাঁদের যোগ্যতা বিষয়ে, কাজের পদ্ধতি সম্পর্কে এমনকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাঁদের সংগীতজ্ঞান নিয়েও। শ্রীজগন্ময় মিত্রের মতো প্রবীণ ও বহুদর্শী ব্যক্তি মনে করেন:

> এখন যা পরিস্থিতি তাতে দেখছি রেডিও বা রেকর্ডিং কোম্পানিতে আনুষঙ্গিক কাজের দায়িত্বে যাঁরা আছেন তাঁদের বেশির ভাগেরই সংগীত সম্পর্কে জ্ঞান অত্যন্ত সীমিত, অভিজ্ঞতাও কম। কিন্তু খুঁটির জোরে

চাকরি পেয়ে বড় বড় পদে আসীন আর তাঁরা নিজেদের গণ্ডির লোকেদেরই সুযোগ দিচ্ছেন। যাঁরা সবসময়ে তাঁদের আশেপাশে ঘুর ঘুর করছেন তাঁরাই পাচ্ছেন বেশি সুযোগ। যাঁরা প্রকৃত শিল্পী তাঁরা এইভাবে 'দাও দাও' বলে ঘুরে বেড়াবেন না। আর যাঁরা বড় পদে আছেন তাঁরাও সম্মানের দোহাই দিয়ে অনতিপরিচিত অথচ সুযোগ্য শিল্পীর কাছে যাচ্ছেন না। কিন্তু আগে গ্রামোফোন কোম্পানির হেম সোম, হিন্দুস্থানের যামিনী মতিলাল বা মেগাফোনের জ্ঞান ঘোষ কত নতুন নতুন শিল্পীকে খুঁজে বার করেছেন…নিজের পদের সম্মানের কথা কখনও ভাবেননি। এখনকার উচ্চ পদাধিকারীরা কোনোরকম শ্রম স্বীকার করেন না, তাঁদের আভিজাত্যে লাগে। আর তাঁরা বিশেষ কিছু না জেনেও মনে করেন সব জানেন।

শ্রীমতী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় এখনকার গানের জগৎ সম্পর্কে আরেক রকমের অভিযোগ এনে বলেছেন :

এখন সবাই অতিমাত্রায় ব্যস্ত। এখন সংগীত পরিচালনা বা সুরসৃষ্টি না বলে সংগীতের ঠিকাদারী বলা উচিত। ইনস্ট্যাণ্ট কফির মতো ইনস্ট্যাণ্ট গান তৈরি হচ্ছে।…নতুন যাঁরা আসছেন তাঁদের বেশিরভাগই কোনো দিক থেকেই তৈরি হয়ে আসছেন না, ব্যক্তিগত নৈপুণ্যও নেই, নেই ভাল কিছু করবার দৃঢ় অঙ্গীকার।…আগের সেই হৃদ্য পরিবেশও আর নেই।

শ্রীসতীনাথ মুখোপাধ্যায়ও প্রায় সহমত পোষণ করেন জগন্ময় বা সন্ধ্যার বক্তব্যের সঙ্গে। উপরন্তু তাঁর অনুযোগ এই যে, বেতারে অনুরোধের আসরে এখন অনেক অজানা অচেনা শিল্পীর গান বাজানো হয় যাঁদের অনেকেই তেমন যোগ্য নন। 'তাঁরাই সুযোগ পাচ্ছেন যাঁরা সুযোগসন্ধানী, যোগাযোগ আছে খুব, অথচ ততটা যোগ্য নন। যোগ্য লোক সুযোগের অভাবে হারিয়ে যাচ্ছেন।…নতুন শিল্পীরা দেখছে অল্প আয়াসেই, কিছু পয়সা খরচ করলেই রেকর্ড হচ্ছে, তা রেডিওতে বাজছে, তাছাড়া কিছুটা শিখতে না শিখতেই ফাংশান করার জন্য তারা অধীর।'

এখনকার গান সম্পর্কে সংগীতকার শ্রীপ্রবীর মজুমদার অন্য একটি দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এইভাবে যে :

এখন যাঁরা সুর করতে আসছেন, করছেন, তাঁদের সংগীতজ্ঞান হয়ত পরিমিত আর বিভিন্ন যন্ত্রের ব্যবহার সম্পর্কেও তাঁরা তেমন ওয়াকিবহাল

নন। সেই কারণেই হয়ত arranger-দের ওপর তাঁরা নির্ভর করছেন। কিংবা তাঁরা বেশি পরিশ্রম করতে চাইছেন না।··· এখন গানে মেলডির চেয়ে হাজার রকম যন্ত্রই মুখ্য। যন্ত্রের ব্যবহারে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় প্রায় নেই বললেই চলে। একটা হট্টগোল যেন। পরিমিতিবোধের একান্ত অভাব। এখন সুরের ওপর কথা বসানো হতে লাগল, বলা ভাল যন্ত্রের ওপর বসানো হল। এক কথায় গান হয়ে গেল যান্ত্রিক। হিন্দি গানের প্রভাব পড়ল খারাপভাবে, পাশ্চাত্য নানা সংগীতরীতিকেও ব্যবহার করা হল বিকৃতভাবে।

শুধু তাই নয়, প্রবীর মজুমদার আধুনিক গানের সম্প্রতন শিল্পীদের সম্পর্কে কিছু আলাদা বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত করেছেন :

গায়ক-গায়িকাদের ক্ষেত্রে হয়েছে কী, ফাংশানই তাঁদের প্রধান জীবিকা। রেকর্ডে গাওয়ার সময়ে যতটা concentration থাকে, যতটা নিষ্ঠা থাকে, ফাংশানে গাওয়ার সময় তা আর থাকছে না। ফাংশানে গাইতে গাইতে একটা কৃত্রিমতা এইভাবে শিল্পীদের মধ্যে তৈরি হচ্ছে।··· চিন্তাভাবনা নেই। কোন স্কেলে কোন গান গাইলে ভাল হবে সে সম্পর্কেও বিশেষ কোনো স্বচ্ছ ধারণাই নেই এখনকার বেশিরভাগ শিল্পীদের। সব সময় চড়া পর্দায় গান গাইতে চায় ফাংশানের কথা ভেবে। এতে গানের মাধুর্য নষ্ট হয়, চড়া গলা অতিরিক্ত তীক্ষ্ণ কর্কশ শোনায়। আর আগে রেকর্ডিং কোম্পানির পুরো দায়িত্ব ছিল রেকর্ডের ব্যাপারে। এখন কোম্পানি নিষ্ক্রিয়, শিল্পীরাই সব। ফাংশানে কোনটা চলবে সেই ভেবে শিল্পীরা গান বাছছেন।

এতজন অভিজ্ঞ ব্যক্তির মতামতের সার সংকলন করলে বোঝা যায়, এখনকার গান-নির্মাণ আর সম্প্রচারের সমস্যা বহুমাত্রিক ও জটিল। ফাংশানকেন্দ্রিক জীবিকার টানে গানের চারিত্র্য নষ্ট হচ্ছে অনেকটাই। তার ছাপ পড়ছে রেকর্ডের গানে। অথচ এখনকার ফাংশানে উচ্চমানের গান শোনবার শ্রোতা কম। বেশিরভাগ চায় হুল্লোড়বাজী আর দাপাদাপি। নষ্টভ্রষ্ট যুবক-যুবতী, অর্ধশিক্ষিত রুচিহীন ছাত্রছাত্রী গানের সমঝদার হয়েছে আজকাল, যারা গানের তালে তালে নাচতেই বেশি উৎসুক। এসব ফাংশানে প্রধানত হিন্দি ও বাংলা ফিল্মের হিট গানের চতুর্থশ্রেণীর অনুরণন শুনতে চায় দর্শক। গায়কগায়িকা লম্বা তারের কর্ড-লাগানো মাইক হাতে গান করেন। এই সুবাদে পাড়ায়-পাড়ায়, গঞ্জে-মফঃস্বলে গড়ে

'উঠেছে চটজলদি অর্কেস্ট্রা পার্টি আর নকলনবিশ শিল্পী। তাদের কেউ 'কিশোর-কণ্ঠ', কেউ 'লতাকণ্ঠী', কেউ অনুপ জলোটার ডামি। এরাই গাইছে ফাংশানে আধুনিক গান। অথচ সত্যিই সুদক্ষ কণ্ঠের ভালো শিল্পীও আছে এদের মধ্যে। কিন্তু ভাল গান তারা পায় না, পেলেও শোনবার শ্রোতা কই? অনেকে কলকাতার পানশালায় গান করে নানা অমর্যাদাব মধ্যে জীবিকা নির্বাহ করে। এরা কি ভালো প্রচার মাধ্যমে সুযোগ পাবে কোনোদিন? প্রবীর মজুমদার মনে করেন:

> গ্রামোফোন কোম্পানিতে নতুন যোগ্য ছেলেমেয়েদের ঠিক সেরকম সুযোগ নেই। রেডিওতে অডিশন আছে। কিছু ভাল ছেলেমেয়ে সুযোগ পাচ্ছে। তবে দূরদর্শন এখন জনপ্রিয়তম-মাধ্যম। এ-ক্ষেত্রে তার বেশি সক্রিয় হওয়া দরকার। অন্তত, দ্বিতীয় চ্যানেলে নতুনদের বেশি করে সুযোগ দেওয়া উচিত। তবে তার কিছু দেখছি না।...এখানে 'মালঞ্চ' বা 'তরুণদের জন্য' অনুষ্ঠান থাকলেও selection ভাল নয় আর অনুষ্ঠানও অনাকর্ষক। শুধু অডিশন নয়, বাইরে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ঘুরে নতুন প্রতিভাসম্পন্ন ছেলেমেয়েদেব খুঁজে বাব করতে হবে। অন্যান্য বাজ্যে এ রকমটাই ঘটে থাকে।

শ্রীমান্না দে মনে করেন:

> যোগ্য লোক আছে তবে কম। আর তাঁদেরকে ঠিকমত limelight-এ আনা হচ্ছে না।...ফিল্মের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্তা ব্যক্তিরা নবীন যোগ্যদের তেমন সুযোগ দিচ্ছেন না। অক্ষম অথচ নাম আছে এমন শিল্পীদের ওপরই তাঁরা নির্ভর করছেন ব্যবসায়িক কারণে। অথবা স্বজনপোষণ হচ্ছে। যোগ্যরা অল্প হলেও বঞ্চিত হচ্ছেন এইভাবে। আমাদের যুগে দক্ষ যোগ্য লোকদের কদর ছিল।

এই প্রসঙ্গে মান্না দে উল্লেখ করেছেন এক মর্মন্তুদ করুণ ঘটনার। তার থেকে বোঝা যায় নবীন শিল্পীরা কতখানি অসহায় ও শোষিত হয়ে রয়েছেন ইণ্ডাস্ট্রির কাছে। মান্না জানাচ্ছেন:

> প্রখ্যাত শিল্পীকে হয়ত রেকর্ডিং-এর সময় পাওয়া গেল না। তখন music-এর সঙ্গে নতুন কোনো ভাল ছেলে-মেয়েকে দিয়ে গান রেকর্ড করানো হল। পরে সেই বিখ্যাত শিল্পী তাঁর সুযোগ-সুবিধে মতো শুধু সেই music শুনে রেকর্ড করলেন। নতুন ছেলে-মেয়ের কণ্ঠ মুছে দেওয়া

হল। অনেক সময়েই দেখা যাবে ওই নতুন ছেলে বা মেয়েই গেয়েছিল ভাল, নামী শিল্পীর গান তেমন হল না। কিন্তু নামী শিল্পী তো!

এইভাবে প্রতিভাবান নতুন ছেলেমেয়েরা বঞ্চিত হচ্ছে।

নানা উদাহরণ আর ওয়াকিবহাল ব্যক্তিদের মন্তব্য থেকে এখন আমাদের কাছে এমন সত্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, আধুনিক বাংলা গানের নবনির্মাণ, পুনরুজ্জীবন বা বিকাশসাধনে সমগ্র দেশের পরিবেশ খুব একটা অনুকূল নয়। প্রতিভাসম্পন্ন আত্মসচেতন স্পর্শকাতর নতুন কোনো শিল্পীর পক্ষে আধুনিক বাংলা গানের জগতে প্রচার বা প্রতিষ্ঠা পাওয়া কঠিন। নিছক জীবিকার জন্যও তাঁদের নানারকমের হীনতা, শোষণ ও পরতোষণের শিকার হতে হয়, মেনে নিতে হয় বিপথগামী শ্রোতাদের স্ববিরোধী চাহিদা। তাঁদের নানাধরনের বিচিত্র যন্ত্র বাজিয়ে যে সব উদ্ভট গান নিয়ত গাইতে হয় তাতে নিশ্চয়ই মাঝে মাঝে আত্মধিক্কার জাগে। নিশ্চয়ই মনে প্রশ্ন ওঠে তাঁদের, 'আমাদের নিজেদের গান কই?' 'আমাদের সময়ের গান?'

এর উত্তর দিতে পারেন আকাশবাণী বা দূরদর্শন কিংবা দেশের বিভিন্ন সংগঠন ও রাজ্যের সংগীত অ্যাকাডেমি। আধুনিক গানে তাঁদের সকর্মক উদ্‌যোগ বা স্পষ্ট পরিকল্পনার কোনো খবর আমরা অন্তত পাই না। দেশের সর্বমান্য দুটি সংগীতায়তন 'বিশ্বভারতী' ও 'রবীন্দ্রভারতী'-তে নতুনকালের নবীন শ্রোতাদের জন্য কোনো বাংলা গানের সৃজন পরিকল্পনা নিশ্চিতভাবে নেই। এর বাইরে দেশের প্রগতিশীল জন-জীবনের স্বতোশ্চল গভীরতা থেকে উঠে আসতে পারে নবজীবনের উজ্জীবনের গান, যেমন উঠে এসেছিল চার আর পাঁচের দশকে। কিন্তু দেশের রাজনৈতিক বাতাবরণ যা, তাতে ভোটকেন্দ্রিক জনচেতনার প্রাধান্য। গানকে সংগ্রামের হাতিয়ার করে দুর্বার সাংস্কৃতিক প্রত্যয় নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার মতো তেমন বল-দৃপ্ত সংগঠন কই? কোথায়ই বা জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, বিনয় রায় বা হেমাঙ্গ বিশ্বাসের মতো স্রষ্টা কিংবা নির্মলেন্দু চৌধুরী বা দেবব্রত বিশ্বাসের মতো বলিষ্ঠ কণ্ঠের তেজি গায়ক? সবদিকেই একটানা নঞর্থক উত্তর৹ আমাদের আধুনিক গানকে এক অনিবার্য কানাগলির সামনে ঠেলে দেয়। আমাদের বাধ্য হয়ে নির্ভর করতে হয় চলচ্চিত্র আর রেকর্ড কোম্পানিগুলির উপর।

এই দুই প্রচার মাধ্যমের মধ্যে চলচ্চিত্র সাধারণভাবে সামগ্রিক শ্রোতাদের জন্য ভাবিত নয়। তার লক্ষ্য দর্শককুল এবং বক্স অফিস। বাণিজ্য সফলতার জন্য ফিল্ম এমন গান বানায় যা অর্থকরী। তাতে ততটা নন্দনতত্ত্বের বা সৃজনের দায়

স্বভাবতই নেই। কিন্তু কৃৎকৌশলের বা চটকদারির বড় ভূমিকা আছে। চলচ্চিত্র নানাকারণে জনপ্রিয় হয় এবং তার অন্যতম উপকরণ গান। সেই গান রেকর্ড ও ক্যাসেটে বাজারে বার হয় বহুক্ষেত্রে চলচ্চিত্র রিলিজ হবার আগে। গান হিট হলে অবশ্যই ছবি হিট হয়। তাই প্রযোজক ও পরিচালক আলাদা যত্ন নেন গানের ব্যাপারে। উৎকৃষ্ট গীতিকারদের ভালো দক্ষিণা দিয়ে সিচুয়েশন বুঝিয়ে লাগসই গান লেখানো হয়, তাতে সুর করেন নামকরা সুরকার। এরপরে সেই গানে কণ্ঠ সংযোগ করেন জনপ্রিয়তম শিল্পী। কুশলী যন্ত্রীদল স্বতন্ত্র 'সাউণ্ড এফেক্ট' সৃষ্টি করেন। ঘনশ্রুতি ( স্টিরিও ) ধ্বনি-সংযোগে সর্বাধুনিক আন্তর্জাতিক মানের যান্ত্রিক সহায়তায় গানের প্রয়োগ ঘটে। বাজার মাত করা অভিনেতা-অভিনেত্রী সেই গানে দৃশ্যত অংশ নিয়ে আর ঠোঁট নাড়িয়ে আরও জমিয়ে দেন। এর সার্বিক সমন্বয়ে বেশিরভাগ ফিল্মি গান বাণিজ্যসফল হতে বাধ্য। কিন্তু বাংলা চলচ্চিত্রের গানের সফলতা আসলে বাংলা গানের অগ্রগামিতা নয়, সেই আদর্শে 'বেসিক ডিস্ক' বার করলে গান চলবে না, কেননা চলচ্চিত্র-গানের অন্যান্য সমাপতন তাতে নেই। তবে বাংলা ছবির গান নিঃসন্দেহে আধুনিক বাংলা গানের এক বিচিত্র সম্পদ, যা বহু সংগীতকার ও শিল্পীর বেঁচে থাকার প্রধান রসদ। কিন্তু এই জাতীয় গান যত সাফল্য পায়, যত জনপ্রিয় হয়, ততই প্রকট হয় প্রতিতুলনায় আমাদের আধুনিক গানের দৈন্যদশা। চাকচিক্যহীন পরিকল্পনাশূন্য আমাদের উদ্ভট বাণীর অবান্তর সুরের যন্ত্রের যন্ত্রণাদীর্ণ রেকর্ড বা রেডিওর গান চোখে আঙুল দিয়ে পার্থক্য বুঝিয়ে ছাড়ে। ফিল্মের গান অবশ্য আমাদের গানের একটা বড রকমের ক্ষতিও করে। আধুনিক গানের মন্দ প্রতিভাসম্পন্ন গীতিকার-সুরকার সহজেই মেনে নেন ফিল্মি গানের নকলনবিশির এক আত্মঘাতী প্রচেষ্টা। অবশ্য এটাও ঠিক যে গ্রামোফোন কোম্পানিগুলি আধুনিক গানের বিপণন বা প্রণয়নের চেয়ে বেশি মনোযোগী ফিল্মি গানের রেকর্ড সম্প্রচারে, কারণ তাতে লক্ষ্মীলাভ অনিবার্য। কাজেই তাঁরা কেবলই বার করেন দীর্ঘবাদন রেকর্ড বা ক্যাসেট গুচ্ছে 'বেস্ট ফিল্ম সঙ্স্' বা 'মেমোরেবল ফিল্ম হিটস্'-জাতীয় নামের আড়ালে ঝুঁকিবিহীন বেসাতির পণ্য। তাই বলে এ ব্যাপারে তাঁদের বুদ্ধির দোষ দেওয়া চলে না। একটা উদাহরণ দিয়ে ব্যাপারটা বোঝানো খুব সহজ হবে। দেখা যায়, গ্রামোফোন কোম্পানি লতা মঙ্গেশকরের এক দীর্ঘবাদন রেকর্ড বার করেছেন চমৎকার সুরে ও গায়নে 'মীরা ভজনস্' [E C S D 2 3 7 1] আবার তাঁরাই বার করেছেন লতার গাওয়া দীর্ঘ-বাদন রেকর্ড 'ভজনস্ ফ্রম ফিল্মস্' [M F P E 1001 ]। দুটো রেকর্ডেরই কভারে

আছে কাংড়া শৈলীতে আঁকা বহুবর্ণের রাধা বা কৃষ্ণের বিগ্রহ, কিন্তু প্রথম রেকর্ডের চেয়ে দ্বিতীয় রেকর্ডের বিক্রি হয়েছে অনেক অনেক বেশি। কারণ কি? কারণ হলো, প্রথম রেকর্ডের সব কটি গান মীরাবাঈয়ের রচনা এবং সবকটিরই সুরকার হৃদয়নাথ মঙ্গেশকর। তাই যেন বাণী ও সুরে খানিকটা একঘেয়েমি আছে। অথচ দ্বিতীয় রেকর্ডে একখানি গান মাত্র মীরার রচনা, বাকি গানগুলি লিখেছেন পেশাদার ও কৌশলী গীতিকারবৃন্দ। যাঁদের নাম : নরেন্দ্র শর্মা, রাজেন্দ্রকৃষ্ণ, হসরত জয়পুরী, শাহীর, ভারত ব্যাস, আনন্দ বকসী। সুর করেছেন : রবি, শঙ্কর-জয়কিষণ, খৈয়াম, লক্ষ্মীকান্ত-প্যারেলাল, রোশন, রাহুল দেববর্মন। আসলে এ গানগুলি এক একটি চলচ্চিত্রের হিট গানের সংকলন। বাজারে যেহেতু দ্বিতীয় ধরনের রেকর্ডের চাহিদা বেশি তাই রেকর্ড কোম্পানি তার প্রচারে অধিকতর আগ্রহী হবেন স্বাভাবিকভাবে। তার ফলে আধুনিক বাংলা গান তাঁদের কাছে অগ্রাধিকার পায় না। তার প্রণয়নে ও প্রচারে খুব মৌলিক কোনো পরিকল্পনা বা নিরীক্ষা তাই তাঁদের তরফে থাকাটা আশ্চর্যের ব্যাপার হবে।

দেখা যাচ্ছে, বাংলার দুটি নামকরা রেকর্ড কোম্পানি 'হিন্দুস্থান' ও 'মেগাফোন' নতুন কোনো আধুনিক গান প্রচারে সক্রিয় নয়। তাঁদেরই পুরনো রেকর্ড থেকে কিছু কিছু বাংলা গান সম্প্রতি ক্যাসেটের মাধ্যমে পুনঃপ্রচার করছেন 'অবিস্মরণীয় শচীন দেববর্মন'-জাতীয় লেবেলে। বরং গত ক'বছরে গড়ে উঠেছে অনেক নতুন নতুন কোম্পানি 'সাউণ্ড উইং', 'সি বি এস', 'মিউজিক ইণ্ডিয়া', 'কনকর্ড', 'গাথানী', 'স্টার লাইন', 'ভয়েস মাস্টার', 'মিউজ রোমা', 'সিমফনি রেকর্ডিং', 'ক্যালকাটা রেকর্ডস অ্যাণ্ড ক্যাসেটস্'—এই সব নামে। এর কোনো কোনোটির কেন্দ্র বোম্বাই, বাকিগুলির মালিক কলকাতাবাসী অবাঙালী বা বাঙালী প্রতিষ্ঠান। এ সব কোম্পানির ব্যানারে নতুনদের গান বেরোয়। শোনা যায়, নবীন শিল্পীকে মোটা টাকা খরচ করতে হয় সেজন্য। সুতরাং এ জাতীয় কোম্পানির ক্যাসেটে গুণী শিল্পীর গানের চেয়ে প্রাধান্য পায় সুযোগসন্ধানী ও বিত্তবানদের অনুন্নতমানের গান। কোনো কোনো মধ্যবিত্ত শিল্পী বহুকষ্টে টাকা ধার করে রেকর্ড বার করে সর্বস্বান্ত হয়ে গেছেন এমন খবর আছে।

তাই শেষমেশ আধুনিক বাংলা গানের নবনির্মাণ ও বিকাশে রাষ্ট্রায়ত্ত দুটি প্রতিষ্ঠান দূরদর্শন ও আকাশবাণী আমাদের হতাশ করে, চলচ্চিত্র শিল্প তাকে বাণিজ্যিক পণ্য করে তোলে। বাকি থাকে একমাত্র গ্রামোফোন

কোম্পানি* তবে তাঁরাও এখন সারাবছর ধরে আধুনিক গানের রেকর্ড বা ক্যাসেট রিলিজ করেন না, কেননা, চাহিদা নেই। শারদ অর্ঘ্য রূপে তাঁরা বার করেন বেশ কিছু আধুনিক গান। সকলেই মোটামুটি নামকরা বা ব্যবসাসফল (যেমন রুনা লায়লা বা স্বপ্না চক্রবর্তী) শিল্পী। আনকোরা নতুন শিল্পী কচিৎ মেলে। তবু গ্রামোফোন কোম্পানির এই শারদীয় প্রচেষ্টা অভিনন্দনীয়। এই উপলক্ষে তাঁরা 'শারদ অর্ঘ্য' নামে ঝকঝকে একটি পুস্তিকা প্রচার করেন। গত কয়েক বছরের 'শারদ অর্ঘ্য' ঘাঁটলে একটা মোটামুটি ধারণা পাওয়া যায় আমাদের এখনকার ভাগ্যবান আধুনিক গানের শিল্পীদের। তাঁদের নাম: লতা-আশা-রাহুল-মান্না-সন্ধ্যা-অনুপ-মানবেন্দ্র-তরুণ-পিন্টু-ভূপেন হাজারিকা-স্বপ্না-বনশ্রী-অরুন্ধতী-হৈমন্তী-আরতি-শিবাজী-শ্রাবন্তী-দ্বিজেন-শ্রীরাধা। গীতিকারদের মধ্যে থাকেন: গৌরীপ্রসন্ন, সলিল চৌধুরী, শ্যামল গুপ্ত, পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, জটিলেশ্বর মুখোপাধ্যায়, দিনেন্দ্র চৌধুরী, স্বপন চক্রবর্তী, সুনীলবরণ, প্রবীর মজুমদার, আনন্দ মুখোপাধ্যায়, মিন্টু ঘোষ, মুকুল দত্ত। সুরকারদের গড়পড়তা তালিকা: সলিল-হেমন্ত-মান্না-স্বপন-রাহুল-বাপ্পী-ভূপেন হাজারিকা-অজয় দাস-অশোক রায়-দিনেন্দ্র-অভিজিৎ-প্রবীর-অনল-নীতা সেন।

বাংলা গানের উৎসারণের জন্য শুধু অর্থনৈতিক সচ্ছলতা থাকলে চলবে না। চাই নতুন দৃষ্টিভঙ্গি ও উদার সাংস্কৃতিক মনোভাব। নতুন ভাবে বাংলা গানের পরিকল্পনা নিতে হবে যোগ্য ও দক্ষ ব্যক্তিদের নিয়ে। প্রতিষ্ঠিত শিল্পীদের দিয়ে নতুন গীতিকার সুরকারদের গান গাওয়াতে হবে, যা এখন একেবারেই হচ্ছে না, কাব্যধর্মী গান লেখাতে হবে, মেলডিবহুল সুরারোপ করতে হবে, খুঁজতে হবে নতুন বর্গের কণ্ঠবাদকদের যেন বাঙালী আধুনিক গানের মধ্যে আবার

নিজেকে খুঁজে পায়। রবীন্দ্রসংগীত পৌনপুনিকভাবে মাত্রাহীন অসংযমে এখনকার মতো যত্রতত্র গেয়ে নতুন প্রজন্ম খুশি হবে না। তাদের জন্য নতুন ভাবনার নতুন সুরের গান দিতেই হবে। তা না হলে তারা পথভ্রষ্ট হয়ে চলে যাবে সংগীতহীন চীৎকৃত স্ববিরোধে। মানুষকে আত্মস্থ করতে, উদ্বুদ্ধ করতে, উৎসের দিকে ফেরাবার পক্ষে সমসাময়িক গানের ভূমিকা সবচেয়ে কার্যকর। একথা আমরা যতদিন না বুঝবো ততদিন আধুনিক বাংলা গান হয়ে থাকবে স্ববিরোধের শিল্প, যার স্রষ্টা ও ভোক্তা এক অজানা অন্তর্ঘাতে পাক খেয়ে ঘুরে মরবে আনন্দহীনতায়।